আবু লুবাবা শাহ মানসুর

স্পেনের পতন ও আমেরিকা আবিষ্কার

আন্দালুসিয়ার মুসলিম ও আমেরিকার
রেড ইন্ডিয়ানদের করুণ পরিণতি



ভাষান্তর
আবদুর রশীদ তারাপাশী

মুসলিম স্পেনের পতন, রাষ্ট্রীয় গাদ্দারি
খ্রিষ্টীয় পৈশাচিকতার তাণ্ডব ও জাতিনির্মূলের করুণ ইতিহাস

স্পেন টু আমেরিকা

মূল : আবু লুবাবা শাহ মানসুর
ভাষান্তর : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকের কথা

মনে করুন স্বপ্নযোগে আপনি কোনো আন্তঃনাক্ষত্রিক খেয়াযানে চড়ে পৌঁছে গেছেন মঙ্গলগ্রহে। খেয়াযানটি সংক্রিয়ভাবে বাঁধা হয়ে গেছে মঙ্গলের মাটিতে। আপনি নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মঙ্গলের পিঠে। কতই-না কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত? কী আবেগ আর উত্তেজনাময়ী মুহূর্ত। কারণ, একটু পর আপনি মানবেতিহাসে রচনা করবেন নতুন রেকর্ড। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যদি পা পিছলে আপনি পড়ে যান পৃথিবীর বুকে; স্বপ্ন হলেও তখন যে অস্বস্তিকর অস্থিরতা আর হতাশা চেপে ধরবে আপনাকে, ঠিক তেমন অবস্থার ভেতর দিয়ে আপনাকে পাতা উল্টিয়ে অগ্রসর হতে হবে *স্পেন টু আমেরিকা* পাঠে।

BOIBAZAR.com

বইটি পাঠকালে প্রকাশ-অযোগ্য হতাশায় আপনি কুকড়ে যাবার পাশাপাশি শুনতে পাবেন উম্মাহর সোনালি স্বপ্নের-পাজর ভাঙার যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ। সে সাথে যখন দেখবেন বীর তারিকের উত্তরসূরি মুসা বিন আবি গাসসানের অসহায় একাকিত্ব, লেন্দুপ দর্জি আর মীরজাফরদের গাদ্দারি, পরিণাম-অন্ধ ভোগবাদী শাসকের রাজ্য-অপেক্ষা রানির মেকআপের চিন্তা; তখন স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়তে পারেন আপনি।

স্পেন টু আমেরিকায় আপনি পরিচয় পাবেন পরের ধনে পোদ্দারি করা, দুপুরে-ডাকাত, মুসলিম উম্মাহর কৃতিত্ব চোর নির্লজ্জ ইউরোপীয়দের প্রকৃত চেহারার।

দেখতে পাবেন এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে রক্ত আর আগুনের জীবন্ত ইতিহাস। শুনতে পাবেন অশ্রুর মহাসড়ক ধরে মেষ-ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সরলপ্রাণ অসহায় রেড ইন্ডিয়ানদের বুকফাটা আর্তনাদ। লোভের আগুনে ছাই হয়ে যেতে দেখবেন অ্যারাওক ও চ্যরোকি নামক দুই রেড ইন্ডিয়ান জাতির ইতিহাস। জানতে পারবেন রাজ্যলিপ্সু ফার্দিনান্দ ও চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ইসাবেলার মানস-সন্তান আমেরিকানরা কেন মুসলমানদের মোকাবিলায় এতটা হিংস্র? কী তাদের ভবিষ্যৎ টার্গেট।

তখন আপনিও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—আমেরিকার শত্রুতার দাওয়াই আছে; কিন্তু তার বিষাক্ত বন্ধুত্বের কোনো প্রতিষেধক নাই। আমেরিকার বন্ধুত্ব মূলত একটা ফাঁস রশি। বন্ধুত্ব যত গভীর হবে বন্ধুর গলায় তা ততটুকু ধেবে যাবে।

মোটকথা, এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইতিহাসের অনেক সোনালি ও কদাকার পাথরকণা। বইটি পাঠ করে আমাদের ক্রিকেটীয় মদে মাতাল যুবশ্রেণি সজাগ হোক, তারা তাদের শত্রু-মিত্র চিনে নিক, নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারুক—এই কামনা নিয়েই *কালান্তর* প্রকাশ করেছে বইটি।

বইটি রচনা করেছেন উপমহাদেশের স্বনামখ্যাত গবেষক আবু লুবাবা শাহ মানসুর। অনুবাদ করছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী। তারাপাশীর অনুবাদ সম্পর্কে আলাদা করে তেমন কিছু বলা বাহুল্য মনে করি। আপনি তাঁর অনুবাদ পড়লে মনে করবেন মূল বই-ই পড়ছেন। বুঝতেই পারবেন না এটা যে কোনো বিদেশি বইয়ের অনুবাদ। ভাষা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন; এককথায় সবই সাহিত্যের রসে টইটুম্বুর। আছে আবেগ আর দরদি উপস্থাপন।

BOIBAZAR

ভুলত্রুটি মানবিক প্রবৃত্তির অংশ। তবে গঠনমূলকভাবে ভুল ধরিয়ে দেওয়া মানবিক দায়িত্বের অংশ; আর পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া আমাদের কর্তব্য।

সম্পাদক ও প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

একদিন রমজানের তারাবি পড়ে 'ইসলামি কিতাব' লিখে ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে একটি লিংকে ঢুকি। অসংখ্য পিডিএফ বইয়ের ভিড়ে একটি বই আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বইটির নাম *হিস্পানিয়া সে আমেরিকা তাকা* বইটির পিডিএফ ডাউনলোড হবার পরপরই এ থেকে কিছু অংশের অনুবাদ করে পোস্ট দিই আমার তৎকালীন ফেসবুক আইডি *কুতায়বা আহসান*-এর টাইম লাইনে। সেখানে অনেকে বইটি অনুবাদ করার অনুরোধ করেন। এর কিছুদিন পর আরেকটি পোস্ট দিই শুধু বইটির শিরোনামগুলো দিয়ে। এই পোস্টেও বইটি অনুবাদ করার অনুরোধ আসে।

বইয়ের বিষয়বস্তু আমাকেও প্রলুব্ধ করছিল বইটির অনুবাদ করতে। কিন্তু এর মধ্যে *কালান্তর প্রকাশনী*র প্রিয় আবুল কালাম আজাদ লেখেন—বইটির অনুবাদ চলছে এবং এটা *কালান্তর* থেকে প্রকাশ হবে। আশাহত হয়ে আমি হাত গুটিয়ে নিই এর অনুবাদকর্ম থেকে। কিন্তু কোনোভাবেই বইটির কথা ভুলতে পারছিলাম না। একদিন তাঁকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করি *স্পেন থেকে আমেরিকা* কোন পর্যায়ে আছে? তিনি জবাব দেন— 'কিছুটা অনুবাদ হয়েছে।' আফসোস করছিলাম; আহ! বইটি যদি আরও ক'দিন আগে পেতাম।

BOIBAZAR.com

আমি তখন বইটির কথা প্রায় ভুলে গেছি। হঠাৎ একদিন আবুল কালাম জানালেন— 'আপনাকে *স্পেন থেকে আমেরিকা* অনুবাদ করে দিতে হবে। যার কাছে দিয়েছিলাম তিনি পারবেন না বলে দিয়েছেন।'

আমি তখন সালজুক *সুলতান মালিক শাহ*-এর জীবনীগ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত। বিষয়টা তাকে জানালে তিনি বলেন, *সালজুকি* আপাতত থাক। এটা তাড়াতাড়ি দেন। সালজুকির আগেই এই বইটি নিয়ে আসতে চাই।

আমি তখন মাদরাসার ত্রৈমাসিক পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত। বললাম, আমাকে দু-সপ্তাহের সময় দিতে হবে। সময় দেওয়া হলো। এরপর আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করে দিই এবং পরীক্ষাপরবর্তী এক সপ্তাহের বন্ধের ভেতরেই আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করে নিই। বইটি অনুবাদে আমার কেন এতো আগ্রহ আশাকরি সূচিপত্রে দৃষ্টি দিলেই সেটা অনুমান করে নিতে পারবেন।

বইটিতে বানান, শব্দপ্রয়োগ, বাক্যগঠন ও তথ্যগত কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবগত করার অনুরোধ রইল।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
২৫.১১.২০১৮

সূচি

লেখকের কথা : হারিয়ে যাওয়া জান্নাতের খোঁজে ১১
হারিয়ে যাওয়া জান্নাত : বীরদের আখ্যান ১৫
বাহাদুরির প্রতিদান ১৫
অভিজাত সর্দার ১৬
বিশ্বস্ততার পুরস্কার ১৭
ব্যক্তিগত গুলাবলি ১৮
অদৃশ্য ইশারা ১৯
দুটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ২০
ইউরোপের দুটি তদবির ২৭
মুহূর্তের ভুল ৩৩
একদিনের কাহিনি ৩৩
গঙা থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত ৩৩
বিদ্যুতের ঝলকানি ৩৪
পায়ের আওয়াজ ৩৫
দিনভর প্রয়াস ৩৬
সিংহের লড়াই ৩৮
দুই ঝড় ৩৮
আজন্ম বিজয়ী ৩৯
পঞ্চাশ বছর পূর্বে ৩৯
ইউরোপের আর্তনাদ ৪০
চরম ঔদ্ধত্যপনা ৪১
গর্জনমুখর ঝড় ৪১
তুমুল যুদ্ধ ৪২
হতাশার কবরস্থান
কায়সারের কূটচাল ৪৪
আত্মীয়তার আবেগ ৪৫
আত্মার ফাঁদ ৪৬

BOIBAZAR.com

বলকানের সিংহ ৪৭
অবস্থার বাধ্যবাধকতা ৪৭
প্রত্যাশার সমাধি ৪৮
আকাঙ্ক্ষার পদদলন ৪৯
বুকের আগুন ৫০
পাথরের অশ্রু ৫০
বসফরাসের কিনারে ৫২
নামজাদা সেনাপতির নামজাদা দৌহিত্র ৫২
শতাব্দীপ্রাচীন প্রত্যাশা ৫৩
কুসতুনতুনিয়ার দুই উপহার ৫৩
সত্য ভবিষ্যদ্বাণী ৫৪
যুদ্ধের প্রস্তুতি ৫৬
বসফরাসের কিনারে ৫৭
অবদানের অবদান ৫৮
সৃষ্টিশীল চিন্তার উৎকর্ষ ৫৮
তোপ ও মিনার ৫৯
অসম্ভব থেকে সম্ভব ৫৯
মুজিজা, কারামত ও ইস্তেদরাজ ৬০
যুদ্ধের রাতে ৬১
এক উৎসর্গপ্রাণ বাহাদুর ৬২
আরেক ভবিষ্যদ্বাণী ৬২
আটলান্টিকের ওপারে ৬৪
সাগরযুদ্ধের শুরু ৬৪
হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো! ৬৪
ইউরোপের দরজায় ৬৫
প্রকৃত হকদার কে? ৬৭
আল্পস পর্বতমালা থেকে প্রত্যাবর্তন ৭৪
ইতালির দরজায় ৭৬
গ্রানাডার টাকশালে ৮০
দুই পাগলের সম্মিলন ৮০
ইনকুইজিশন ৮১
নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার নজীরবিহীন প্রদর্শনী ৮২
বাহাদুর পিতার হতভাগা পুত্র ৮৪

BOIBAZAR.com

হতভাগা শাসক ৮৫
অনৈক্যের শাস্তি ৮৮
শেষ মোর্চা ৯৪
ইসলামি ইতিহাসের বেদনাদায়ক দিন ৯৮
মুরের অন্তিম ফরিয়াদ ১০২
দন্তখোলা জাহান্নাম মূল ইয়ারুশালেমের (জেরুসালেম) আগে ১০৬
কাহিলার কাহিনি ১১৩
নতুন জেরুসালেমের দিকে ১১৩
রঙিন আশার কিনারে ১১৫
আমেরিগো থেকে আমেরিকা ১১৬
পৃথিবীর ১২ অংশ ১১৬
ইহুদি নারীদের স্বামী ১১৮
তুর উপত্যকায় আর্তনাদ ১১৯
চিরন্তন টানাপোড়েন ১২০
গ্রানাডা পতনের পরে ১২১
খ্রিষ্টান ইতিহাসের কালো অধ্যায় ১২১
নয়া দুনিয়া ১২২
সামেরীয় জাদু ১২৩
অনুগ্রাহী ধ্বংস করা জাতি ১২৪
জিহাদ এবং প্রচেষ্টা ১২৫
গ্রানাডা পতন থেকে বাগদাদ পতন পর্যন্ত ১২৬
আমাদের ওয়াদায় সন্দেহ করো না ১৩৩
সদৃশ্যতা... জোরপূর্বক না স্বভাবজাত ১৪৩
লাঞ্চিং : আমেরিকার জাতীয় খেলা ১৫৪
অশ্রুর মহাসড়ক ১৬২
ভার্জিনিয়ার বাজার থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ১৬৯
আমেরিকান এক প্রফেসরের পর্যবেক্ষণ ১৭৭
আমেরিকা কেন মুসলিমবিশ্বে হামলা করছে? ১৮৩

BOIBAZAR.com

লেখকের কথা

হারিয়ে যাওয়া জান্নাতের খোঁজে

হিস্পানিয়া[১] যদি হয় আমাদের হারিয়ে যাওয়া জান্নাত, তাহলে আমেরিকা হচ্ছে আমাদের জন্য দন্তখোলা জাহান্নাম। হিস্পানিয়া হারিয়ে আমরা বঞ্চিত হয়েছি দুনিয়ার জান্নাত থেকে, আর আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব জুড়ে আমরা এক পা রেখে দিয়েছি জাহান্নামের মুখে। হিস্পানিয়ার পতন ও আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্যে যে সদৃশ্য বিদ্যমান—আমাদের কোনো গবেষক, সাহিত্যিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়টা তুলে ধরেননি। এ জন্যেই আমরা যখন আমেরিকার কাছ থেকে কল্যাণ প্রত্যাশা করি, তখন বিপদের আগ্নেয়গিরিকে লাভা বিস্তার করতে দেখি। বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাইলে মুনাফেকি আর শত্রুতার কদাকার চেহারা দেখতে পাই। আমরা তার একটা দুরভিসন্ধি, প্রতারণা ও অসদাচারের উপর আফসোস করতে থাকা অবস্থায় দুর্ব্যবহার, হিংসা ও ঘৃণার নতুন নতুন শত্রুতাকে মুখব্যাদাতে প্রত্যক্ষ করি। কেন এমন হচ্ছে? কেন আমেরিকার স্বভাবের মধ্যে আমাদের প্রতি তুচ্ছতা, উপহাস এবং কঠিন শত্রুতা বাসা বেঁধে নিয়েছে? কেন তার মেজাজ ও আচরণের মধ্যে আমাদের প্রতি চিরস্থায়ী বৈরিভাব প্রত্যক্ষ করা যায়? আলোচ্য গ্রন্থে এ প্রশ্নগুলোরই জবাব অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে।

মুসলিমবিশ্বসহ পৃথিবীর সমূহ মজলুম রাষ্ট্র আমেরিকার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমেরিকার প্রতি কমবেশি সবারই রয়েছে অভিন্ন অভিযোগ। কিন্তু আমাদের গবেষকশ্রেণি ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকদেরকে এ যাবৎ বিষয়টি উদ্ঘাটন করতে হয় নিস্পৃহ, নতুবা অক্ষম দেখা যাচ্ছে। কেউই উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের মৌলিক জবাবগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করছেন না। যদি প্রশ্ন করা হয়—উত্তম ব্যবহার ও ক্ষমাসুন্দর আচরণ দ্বারা কি এই শত্রুতামূলক আচরণকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দ্বারা কনভার্ট করা যায় না? তাহলে এর জবাব হবে—না, আদৌ সম্ভব নয়।

আমাদের কলমযোদ্ধাদের দুর্বলতা এখানেই যে, তারা সুস্পষ্টভাবে এ কথাটা বলবেন দূরে থাক, টীকা-টিপ্পনিতেও স্থান দেননি। পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহ আজও তাদেরকে বন্ধুজ্ঞানে বার বার মার খেয়ে আসছে। এ গ্রন্থ যেসব নিবন্ধের

[১] স্পেন।

সম্মিলিত-রূপ, সেসব নিবন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টায় এ কথাটাই সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমেরিকার বন্ধুত্ব মূলত বন্ধুত্ব নয়; বরং এটা আত্মহত্যার নামান্তর। তাদের সহায়তা এমন প্রাণহারী বিষ; যার কোনো প্রতিষেধক নেই। তাদের দেওয়া ঋণ এমন এক কঠিন ফাঁদ, যে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার যতই চেষ্টা করা হয়, ততই তা আপাদমস্তক জড়িয়ে ধরে।

আমেরিকার এককালের নীতিনির্ধারক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. হেনরি কিসিঞ্জার এ ব্যাপারে যা বলেছেন এর বাইরে বড় সত্য আর কিছু হতে পারে না। মি. কিসিঞ্জার বলেছেন—'আমেরিকার শত্রুতার দাওয়াই আছে; কিন্তু তার বিষাক্ত বন্ধুত্বের কোনো উপশম নেই।' অন্য কথায়—'আমেরিকার শত্রুতা ক্রয় করে জীবনযাপন সম্ভব হলেও তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করে সম্মানের জীবন অতিবাহিত করা দুরূহ।' প্রিয় জাতি যদি কথাটা উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে নিজের শ্রমকে স্বার্থক মনে করতাম।

আমেরিকা আজ বিশ্বনেতৃত্বের জন্য পাগলপারা। কিন্তু বিশ্বনেতৃত্বের জন্য যে চারিত্রিক উৎকর্ষ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নত মানবতাবোধের প্রয়োজন; আমেরিকা এর এক দশমাংশও অর্জন করতে পারেনি। বিপরীতে তাদের রয়েছে চরিত্রহীনতা, সংকীর্ণচিত্ততা ও পাশবতার এমনসব ঘৃণ্য রেকর্ড, যার ফলে বিশ্বনেতৃত্ব তো অনেক পরের ব্যাপার; তাকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কাতারে দেখাও অসম্ভব বলে মনে হয়। কারণ জিজ্ঞেস করলে এত অধিক কারণ উল্লেখ করা যাবে, যা গুনে শেষ করার মতো নয়। চেঙ্গিস খানের ঘাড়ে ৩৪ মিলিয়ন মানুষের রক্তের দায়িত্ব বর্তায়। হালাকু খানের ঘাড়ে বর্তায় ৫.৪ মিলিয়ন মানুষের রক্ত। তৈমুর লং-এর ঘাড়ে ১৪ মিলিয়নের এবং হিটলারের ঘাড়ে দায় রয়েছে ২১ মিলিয়ন মানুষের রক্তের। এসব রক্তপায়ীদের সকলে মিলে পান করেছে মোট ৭৩ মিলিয়ন মানুষের রক্ত। অথচ আমেরিকা তার জন্মের পর থেকে এ যাবৎ[২] একাই পান করেছে মোট ১৭৩ মিলিয়ন মানুষের রক্ত। হিসাবটি একটু দেখে নিন।

রেড ইন্ডিয়ান	১০০ মিলিয়ন।
আফ্রিকান	৬০ মিলিয়ন।
ভিয়েতনামি	১০ মিলিয়ন।
আফগান	০২ মিলিয়ন।
ইরাকি	০১ মিলিয়ন।
মোট	১৭৩ মিলিয়ন।

[২] ২০০৭ ইসায়ি পর্যন্ত।

এবার আপনিই বলুন, ৭৩ মিলিয়ন মানুষের হন্তারকদের যদি মানবতার শত্রু বলা যায়, তাহলে ১৭৩ মিলিয়ন মানুষের রক্তপায়ী হিংস্রদের কোন অভিধায় অভিসিক্ত করা যায়?

আরেকটি পরিসংখ্যান প্রত্যক্ষ করুন। স্বাধীনতা অর্জনের (১৭৭৬ ইসায়ি) পর থেকে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনী মোট ২২০ দফা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। মাত্র ২৩০ বছরের ভেতরে ২২০ দফা আগ্রাসনের এ হার যেকোনো আগ্রাসী শক্তির আগ্রাসন অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ যাবৎ আমেরিকা ২৩টি রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন চালিয়েছে। এদের মধ্যে চীন, (দুই বার) গোয়েতেমালা, (তিন বার) কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কিউবা, কঙ্গো, পেরু, সুদান, আফগানিস্তান, লাউস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, গ্রানাডা, লেবানন, লিবিয়া, এলসালভাদর, নিকারাগুয়া, পানামা, ইরাক (দুই বার) এবং যুগোস্লাভিয়া উল্লেখযোগ্য।

একদিকে আমেরিকা বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হতে এবং পৃথিবীর তাবৎ অর্থভান্ডার নিজস্বকরণে উন্মাদপ্রায়। অপরদিকে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা তার পদলেহন ও জি-হুজুরিতে ব্যস্ত। ঘটনা ঠিক সেই ক্রান্তিকালের স্পেনের মতো, যখন স্পেনের পতনকালে খ্রিষ্টানদের পদলেহী শাসক আবু আবদিল্লাহ জাতিকে বলছিল—'এগুলো[৩] মূলত তোমাদের মুক্তির লক্ষেই।' অথচ পর্দার আড়ালে সে নিজের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা আজও দেশের স্বাধীনতা ও চিরস্থায়িত্বের পক্ষে মিছিল দেই; কিন্তু কখনো ব্যক্তিস্বার্থের জন্য এবং কখনো শত্রুর অস্ত্রের ভয়ে তাদের কাজ করে দেই। আর নির্মম পরিহাস হচ্ছে, সে কাজটাকে আমরা দেশপ্রেম বলে বেড়াই। এ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা ইতিহাসের আয়নায় আমাদের সামনে এমনসব দৃশ্য অবলোকন করাবে, এমনকিছু পরিণাম প্রদর্শন করাবে; যেগুলো সর্বকালের জনগণের জন্য ক্ষতিকর হলেও শাসকমহল দেশপ্রেম হিসেবে দেখিয়ে আসছে।

আলোচ্য গ্রন্থে ইতিহাসের কিছু হারিয়ে যাওয়া পাতা, গোপন কিছু সংখ্যা, কিছু পরিসংখ্যান, কিছু গবেষণা, কিছু পর্যবেক্ষণ ও কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান পাবেন।

কোনো লেখকই নিজে বইয়ের ভূমিকায় অন্য বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরেন না। কিন্তু আমার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং প্রিয়নবি সা.-এর উম্মতের হিত কামনা; তাই চিরাচরিত নিয়মের বাইরে গিয়ে বলতে চাই, অধম এ

.....

[৩] অর্থাৎ, খ্রিষ্টানদের সাথে সুসম্পর্ক, তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা, তাদের অনুকম্পা চাওয়া।

বিষয়ে কলম ধরার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও একটিমাত্র বই ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো সহায়িকা পাইনি। আর বাস্তবতা হচ্ছে, একমাত্র ওই বইটি এতটাই তথ্য ও তত্ত্ববহুল যে, নিঃসন্দেহে বইটিকে এ বিষয়ের শেষ বই বলা যেতে পারে। বইটির নামও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক—*হুয়ে তুম দুস্ত জিসকো* বইয়ে সাহিত্য এবং গবেষণার সংমিশ্রণে যে অনন্যতার স্বাক্ষর রাখা হয়েছে; যতই এর প্রশংসা করা হোক, তা কম থেকে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে লেখক তাঁর গবেষণার দরুন জাতীয় এওয়ার্ড পাবার দাবিদার।

আমার কথাগুলো কারও কাছে অতিরঞ্জনের মতো মনে হলে আশা করি বইটিতে সংযুক্ত কিছু দালিলিক ছবি ও দুর্লভ ফটোকপিগুলোই তার সন্দেহ অপনোদনের জন্য যথেষ্ট হবে। আমার নিবন্ধগুলো উক্ত বই প্রকাশ পাবার তিন বছর পূর্ব থেকেই *জরবে মুমিন* নামক পত্রিকায় পর্বাকারে প্রকাশ পেয়ে আসছিল। কিন্তু বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে উক্ত বইয়ের এক বছর পরে। তাই *হুয়ে তুম দুস্ত জিসকে* এ বিষয়ে পথিকৃতের দাবিদার। উক্ত বইয়ের লেখক ড. হক হাক্কি। যদি আমার বইটি আগে প্রকাশ পেত তাহলে নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে ওটাই হতো পথিকৃতের দাবিদার। তবে আমার বইটি যে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ড. হাক্কি সাহেবের অনুমতি নিয়ে তাঁর বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে সংযোজন করেছি। তিনি উদারচিত্তেই অনুমোদন দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

একটা বইয়ে অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে ধারাবাহিকতা থাকা স্বাভাবিক এবং আবশ্যকও। তবে আলোচ্যগ্রন্থ যেহেতু পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিক আকারে লেখা নিবন্ধের সম্মিলিত-রূপ, তাই এতে ধারাবাহিকতা তেমন একটা রক্ষা পায়নি। তবে আলোচনার মধ্যে ধারাবাহিকতা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ গ্রন্থে আমেরিকার জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসার উন্মাদনা এত তীব্র আকারে প্রত্যক্ষ করা যাবে, যে উন্মাদনা রয়েছে আন্দালুসিয়া নামক হারিয়ে যাওয়া জান্নাত খুঁজে পাওয়ার দুর্মর আকাঙ্ক্ষায়।

আমার প্রয়াস একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে তাঁর মজলুম বান্দাদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ করুন, আমরা যেন এই জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে ওই জান্নাত খুঁজে পাই, যে জান্নাত আজও বিন জিয়াদের উত্তরসূরিদের পায়ে চুমো খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।

আবু লুবাবা শাহ মনসুর
রমজানের প্রথম দশক ২৮ হিজরি

প্রথম অধ্যায়

হারিয়ে যাওয়া জান্নাত : বীরদের আখ্যান

বাহাদুরির প্রতিদান

হিজরি সপ্তম শতাব্দী মোতাবেক ত্রৌদশ খ্রিষ্টাব্দের কথা। খাওয়ারিজম শাহিদের প্রতাপ তখন মধ্যগগনে। ইরান, ইরাক, খোরাসান এবং শাম কব্জা শেষে পুরো মধ্য-এশিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসার পথে। অতুল ক্ষমতা বলে তারা যখন এ ইচ্ছে বাস্তবায়নের একেবারে দ্বারপ্রান্তে, ঠিক সে মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় তাতারি ফেতনা। চেঙ্গিস খান তার হিংস্র বর্বরতা নিয়ে আছড়ে পড়ে উজাড় করে ফেলে বিশাল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। যদিও খাওয়ারিজমি তুর্করা বীরত্বের দিক দিয়ে একেবারে সাধারণমানের ছিল না, তথাপি তাদের পক্ষে চেঙ্গিসি ঝড়ের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। ধ্বংসের সে তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়া খাওয়ারিজমিরা বাঁচার তাগিদে হয়ে যায় একেবারে ছন্নছাড়া।

খাওয়ারিজমিরা বংশগতভাবে ছিল তুর্ক। এমনি এক তুর্ক গোত্রের সরদার উরতুগরুল জন্মভূমি ছেড়ে আশ্রয়ের আশায় হিজরত করছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন সালজুকির রাজধানী কোনিয়ার দিকে। সাথে ছিল গোত্রের প্রায় ৪০০ পরিবারের ছোটখাটো একটা দল। আঙ্গুরার পাশে পৌঁছতেই এক অস্বাভাবিক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে সেখানেই থামিয়ে দেন কাফেলা। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন দুটি বাহিনী পরস্পর লড়াই করছে। একটি বাহিনী দুর্বলতার দরুন পরাজয়ের মুখোমুখি; আর সবল বাহিনী ক্রমশ চেপে ধরছে দুর্বল বাহিনীটিকে।

আজন্ম যোদ্ধাজাতির নেতা উরতুগরুলের পক্ষে দৃশ্যটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি মনে মনে দুর্বল দলটিকে সহায়তাদানের স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন এবং প্রায় সাথে সাথে গোত্রের সশস্ত্র যুবকদের নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর বাহিনীতে ছিল মাত্র ৪৪০ জন জওয়ান। ওরা ছিল বিভিন্ন মাঠের পোড়খাওয়া সৈনিক। কালের আবর্তে পড়ে যদিও আজ ওরা আশ্রয়ের খোঁজে; কিন্তু ওদের প্রত্যেকের ধমনীতে বইছিল দিগ্বিজয়ীদের রক্ত। ওরা বিপক্ষ শক্তির উপর এমন টর্নেডো হয়ে আছড়ে পড়ে যে, খানিক পরেই সম্পূর্ণরূপে পালটে যায় যুদ্ধের পট। একসময় যারা ছিল

বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এখন তারাই জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে পলায়নপর। লড়াই সমাপ্তির পর উরতুগরুল জানতে পারেন; যাদের তারা সহযোগিতা দিয়েছেন, তারা হচ্ছেন সুলতান আলাউদ্দিন সালজুকির বাহিনী। পরাজিত হয়ে যারা পালিয়ে যাচ্ছিল, তারা হচ্ছে তাদের অস্তিত্বের শত্রু তাতার বাহিনী। সরদার উরতুগরুল মহানুভবতা দেখিয়ে পরিচয় না-জানার পরও যে অসামান্য সহায়তা দেন, এর কৃতজ্ঞতায় আলাউদ্দিন আঙ্গুরার পাশে তাদেরকে বিশাল ভূসম্পত্তির জায়গির দান করে বসবাসের সুযোগ করে দেন। সে উর্বর ভূখণ্ডটি বর্তমান ইস্তাম্বুলের একেবারে নিকটেই। ভূখণ্ডটি ছিল রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তের পাশে; এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গমস্থলে।

অভিজাত সর্দার

সুলতান আলাউদ্দিন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সরদার উরতুগরুলকে যে ভূখণ্ড দান করেছিলেন সেখানে বসবাস করতে গিয়ে তাঁকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, পাশেই ছিল রোমান বাইজেন্টাইনদের উপস্থিতি। ফলে প্রায়ই তাদেরকে ইউরোপের বিভিন্ন দুর্গ অধিপতিদের সাথে লড়াই করতে হতো। তবে এটা প্রবীণ তুর্ক সরদারের জন্য উটকো কোনো ঝামেলা মনে হয়নি; বরং এটা তাঁর জিহাদি জজবাকে আরও জাগিয়ে তুলে। তিনি স্বভাবজাত বীরত্ব প্রদর্শন করে অল্প কিছুদিনের ভেতরেই খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন ত্রাসের জন্ম দেন যে, তারা এদিকে আর উঁকি দেওয়ারও সাহস রাখেনি। তাঁর একের পর এক বিজয়ের ফলে তাদের অন্তরে মারাত্মক ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে উরতুগরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে আরও অনেক তুর্ক গোত্র তাঁর পতাকাতলে এসে তাঁর হাতকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

একবার তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা তাতার এবং ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের যৌথবাহিনীকে কুকুরতাড়া করেন। এটা ছিল ওই এলাকার জন্য একটা স্মরণীয় ঘটনা। উরতুগরুলের এ মহান কর্মযজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে মুগ্ধ সুলতান তাঁকে আরও বিপুল জায়গির প্রদানের পাশাপাশি নিজ সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি বানিয়ে নেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের পতাকা ছিল চন্দ্রখচিত। উরতুগরুল সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে ওই প্রতীক ব্যবহার করতেন। আজ অবধি তুর্কিদের কাছে এ প্রতীকটা তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৬৮৭ হিজরি মোতাবেক ১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ৯০ বছর বয়সে উরতুগরুল মারা যাবার পর ৩০ বছর বয়সী তাঁর বড় ছেলে গাজি উসমান খান গোত্রের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন উসমানি খেলাফতের ভিত রচনাকারী ও প্রথম মুকুটধারী।

ছিলেন বিস্ময়কর কিছু গুণের অধিকারী। সরলতা, বীরত্ব, দীনদারি ও খোদাভীরুতায় ছিলেন ইসলামের সোনালি যুগের শাসকদের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

সুলতান আলাউদ্দিন সালজুকি সাম্রাজ্যের জন্য উসমান খানের ত্যাগ ও সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদানের পাশাপাশি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন এবং জুমআর খুতবায় নিজের নাম উচ্চারণের অনুমতি দিয়ে দেন। সুলতানের অপরাপর আমিরগণ বিদ্রোহী হয়ে স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য গঠন করে চললেও উসমান খান সে-পথে হাঁটেননি। তিনি তাদেরচে বহুগুণ শক্তিশালী হবার পরও সুলতানের জীবৎকাল পর্যন্ত পিতার মতোই একনিষ্ঠ অনুগত থেকে যান এবং অসংখ্য বিজয়ের মাধ্যমে সুলতানের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে নিবেদিত থাকেন।

বিশ্বস্ততার পুরস্কার

তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশেষ সেবা নেওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ছিল; বিধায় বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাঁকে সালজুক সাম্রাজ্যের কর্ণধার বানিয়ে দেন। কোনো প্রকার নিমকহারামি ব্যতীত এমনিতেই সাম্রাজ্য তাঁর কব্জায় চলে আসে।

ঘটনা হচ্ছে, ৬৯৯ হিজরি মোতাবেক ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে তাতারিদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সুলতান আলাউদ্দিন এবং যুবরাজ গিয়াসুদ্দিন শাহাদত বরণ করলে নিবে যায় সালজুক সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ। তখন সালজুক তুর্কসহ অপরাপর তুর্ক গোত্রগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে উসমান খানকে কোনিয়ার রাজমসনদে আসীন করিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করে। এভাবেই সে মহান সাম্রাজ্য অস্তিত্বে আসে, যা কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইউরোপে দাপট এবং মর্যাদার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে। যে সাম্রাজ্যের দিগ্বিজয়ীরা কুসতুনতুনিয়া[৪] জয় করে পালটে দেন ইতিহাসের মোড়। যারা হন রাসুল সা.-এর সুসংবাদ বাস্তবায়নের গৌরবের অধিকারী। যদি নিজেদের লোক তাঁদের পিঠে ছুরি না হানতো, তাহলে আজ হয়তো ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের চিহ্নটুকুও থাকত না। এশিয়ার মতো ইউরোপও হতো মুসলিমপ্রধান মহাদেশ। খেলাফতে আব্বাসিয়া-উত্তর তাঁদের খেলাফতই বিশ্বে ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছিল। এই খেলাফতের শাসকরা এমনসব কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, যার উপর অনাগত ভবিষ্যতের মুসলমানরাও গর্ব করতে পারে।

[৪] কনস্টান্টিনোপল। বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর।

গাজি উসমান খানের বংশধারায় আল্লাহ বড় বড় অনেক বিজেতার জন্ম দিয়েছিলেন। কারণ বোধহয় এটাই যে, সুলতান ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, দানবীর এবং খোদাভীরু। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এমন এক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গকন্যার সাথে, যে নিজে ছিল তাকওয়া এবং পবিত্রতার উঁচু অবস্থানে।

এখানে আমরা প্রথমে উসমান খানের কিছু উন্নত গুণাবলির আলোচনা করব; অতঃপর আলোচনা করব তাঁর বিয়ের কাহিনি। আশা করি তখন উপলব্ধি করতে পারবেন, কেন আল্লাহ তাঁর সন্তানদের মাধ্যমে ইসলামের এ বিশাল খেদমত নিয়েছেন। আকা

ব্যক্তিগত গুলাবলি

একজন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে যেসব গুণাবলি থাকার প্রয়োজন, উসমান খানের মধ্যে সবগুলোই ছিল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাঁর সাহস ও বীরত্ব ছিল প্রায় অতিলৌকিক। নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ছিল সহজাত। লড়াইয়ের ময়দানে ব্যক্তিগত বীরত্ব সৈন্যদের অন্তরে জন্ম দিত দুর্জয় বিজয়াকাঙ্ক্ষার। তাঁর রাষ্ট্রনীতি তাঁকে করে তুলছিল জনগণের আপনজন। ন্যায়পরায়ণতা ছিল প্রবাদপ্রতীম। তাঁর বিচারিক আদালতে তুর্ক, তাতার, মুসলিম ও খ্রিষ্টানের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। জনগণের কল্যাণই ছিল রাষ্ট্রচিন্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ছিল পরম ধ্যান-জ্ঞান। প্রথমযুগের মুজাহিদদের মতো তাঁর জীবনাচার ছিল সম্পূর্ণ লৌকিকতামুক্ত ও সাধাসিধে। সম্পদ সঞ্চয় তাঁর ধাতে ছিল না। গনিমতের মালে মুজাহিদদের অংশ প্রদানের পর যা থাকত, তা গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। যে ঘরে বসবাস করতেন, ইনতেকালের পরে সেখানে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও তিল পরিমাণ সোনারোপা কিংবা হিরে-জহরত পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল মাত্র একটি সুতি-পাগড়ি, কাঠের তৈরি একটা চামচ আর একটি লবণদানি। উত্তরাধিকার সম্পদের মধ্যে রেখে যান কয়েকটা আরবি ঘোড়া, কৃষিকাজের জন্য কয়েক জোড়া ষাঁড় এবং একপাল ভেড়া। এ ছাড়া ছিল কয়েকটি পতাকা ও কিছু অস্ত্র। তিনি ছিলেন জনসাধারণের হৃদয়ের মধ্যমণি। পরবর্তীতে তাঁর বংশের যিনি উত্তরাধিকার হতেন, তার অভিষেক অনুষ্ঠানে কোমরে তাঁর এই তলোয়ার[৫] বেঁধে দেওয়া হতো এবং তাকে এ দুআ দেওয়া হতো—আল্লাহ যেন তোমার মধ্যে উসমানের মতো কল্যাণ দান করেন।

[৫] এই তলোয়ারটা আজও তুরস্কে সংরক্ষিত রয়েছে।

অদৃশ্য ইশারা

সুলতানের বিয়ের কাহিনি নিম্নরূপ : রাজধানী শহরের পাশেই ছিল আবতারুনি নামক একটা গ্রাম। সেখানে বসবাস করতেন একজন খোদাভীরু দরবেশ আলেম। যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকেই তাঁর দরবারে ছিল উসমান খানের যাতায়াত। বুজুর্গের ছিল এক কন্যা। সে ছিল সৌন্দর্য, উত্তম আচরণ এবং খোদাভীরুতায় নিজেই নিজের উদাহরণ। উসমান খান একদিন দরবেশের কাছে তাঁর মেয়র সাথে বিয়ের আবেদন নিয়ে যান। কিন্তু সামাজিক স্ট্যাটাসের তফাৎ বিবেচনায় দরবেশ উসমানের আবেদন ফিরিয়ে দেন। উসমান ছাড়া আরও বেশ ক'জন আমিরপুত্রের পক্ষ থেকে দরবেশ বরাবরে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব গিয়েছিল। দরবেশ তাদের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এক রাতে উসমান খান এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেন। দেখতে পান একটা নতুন চাঁদ দরবেশের বুক থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে চতুর্দশীর চাঁদের রূপ ধারণ করে তাঁর বুকে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। এরপর তার বাহু থেকে একটা বৃক্ষ গজিয়ে উঠে তা ক্রমশ মহিরুহের রূপ ধারণ করছে। একপর্যায়ে বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা জলে-স্থলে ছেয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া সে বৃক্ষের মূল থেকে পৃথিবীর বড় চারটি নদী তথা দজলা, ফুরাত, নীল এবং দানিয়ুব উৎসারিত হয়ে আপন গতিতে বয়ে চলছে। অনুরূপ পৃথিবীর চারটি বড় পর্বত তথা ককেশাস, বলকান, তুর ও এটলাস এই বৃক্ষের কাণ্ডগুলোর ভার বহন করে চলছে। হঠাৎ দমকা বাতাস বইতে শুরু করলে তলোয়ার আকৃতির বৃক্ষপত্রগুলো এমন একটি শহরের দিকে উড়ে যেতে থাকে, যেটি দুই নদী ও দুই মহাদেশের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। শহরটিকে এমন একটি আংটিবৃত্তের মতো দেখাচ্ছিল, যার উপর রয়েছে দুটি করে নীলকান্তমণি ও পান্না পথর। উসমান আংটিটি হাতে পরবার জন্য হাত বাড়াতেই তাঁর ঘুম টুটে যায়। জাগ্রত হবার পর দ্রুত দরবেশের খেদমতে উপস্থিত হয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত খুলে বলেন। দরবেশ স্বপ্নটিকে একটা অদৃশ্য ইঙ্গিত মনে করে তাঁর মেয়েকে উসমানের হাতে তুলে দেন।

এভাবেই ঘটিত হয় সে মহান বংশের ভিত্তি, যার উত্তরপুরুষদের সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তথা তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। যে বংশের বীরদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে কেঁপে উঠছিল ইউরোপের প্রতিটি রাজধানী।

দুটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ

- মাওলানা সাহেব একটা কথার জবাব দিন!

- জি, জি, বলুন! আপনি শিক্ষণীয় কোনো বিষয় সামনে নিয়ে আসলে আশা করি শোনা এবং শোনানের ব্যাপারটি খুবই উপকারী প্রমাণিত হবে।

- একটা প্রশ্ন আমাকে ও আমার বন্ধুমহলকে ক'দিন ধরে খুব অস্থির করে রাখছে। এক বন্ধু তো প্রশ্নটির উত্তর পাবার জন্য অস্থির হয়ে আছেন।

- আপনি বলে যান, আমি মনোযোগ দিয়েই আপনার কথা শুনছি।

- *কুরআন কারিমে* এসেছে 'আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়াত এবং সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন; যাতে এ দীনকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতই যথেষ্ট।'[৬] এখানে যে নিরঙ্কুশ বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা কবে পূর্ণ হবে? ইতিহাসে কি এমন কোনো কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন ইসলাম পুরো বিশ্বের সব ধর্মের উপর বিজয়ী হয়েছিল?'

- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক একটি বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মতো সাধারণজনদের কথা বলা শোভা পায় না। এটা হবে ছোটমুখে বড়কথা আওড়াবার মতো ব্যাপার। তবে ইতিহাস পাঠ এবং এর চর্চার ফলে এ ব্যাপারে আমার যা বুঝে এসেছে এর সত্যায়নের জন্য বিজ্ঞজন সমীপে তা তুলে ধরতে চাই এবং এ ব্যাপারে তাঁদের দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করি।

- এ ব্যাপারে কি আপনার দৃশ্যমান কোনো সাফল্য নেই?

- আমি প্রায় এক যুগ থেকে এ ব্যাপারে অনেক তত্ত্ব খুঁজে আসছি। এ ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্পট নির্ধারণ ও একটি ক্যারিশমাটিক ঘটনার কেন্দ্র নির্ধারণের জন্য প্রায় তিন বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছি। এখনো পূর্ণাঙ্গ লেখ্যরূপ ও উৎসমূল সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে গবেষক উলামায়ে কেরামদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য হচ্ছে—দীনের নিরঙ্কুশ বিজয়ের অর্থ হচ্ছে ইলমি এবং গবেষণাজাত বিজয়। এটা সুনিশ্চিত সত্য যে, ইলম ও গবেষণায় ইসলামই বর্তমান বিশ্বের একক ধর্ম; যা দালিলিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, যৌক্তিক এবং সহজাত চাহিদার

[৬] সুরা আনফাল : ২৮।

মাণদণ্ডে পূর্ণতার স্তরে উপনীত। ইসলামই একমাত্র ধর্ম; যার বুনিয়াদি শিক্ষা, যার ধর্মগ্রন্থ, যার রাসুল সা.-এর সিরাত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত। যে ধর্মে এত বেশি গবেষণা, শিক্ষসাসেবা ও লেখা বিদ্যমান; যার উদাহরণ পৃথিবীর কোনো ধর্মে নেই। যার অনুসারীরা এত বিস্তৃত আঙ্গিকে সেবা করে গেছেন যে, এক-একটি শাখাগত বিষয়েও শত শত গ্রন্থ বিদ্যমান। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখার পরিমাণ এত অধিক, যা একত্র করলে এক-একটি লাইব্রেরি হয়ে যেতে পারে। বিপরীতে পৃথিবীতে প্রচলিত বড় বড় ধর্মগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে তাদেরকে যোজন যোজন পেছনে পাওয়া যায়। তাদের মূল পুঁজি কিছু আখ্যান; যা দলিল হবার যোগ্যতা রাখে না। তাদের ধর্মগুরুদের চলার পাথেয় হচ্ছে কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা; যা প্রতিটি বিষয়ের সাথে আপস করে চলে। যার কোনো দালিলিক ভিত্তি নাই। যেগুলো কিছু প্রথার মধ্যেই সীমিত। তাদের ধর্মীয় গবেষণা ও বাণী মানবজাতির ক্রমোন্নত চিন্তার সঙ্গ দিতে অক্ষম। অনৈশ এবং আঞ্চলিক ধর্মগুলোর কথা বাদ দিলেও যে ধর্মগুলোর রয়েছে ঐশী ভিত্তি এবং পৃথিবীতে রয়েছে যার কোটি কোটি অনুসারী, সেসব ধর্মের পাশাপাশি যদি ইসলামকে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও বিজ্ঞানের তোলাদণ্ডে মাপা হয়, তাহলে আকাশ-পাতাল তফাৎই দৃশ্যমান হবে। তখন সবাইকে একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রজ্ঞা ও গবেষণায় ইসলামের কোনো দৃষ্টান্ত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই নিরঙ্কুশ।

- কিন্তু রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব কি আয়াতের মর্মে উদ্দিষ্ট নয়?

- বস্তুগত এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটা হচ্ছে, কমপক্ষে দু-বার এমন সুযোগ এসেছিল যখন মুসলমানরা আক্ষরিক অর্থেই পুরো বিশ্বের উপর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নিতে পারত। তখন তারা গৃহবিবাদ আর ব্যক্তিস্বার্থকে পেছনে ঠেলে সামনে অগ্রসর হতে পারলে অবশ্যই তারা আজ পুরো ভূমণ্ডলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী হয়ে যেত। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে যখন তারা মাত্র দু-চার পা দূরে, তখন গৃহবিবাদ তাদেরকে সে অবস্থান থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তারা জাতির স্বার্থচিন্তাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সে সম্ভাবনার গলা টিপে ধরে। সেই ক্ষমাহীন অপরাধই তাদেরকে সেই কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে রাখে; যার তিক্ত ফল এ পর্যন্ত মুসলিম জাতি ভোগ করে চলছে।

- সে ক্ষণ দুটি কোন কোনটি ছিল?'

- আমরা তাকদিরের ব্যাপারে কথা বলছি না। কারণ, তাকদিরের ব্যাপারে 'যদি-কিন্তু' করার কোনো অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন শয়তানি প্ররোচনা ছাড়া কিছু নয়। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতাগুলোকে ওই আঙ্গিকে আলোচনা করে

যেতে পারে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ওই ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে নিরাপদ থাকে। জেনে রাখা দরকার যে, কুদরত আমাদেরকে পুরো ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সুযোগ ও উপকরণ উদার হস্তেই দান করেছিল। কিন্তু তারপরও আমরা দীর্ঘ পরাজয় আর অধীনস্থতার যে বেদনাদায়ক কালপর্ব অতক্রম করছি, শত আন্দোলন আর ত্যাগ তিতিক্ষার পরও ব্যর্থতার চোরাবালি থেকে উঠে আসতে না-পারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভিশাপ বৈ কিছুই নয়।

ক্ষণ দুটির মধ্যে প্রথমটি উপস্থিত হয়েছিল আজ থেকে ঠিক ৬০১ বছর পূর্বে ২০ জুলাই ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৬ জিলহজ ৮০৫ হিজরি আঙ্গুরার ময়দানে। সেখানে দুজন মুসলিম মহানায়ক জাতির দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইতিহাসের অতুলনীয় দুই দিগ্বিজয়ী। একজন ছিলেন প্রাচ্যের ত্রাস আর অপরজন ছিলেন পাশ্চাত্যের আতঙ্ক। একজন প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন বিশাল সাম্রাজ্য, অপরজন পাশ্চাত্যে উড়িয়ে চলছিলেন বিজয় নিশান। সেদিন মহান এই দিগ্বিজয়ীদ্বয় এক হয়ে গেলে অত্যন্ত সহজেই পুরো ভূমণ্ডলে উড়িয়ে দিতে পারতেন ইসলামের চাঁদ-তারা-খচিত পতাকা। তখন আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বে প্রতিষ্ঠা হয়ে যেত ইসলামের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। এদের একজন ইউরোপে বিশাল বিজয় অর্জন করে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি এবং ফ্রান্স পদদলিত করে কড়া নাড়াচ্ছিলেন ইংল্যান্ডের দরজায়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশচুম্বি। তিনি প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতেন—খ্রিষ্টজগতের কেন্দ্রীয় গির্জা সেন্টপিটার্সের আঙ্গিনায় তাঁর ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবেন। তাঁর তীব্র আঘাত এবং বীরত্বে মুগ্ধ পিতা তাঁকে দিয়েছিলেন 'ইলদারাম' তথা বজ্রের খেতাব। ইউরোপের শাসকশ্রেণি তাঁর বীরত্ব, দুঃসাহস এবং যুদ্ধ-অভিজ্ঞতায় ছিল এতটাই সন্ত্রস্ত যে, তারা স্বপ্নে দেখত—তাঁর ঘোড়ার পদতলে তাদের ভূমি দলিত-মথিত হয়ে চলেছে।

অপরজন ছিলেন প্রাচ্যের এক জীবন্ত আতঙ্ক। যার তলোয়ারের সামনে ঠিকে থাকার সাধ্য ছিল না কারও। পুরো মধ্য-এশিয়া বিজয় শেষে বিশাল হিন্দুস্তানে হামলা চালালে তাঁর সৈন্যদের সামনে হিন্দুস্তানের সৈন্যরা থালায় সাজিয়ে রাখা গাজর আর শসা ছাড়া অন্য কোনো মূল্য রাখছিল না। চাইলে তিনি আরও পূর্বদিকে এগিয়ে চীনকেও ইসলামি শাসনের অধীনে নিয়ে আসতে পারতেন। এরপর জাপান সাগর পাড়ি দিয়ে আজকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎস কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান এবং ফিলিপাইনসহ দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোও কব্জায় নিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না। তখন পরিচিত বিশ্ব এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রাচ্য এবং

পাশ্চাত্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারলে পরবর্তীতে আবিষ্কৃত আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া এমনিতেই ইসলামের ছায়াতলে বেড়ে উঠত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আঙ্গুরার ময়দান তাঁদের মধ্যখানে বাধার পর্বত হয়ে দাঁড়ায়।

উভয় বীর ছিলেন দুই সিংহতুল্য। তাঁদের সে টক্কর ছিল অত্যন্ত ভয়ানক। যার পরিণতি ছিল একের ধ্বংস এবং অপরজনের আরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠা। কিন্তু ধ্বংসটা যদি স্রেফ কোনো ব্যক্তির বা রাষ্ট্রবিশেষের হতো, তাহলে এতটা দুঃখ লাগত না। দুঃখটা ভারি হবার কারণ ছিল; এ যুদ্ধ উম্মাহর একটি সোনালি স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন বানিয়ে ফেলে। মুসলিম জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আঙ্গুরার ময়দানে দাফন করে দেয়। এদের একজন তো পরাজয়ের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে অল্পদিন পরই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান আর অপরজন যদিও পরে তার মহা ভুল বুঝতে পেরে তা শুধরে নেওয়ার প্রয়াস চালান; কিন্তু বয়স তাকে সঙ্গ দেয়নি। কেননা, ততদিনে তার বয়স সত্তরের কোটা পাড়ি দিয়ে ফেলে। এভাবেই সেদিন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

সুলতান বায়েজিদ খান ইলদারাম (১৩৮৯-১৪০২) ছিলেন উসমান খানের বংশধারার এক প্রদীপ্ত সূর্য। কসোভার[৭] ময়দানে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করার পর সেই রণক্ষেত্রেই মুকুট ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার বনেছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তাঁর বিজয়ী পিতা এক আহত ইউরোপীয় সেনার ধোঁকায় পড়ে শাহাদত বরণ করলে বায়েজিদের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা, বীরত্ব, সাহস ইত্যাদি বিবেচনায় সকল তুর্ক সরদার ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁকে সুলতান হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

কসোভোর ওই যুদ্ধে তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, তা এককথায় ছিল অতুলনীয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে সম্মিলিত ইউরোপীয় বাহিনীর চাপে মুসলিম-বাহিনীর পা টলে উঠলে বায়েজিদ তখন একটা লৌহমুগুর হাতে নিয়ে শত্রুবুহ্যের একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁর সেই প্রচণ্ড আক্রমণই যুদ্ধের মোড় পালটে দেয়। যারা একটু আগে বিজয়ের সুবাস পাচ্ছিল এখন তারা যে যেদিকে পারছিল প্রাণ হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছিল। বায়েজিদ তখন পলায়নপর ওই বাহিনীকে ধাওয়া করে সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেন। পিতা মুরাদ পুত্রের এহেন বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সেদিন তাঁকে 'ইলদারাম' (বজ্র) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। যে উপাধিটি পরবর্তীতে তাঁর নামের অংশ হয়ে যায়।

[৭] হ্যাঁ, সেই কসোভো, যেখানে বলকানের কসাই মিরোশ্লাভ নিরীহ মুসলমানদের রক্ত পান করেছে।

তিনি ছিলেন প্রথম উসমানি সুলতান, যিনি আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর কাছ থেকে নিজ নামে সুলতান উপাধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পূর্বে উসমানি সুলতানদের আমির বলা হতো।[৮]

কসোভো বিজয়ের পর উসমানি গাজিদের মোকাবিলায় হাঙ্গেরি পথের মধ্যখানে পড়ে থাকা একটা পাথর ছাড়া আলাদা কোনো মর্যাদা রাখত না। চাইলে তারা যেকোনো মুহূর্তে সেটা সরিয়ে ফেলতে পারতেন। একটু কষ্ট করে ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকান। দেখেন হাঙ্গেরির পর আর কী বাকি থাকে। সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স? এর পরেই তো সেই স্পেন, যেখানে তখন চলছিল মুসলিম উমাইয়াদের শাসন। পথের এ দুটো কাটা উপড়ে ফেললেই পুরো ইউরোপ হাতে এসে পড়ত পাকা আপেলের মতো। তেমন হলে অবশ্যই আজ ইউরোপ আমাদের হাতেই শাসিত হতো। ইউরোপীয়রা অবস্থার ভয়াবহতা ভালো করেই টের পাচ্ছিল। অবস্থা আঁচ করেই হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ড পুরো ইউরোপসহ পোপের দরবারে সাহায্যপ্রার্থী হয়। সবাই শঙ্কাগ্রস্ত ছিল, বিধায় পোপদের জোরালো ভূমিকা রাখার প্রেক্ষিতে ক্রুসেডের ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে ইউরোপের প্রতিটি যুবক হাঙ্গেরি রক্ষার আগ্রহ ও উত্তেজনার পাশাপাশি ইউরোপ থেকে মুসলমানদের সমূলে উৎখাতের লক্ষ্যে পাগলপ্রায় হয়ে ওঠে। এ ছিল স্মরণাতীতকালের বিশাল যৌথবাহিনী। উক্ত বাহিনীর কমান্ডারদের মনে তাদের বিজয় সম্পর্কে এতটাই প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তারা এ বলে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছিল—'যদি আসমানও আমাদের মাথায় ফেটে পড়তে চায়, তাহলে সেটা আমরা বর্শার মাথায় আটকে ফেলব।'

তারা বিজয় উদযাপনের জন্য নর্তকীদের সাথে নিয়ে এসেছিল। এদের নাচের আমেজে তাদের শিবিরকে থিয়েটারের আসর মনে হচ্ছিল। সুলতান বায়েজিদ তখন এশিয়া কুচাকে[৯] অবস্থান করছিলেন। ক্রুসেডবাহিনীর ইচ্ছে ছিল তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর রাজধানী পদদলিত করে সিরিয়া পৌঁছে যাবে। অতঃপর ফিলিস্তিন কব্জা করে মুসলমানদের কাছ থেকে বায়তুল মাকদিস দখল করে নেবে। কিন্তু পথে তারা নিকোপোলিসের দুর্গে এলোমেলো হয়ে যায়। সেখানকার তুর্কি কমান্ডার ইউগুলুনবেগ বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের বিশাল বাহিনীকে আটকে দিয়ে ইউরোপীয় ভূখণ্ডেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলেন।

[৮] যদিও ইতিহাসবিদরা তাঁদেরকে সুলতান নামেই স্মরণ করে থাকেন।

[৯] 'কুচাক' মানে মাইনর বা ছোট। 'এশিয়া মাইনর' বলতে বর্তমান তুরস্ক, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সম্মিলিত ভূখণ্ডকে বোঝাত।

সুলতান বায়েজিদের দ্রুতগামিতা ছিল প্রবাদের মতো। তিনি তাঁর বাহাদুর সর্দারের বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে নিকোপলিসে উপস্থিত হয়ে ইউরোপীয় বাহিনীকে তাদের বাড়িতেই ঘেরাও করে ফেলেন। যদি তারা কোনো উপায়ে উসমানি এলাকায় পৌঁছে যেতে পারত তাহলে মুসলমানরা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে যেতেন।

নিকোপোলিস একটি প্রসিদ্ধ শহর। বর্তমানেও শহরটি এ নামেই পরিচিত। ২৩ জিলকদ ৭৯৮ হিজরি মোতাবেক ২৪ সেপ্টেম্বর ১৩৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী ওই ময়দানে ইউরোপীয় বাহিনী ছিল গল্পগুজবে মত্ত। তারা নর্তকীদের নাচ-গান উপভোগ করা অবস্থায় হঠাৎ করেই জানতে পায় সুলতান বায়েজিদ খানের বাহিনী তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। সংবাদটা তারা বিশ্বাসও করতে পারছিল না। কারণ, সুলতান-বাহিনী এত দ্রুত এখানে পৌঁছে যেতে পারে—এটা ছিল তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাদের বিশ্বাস ছিল—তিনি এলেও এ বিশাল বাহিনী দেখে বসফরাস পাড়ি দেওয়ার সাহস দেখাবেন না। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে, খ্রিষ্টান কামান্ডার আর সৈন্যরা ছিল অসংখ্য যুদ্ধে পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতায় হৃদ্ধ। যেন ইউরোপ তাদের বাছাই করা সৈন্যগুলোর সমাবেশ ঘটিয়েছিল। তারা বায়তুল মাকদিসের আগে কোথায়ও থামবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

বায়েজিদ ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে দেড় লক্ষাধিক সৈন্যের মোকাবিলা করার কৌশল ভালো করেই জানতেন। তিনি নিয়মিত বাহিনীকে পেছনে রেখে জেনেসারি[১০] নামক একটি কমান্ডোদলকে সামনে রেখে দেন। ক্রুসেডাররা তাদেরকে ক্ষুদ্র-ছোট্ট গ্রাস মনে করে জোরালো হামলা চালিয়ে অতি সহজেই তাদেরকে অতিক্রম করে অনেকটা সামনে এগিয়ে যায়। সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পায় তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বায়েজিদের নিয়মিত বাহিনী। ওই বাহিনী দেখে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেও সৈনাধিক্যের অহমিকায় তারা সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা আবেগ ও উত্তেজনায় এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে, যেখান থেকে পিছিয়ে আসার আর কোনো উপায় ছিল না। এখন তাদের সামনে সুলতানের চৌকস নিয়মিত বাহিনী আর পেছনে সেই দুর্ধর্ষ জেনেসারি বাহিনী—যারা প্রথমে দুর্বলতা দেখিয়ে তাদেরকে ফাঁদে ফেলেছিল। এ পর্যায়ে সুলতান ক্ষুধার্ত চিতার ক্ষিপ্রতায় হাঙ্গেরির বাদশাহর দিকে অগ্রসর হন। ক্রুসেডবাহিনী প্রাণপণ লড়ছিল; কিন্তু মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে তাদের প্রতিরোধ ভেঙে যায়। তারা ভয়ানকভাবে পর্যুদস্ত হয়। তাদের অসংখ্য বীর মুসলিম-বাহিনীর তলোয়ারের শিকারে পরিণত হয়। গ্রেফতার হয় হাজার

[১০] উসমানি বাহিনীর জগদ্বিখ্যাত ইউনিটের নাম।

হাজার সৈন্য। বন্দিদের মধ্যে ছিল হাঙ্গেরি, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার অসংখ্য নবাব, নবাবপুত্র ও স্বীকৃত জেনারেল।

নিকোপোলিসের মাঠে খ্রিষ্টানদের যে বাহিনী সুলতানের মোকাবিলায় এসেছিল, তারা ছিল সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী এবং পূর্ণাঙ্গ বাহিনী। কিন্তু সুলতান তাদের পরাজিত করে ইউরোপের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। এর ফলে ইউরোপের সর্বত্রে সুলতানের নামের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের বিশ্বাস জন্মে যায়— সুলতান যে বলছেন একদিন তিনি রোমের সর্ববৃহৎ গির্জার আঙ্গিনায় তাঁর ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবেন, সেটা অবশ্যই বাস্তবায়ন করে ছাড়বেন। আসলে বায়েজিদের জন্য তখন তাঁর সে অভিলাষ চরিতার্থ করা তেমন কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তিনি সেদিকে অগ্রসর হবার আগে কুসতুনতুনিয়ার কায়সারের[১১] ব্যাপারটি দেখে নিতে চাইছিলেন। সে বার বার সন্ধি করার পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে চলছিল। এ ছাড়া তিনি জানতে পারছিলেন কায়সার তাঁর বিরুদ্ধে আমির তৈমুরের সহায়তা চেয়েছে।

সুলতান তখন এগিয়ে গিয়ে কুসতুনতুনিয়া অবরোধ করে বসেন। ইতিহাসবিদরা লেখেন—'সুলতান তখন সেই সোনালি ক্ষণের দ্বারপ্রান্তে ছিলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে মুহূর্তের জন্য মুসলিম উম্মাহ আশার প্রহর গুণছিল। কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের পর তাঁর বাহিনীর ঘোড়াগুলোর পরবর্তী লক্ষ্য হতো রোমান পোপদের সেই সর্ববৃহৎ গির্জা। এরপর তিনি ইউরোপের বক্ষ মাড়িয়ে একেবারে ইংল্যান্ডের দরজায় গিয়ে থামতেন। তখন স্পেনের দুর্বল মুসলিম সাম্রাজ্যও তাদের মধ্যে নবপ্রেরণার শিহরণ অনুভব করতো। কিন্তু যুবক সুলতান যখন এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলছিলেন, যখন তিনি পুরো ইউরোপে ঝাণ্ডা উড়াবার দ্বারপ্রান্তে, তখন বিশ্বমুসলিম এ হতাশাজনক সংবাদ পায় যে, প্রাচ্যের বুড়ো যুদ্ধবাজ তৈমুর লং সুলতান বায়েজিদের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য দ্রুত ছুটে আসছেন।

[১১] রোমান সম্রাটদের রাজকীয় উপাধি।

ইউরোপের দুটি তদবির

বীরত্ব, হিংস্রতা এবং হত্যাযজ্ঞে তৈমুর লং তার দাদা চেঙ্গিস খান থেকে মোটেও কম ছিলেন না। ব্যবধান ছিল কেবল এইটুকু যে, চেঙ্গিস ছিলেন ইসলামের শত্রু অমুসলিম আর তৈমুর ছিলেন মুসলিম। কার্যত কিন্তু উভয়েই ছিলেন মুসলিম জাতির ব্যাপক ক্ষতির কারণ। জীবনভর তাদের রক্তপায়ী তরবারি পান করে গেছে নিরপরাধ মুসলমানদের রক্ত। চেঙ্গিস খানের দুষ্ট হাতে নিভেছিল বাগদাদের সৌভাগ্যসূর্য আর তৈমুরের অভিশপ্ত হাত জ্বলতে দেয়নি ইউরোপে মুসলমানদের সৌভাগ্য-প্রদীপ।

কুসতুনতুনিয়ার কায়সার বুঝতে পেরেছিল বায়েজিদ এমন এক বীরপুরুষ, যিনি তাঁর দুর্ভেদ্য শহর-পাঁচিলে ইসলামের চাঁদ-তারা-খচিত পতাকা না উড়িয়ে ছাড়বেন না। তাই আত্মরক্ষার চিন্তায় সে এমন দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা ছিল খ্রিষ্টবাদীদের শেষ কৌশল। একটি ছিল মুসলমানদের চারিত্রিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে দেওয়া। অপরটি ছিল তাদের মধ্যে আত্মকলহ জাগিয়ে তোলা।

কসোভো যুদ্ধের পর সার্বিয়ার বাদশাহ অত্যন্ত বিনীতভাবে বায়েজিদের অনুগত হয়ে যায় এবং তার বোনকে সুলতানের হেরেমে ঢুকিয়ে দেয়। ইউরোপীয় শাসকশ্রেণি কর্তৃক প্রেরিত সুন্দরী এই ললনাদের প্রধান টার্গেট ছিল উসমানি শাসকদেরকে ইন্দ্রিয়পূজা, মদ্যপান এবং বিলাসিতায় ডুবিয়ে দেওয়া। ফলে দেখা যায়, ক'দিন যেতে না যেতেই সে বাহাদুর শাসকরা; যারা প্রবল শক্তিমান শত্রুকে কোনো পরোয়া করতেন না—তারা ওই ক্রুসেডকন্যা আর শয়তানের রশির ফাঁদে আটকে গেছেন। ওই ললনাদের প্রথম টার্গেটই ছিল সেই মুজাহিদ এবং দরবেশ গুণে গুণান্বিত বাদশাহদের ঠোঁটে মদের পাত্র তুলে দেওয়া। তারা জানত—এমনটা করতে পারলে ওরা নিজেরাই চরিত্রের অতলে নেমে যাবে। কেননা, মদ্যপানের পর একজন মানুষ উন্নত চরিত্রের অধিকারী থাকতে পারে না।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত গর্বভরে উল্লেখ করে থাকে যে, সুলতান বায়েজিদই হচ্ছেন সেই প্রথম সুলতান, যিনি বাহাদুর এবং দুঃসাহসী হবার পরও ইউরোপের গোপন চক্রান্তের শিকার হয়ে মদ্যপানে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ, যে কাজটা তাদের দুঃসাহসী বীরপুরুষরা আঞ্জাম দিতে পারেনি, সেই কাজটি তাদের সুন্দরী ললনারা পূর্ণভাবেই আঞ্জাম দিতে পেরেছিল।

কায়সারের দ্বিতীয় অভিসন্ধি ছিল মুসলমানদের সরলতার আর তাদের প্রতারণার সুস্পষ্ট উদাহরণ। সে অত্যন্ত বিনীত ও খোশামোদি-ভাষায় তৈমুরকে তার কল্যাণকামিতার আশ্বাস দিয়ে সুলতান বায়েজিদ সম্পর্কে এমন পত্র লেখে, যা পড়ে শত্রুর জীবন্ত আতঙ্ক তৈমুর এই প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যান। কায়সার অত্যন্ত আকুতিমাখা ভাষায় তৈমুরকে উদ্দেশ্য করে লেখে—

'মহামান্য আমির! বর্তমান সময়ে আপনার জন্য হিন্দুস্তান অপেক্ষা সুলতান বায়েজিদের দিকে নজর দেওয়া অপরিহার্য মনে করি। আমি মনে করি আপনি যদি বায়েজিদ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করেন, তাহলে জগৎখ্যাত বীর হিসেবে বিষয়টি হবে ঐতিহাসিক লজ্জার। বায়েজিদ আপনার বিদ্রোহী নেতা আহমদ জালাইর আর ইউসুফ তুর্কমানকে আশ্রয় দিয়ে প্রকারান্তরে আপনার ইজ্জতের গালে চপেটাঘাত হেনেছেন।

স্মরণ রাখবেন, বায়েজিদ ইউরোপ জয়ের পর আপনাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। তিনি নিজেকে একক বিশ্বনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই আপনার উপর চড়াও হবেন। অতএব, আমার অভিমত হচ্ছে বায়েজিদকে পূর্ণশক্তি অর্জনের সুযোগ না দিয়ে এখনই তার অধীন এশীয় অঞ্চলে হামলা করা। কেননা, তার অধীন অঞ্চল প্রাকৃতিক বণ্টন-বিচারে আপনার অধীন হবার দাবি রাখে। আমি আশ্বাস দিয়ে বলতে চাই, আপনি এ লক্ষে এগিয়ে আসলে আমাদের দ্বারা সম্ভব সবটুকু সাহায্য পাবেন।'

কায়সারের এ পত্র তৈমুরের ভাবনার জগৎ ওলটপালট করে দেয়। তার দৃষ্টি হিন্দুস্তান থেকে ফিরে যায়। তার কাছে তখন হিন্দুস্তানের বিপুল বিত্ত-বৈভবের কোনো মোহ থাকেনি। বায়েজিদকে ছোট করে দেখানোর পাগলামিটা এমনভাবে তৈমুরের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, তার মনে হতে থাকে—এটা করতে না পারলে তার জীবনটাই যেন অর্থহীন।

তৈমুরের কাছে কায়সারের পত্রটা যখন এসে পৌঁছায়, তৈমুর তখন দিল্লি শহর তছনছ করে হরদুয়ার অঞ্চলে তাবু ফেলে আরও পূর্বদিকে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা করছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল হিন্দুস্তান বিজয় শেষে পিতৃভূমি মঙ্গোলিয়া জয় শেষে চীন, জাপান, কোরিয়া ও থাইওয়ান পদানত করে আরও দূরপ্রাচ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু ততক্ষণে কায়সারের পত্র তার মস্তিস্কে বিষের ন্যায় ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল। ফলে চক্রান্তে আক্রান্ত তৈমুর হিন্দুস্তানের সদ্যবিজিত অঞ্চলে কোনো

প্রতিরোধ-ব্যবস্থা না রেখেই ওইগুলোকে স্বামীহারা বিধবার মতো অভিভাবকহীন উজাড় ও বিরান রেখে সমরকন্দের পথ ধরেন। এ সময় তার বাহিনীর সাথে ছিল প্রায় লক্ষাধিক হিন্দুস্তানি বন্দি। তৈমুরের কাছে তখন এদেরকে টেনে নেওয়া অর্থহীন ভারি বোঝার মতো লাগছিল। তাই পথেই ওদেরকে নিঃশেষে খতম করে সমরকন্দে এসে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছেই বায়েজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করে দেন। তখন তার সারাটা চিন্তা-চেতনা জুড়ে কেবল একটাই ধ্যান—কীভাবে বায়েজিদকে বিশ্বে খাটো করে দেখিয়ে নিজেকে একক বিশ্বনেতা হিসেবে প্রদর্শন করা যায়।

কয়েক বছর পূর্বে *সিংহের লড়াই* শিরোনামে নিবন্ধে ওই হতাশা ও বেদনাদায়ক যুদ্ধের নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। তখন সমর এবং সামরিক ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহী জনৈক ব্রিগেডিয়ারের পত্র পাই। তাঁর অনুরোধে এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার কয়েকটা পৃষ্ঠার স্ক্রিনশট পাঠিয়েছিলাম। যেখানে কিছু জায়গায় দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিই। তিনি সেগুলো পাঠ করে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন—'অবশ্যই বায়েজিদ ও তৈমুরের মধ্যকার লড়াইটা ছিল খ্রিষ্টানদের চক্রান্তের ফসল। মুসলমানদের সরলতা নতুন কোনো বিষয় নয়।' কিন্তু আফসোস লাগে খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের উপর; তারা দায় স্বীকারের পরিবর্তে বলে বেড়ায়—'আঙ্গুরার যুদ্ধ প্রমাণ করে যীশু খ্রিষ্টানদের পক্ষে'। নিজেদের সুন্দরী কন্যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে এবং মিথ্যা ও দাগাবাজির আশ্রয়ে অর্জিত বিজয়কে যদি কোনো আত্মমর্যাদাহীন জাতি আল্লাহর করুণা হিসেবে আখ্যা দিতে চায়, তাহলে আমাদের কী আর বলার থাকে?

মোটকথা, ২০ জুলাই ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দে সেই দুর্ভাগ্যের দিন এসেই যায়। সেদিন আঙ্গুরার ময়দানের ভ্রাতৃঘাতী লড়াইটা ছিল জাতির ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ইতিহাসের করুণতম অধ্যায়। এখানে পৌঁছে ঐতিহাসিকরা দুর্ভাগ্যের সে অধ্যায়টা কালো রক্ত দ্বারা লিখে থাকেন। তৈমুর সমরকন্দ থেকে ৫ লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়ে আঙ্গুরার পার্শ্ববর্তী মাঠে এসে তাবু ফেলেন।

আমি অনেক চেষ্টা করেও প্রাচীন এবং সমকালীন ভূগোল ঘেঁটে আঙ্গুরার সে ময়দানটি চিহ্নিত করতে পারিনি। তবে ড. হুসাইন মুনিসের *উতলুসু তারিখিল ইসলাম* কিতাবে কেবল এটুকু উল্লেখ আছে—'এবং দুটি শক্তির মধ্যে ইতিহাসের মোড় নির্ধারণী এ লড়াইটা আঙ্কারার পাশেই সংঘটিত হয়েছিল।'[১২] এতে অনুমিত

[১২] *তারিখিল ইসলাম*: ৩৮৫।

হয়—স্থানটা ছিল তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আঙ্কারার পাশেই। খুব সম্ভব আঙ্কারা আঙ্গুরার পরিবর্তিত রূপ। বায়েজিদের অধীনে সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ ২০ হাজার। এদের অধিকাংশকে তিনি কুসতুনতুনিয়ার অবরোধ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। উভয় বাহিনীতে ছিল পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৈন্যদল। খ্রিষ্টানদের প্রত্যাশানুযায়ী লড়াইটা হয়েছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

যুদ্ধে সুলতান সৈনাপত্য এবং বীরত্বের অবিস্মরণীয় পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ইউরোপ বিজয়ের জন্য নির্ধারণ করা তাঁর স্পেশাল-বাহিনীও চরম বীরত্বের স্বাক্ষর রাখে। কিন্তু যুদ্ধটা ছিল ১ লাখ ও ৫ লক্ষাধিকের মধ্যে।[১৩] যদি যুদ্ধটা হতো অমুসলিম আর মুসলিমের মধ্যে, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকটা রেকর্ড হয়ে থাকত। কিন্তু উভয় পক্ষেই ছিল মুসলমান। তাই সুলতানের বাহিনী গরিষ্ঠতার উপর বিজয়ী হতে না পেরে নিজেরাই পিষ্ট হয়ে যায়।

সুলতানের যুদ্ধ-পরিকল্পনা ছিল পূর্বের মতোই নিখুঁত। বীরত্ব এবং বাহাদুরি প্রদর্শনেও কোনো প্রকার ঘাটতি ছিল না। তিনি আজীবন ঘোড়ার পিঠেই কাটিয়েছেন। প্রতিটি ময়দানেই উন্নত সামরিক প্রজ্ঞা দেখিয়ে গেছেন। সেদিনও স্বল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে বার-কয়েক তৈমুরের বিশাল বাহিনীর সারি তছনছ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় বুড়ো তৈমুরও ছিলেন পাথরের মতো অটল। বার বার আক্রান্ত হবার পরও তার সংকল্প টলে ওঠেনি। তিনিও ঠান্ডা মাথায় ছত্রখান হয়ে যাওয়া বাহিনীকে একত্র করে পালটা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর সূর্য বিদায় নেবার ক্ষণে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ একটা সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়।

উক্ত যুদ্ধে বাহ্যত একটি বাহিনী বিজয়ী হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃত অর্থে উভয় বাহিনীই হেরে বসেছিল। বিজয়ী হয়েছিল ইউরোপ। বিজয়টা ছিল চক্রান্তপ্রিয় খ্রিষ্টানদের। তারা তখন স্বস্থির নিঃস্বাস নিতে পেরেছিল। আধমরা দেহে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। দুই বিশ্ববিজেতার এ টক্কর ছিল মুসলমানদের কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। প্রাচ্যে যেমন তৈমুরের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তেমনি পাশ্চাত্যে বায়েজিদকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো কেউ ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মুসলমানদের অপরাজেয় এ দুই শক্তি বিদ্যমান থাকায় প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত[১৪] মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ছিল মাত্র কয়েক বছরের ব্যাপার। যদি তারা কেউ একগুয়েমি ও হিংসার শিকার না হতেন, অপরের পথে বাধা হয়ে না

[১৩] কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তৈমুরের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮ লাখ। তবে ৫ থেকে ৬ লাখের ভেতরে যে ছিল—এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

[১৪] অর্থাৎ, তখন পর্যন্ত জানা পুরো পৃথিবীতে।

দাঁড়াতেন, তাহলে তাদের কোনো দুর্নাম হতো না; বরং তারা যে ধর্মের নামধারী ছিলেন, সে ধর্মটা সারাটা বিশ্বে বিজয়ী হয়ে যেত। কিন্তু জাতি হিসেবে মুসলমানদের শাস্তি পাওয়া ছিল অনিবার্য এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়। সুলতান বায়েজিদ তৈমুরের হাতে পরাজিত ও বন্দি হয়ে যান।

উসমানি সাম্রাজ্যের এ মহান দিগ্বিজয়ী ছিলেন প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবান। তাঁর পক্ষে পরাজয় ও বন্দিত্বের লাঞ্ছনাময় জীবনযাপন সম্ভব ছিল না। কীভাবেই বা সম্ভব, যে বীর একসময় ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম সেনাপতিদের এই বলে নিঃশর্তে মুক্তি দিতেন—'তোমরা এখানে আসার কষ্ট স্বীকার করছ কেন? যাও, গিয়ে প্রস্তুতি নাও, আমিই বরং তোমাদের ওখানে আসছি।' কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সে সিংহ আজ খাঁচায় অসহায়ভাবে বন্দি। বড় কোনো অপরাধ ছাড়া তাঁরই এক ভাই ধ্বংস করে ফেলে তাঁর শক্তির মেরুদণ্ড। বিশাল সাম্রাজ্যটা বণ্টন করে দেয় স্থানীয় আমির-উমারার হাতে।

সুলতানকে তাঁর পুত্রসহ বন্দি করা হয়েছিল। তিনি বার-কয়েক পালাবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। তৈমুর তাঁকে এক জায়গায় না রেখে সঙ্গে করে ফিরতেন। একজন আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি কি এমন অপমান সহ্য করতে পারে? না, পারে না। সুলতান বায়েজিদও পারেননি। তাই বন্দিত্বের মাত্র আট মাসের মাথায় বিশাল হতাশা বুকে চেপে তিনি দুনিয়া থেকেই বিদায় হয়ে যান।

আঙ্কারার ময়দানে তৈমুর লং পরাজিত হলে পরাজয়টা হতো কেবল ব্যক্তি তৈমুরের। মুসলিম বিশ্বের কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু বায়েজিদের পরাজয় মুসলিম বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার গলা টিপে ধরে। তাদের হতাশার অশ্রু রক্তলাল হয়ে ঝরতে থাকে। কারণ, তাঁর পরাজয় মুসলিম জাতির ইউরোপ জয়ের আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচনা করে ফেলে।

বলা হয়, তৈমুরের ন্যায় লাখ লাখ বনি আদমের হন্তা, ওই বাহাদুর যুবক সুলতানের ইনতেকালের পর নিজের আবেগকে দমিয়ে রাখতে পারেননি। সুলতানের মৃত্যু তার হৃদয়েও প্রচণ্ড ঝড় তুলে। তার পাষাণ চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে। সেদিন তিনি তার ভুল উপলব্ধি করতে পারেন। সেদিন তার মানসিক অবস্থাই জানান দিচ্ছিল—ওই অশ্রু ছিল প্রচণ্ড অনুশোচনার, অনুতাপের, আত্মধিক্কারের। কিন্তু তখন এ অনুশোচনার কোনো মূল্য ছিল না। তৈমুর তখন অত্যন্ত সম্মানের সাথে সুলতানের মরদেহ তাঁর পুত্রের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেন; যাতে পিতার

লাশ বারোসায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে উসমানি সুলতানদের পাশে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দিতে পারেন।

তৈমুর তখন তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আদায়ের লক্ষে চীন বিজয়ের ইচ্ছা করেন। কিন্তু ততদিনে তার বয়স ৭০-এর কোটা পাড়ি দিয়ে ফেলে। ফলে বয়স তার ইচ্ছার সঙ্গ দিতে পারেনি। তার পক্ষে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। অতঃপর দু-বছরের মাথায় এ অনুশোচনা নিয়ে তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

এ মহান দুই দিগ্বিজয়ী আপনাপন অবস্থানে থেকে যদি একে অপরকে সহায়তা দিতেন, তাহলে আজ পুরো বিশ্ব হতো মুসলমানদের। তাদের ভুলের কারণেই তাদের পরবর্তী বংশধারা হয়ে ওঠে ইউরোপের করুণা ও দয়ার পাত্র। আজও মুসলিম উম্মাহকে সে ভুলের মাশুল-স্বরূপই সাগর-সাগর রক্ত ঝরাতে হচ্ছে। আজ বিশ্বমুসলিম এতটাই স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে যে, বার বার কুদরতের পক্ষ থেকে সাবধান করার পরও তারা শত্রুর চাল বুঝে উঠতে পারছে না। একসময় মুসলমানদের ফাঁদে ফেলতে যে ইউরোপকে তাদের মা-বোনের ইজ্জত ব্যবহার করতে হতো, আজ সেই মুসলমানদের ফাঁদে ফেলার জন্য তাদের বাজারি নারীদের ছবিই যথেষ্ট। ইউরোপ থেকে আমদানি হয়ে আসা লাম্পট্যপনা, নির্লজ্জতা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বের চক্রান্ত আমাদেরকে কোন উচ্চতা থেকে কত নীচে নামিয়ে দিয়েছে—আমরা সেটা অনুমান করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু হায়, আজও আমরা সেই ভাগাড়েই আতর খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই জাহান্নামেই জান্নাতের আরাম অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছি।

থেকে নিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী জর্জিয়া পর্যন্ত এবং গঙ্গা থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৈমুর ছিলেন একজন স্বভাবজাত লড়াকু। তার যৌবন অতিবাহিত হয়েছিল প্রতিবেশী তাতারিদের সাথে লড়াই করে। মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে সমরকন্দকে রাজধানী ঘোষণা করেছিলেন। এরপর বিজয়ের যে ধারা শুরু করেছিলেন তার মোকাবিলায় আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যকে মনে করা হতো অতি সাধারণ। ৩৫ বছরেরও কম সময়ে জয় করেছিলেন ২৭টি দেশ। ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন ৯টি রাজবংশ। তার অবাককরা দিগ্বিজয় কেবল ব্যক্তিগত দুঃসাহস এবং প্রায়-অলৌকিক সামরিক প্রজ্ঞার ফলাফলই ছিল না; বরং অকল্পনীয় এ বিজয়ের পেছনে তার যুদ্ধকৌশল এবং প্রজাদরদি শাসনব্যবস্থারও ছিল বিশাল ভূমিকা।

তিনি সেনাবাহিনী, আদালত এবং অর্থনীতির জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন, তা তার দূরদর্শিতা ও চিন্তার পরিপক্কতার পরিচায়ক। তার গোয়েন্দারা বিভিন্ন বেশে; বিশেষ করে পর্যটক এবং দরবেশের বেশে সর্বত্র ঘোরাফেরা করতো। এদের প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট গোয়েন্দা-বিভাগে সংরক্ষণ এবং পূর্ণ যাচাই-বাচাই করা হতো। এর মাধ্যমে তৈমুর আগেই প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা জানতে পারতেন।

সেনাবাহিনীর উপর তার কন্ট্রোল ছিল এতটাই সুদৃঢ় যে, তারা তার নির্দেশে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে কেবল যে জীবনের ঝুঁকিই নিত তা-ই নয়; বরং বিজয় যখন একেবারে সুনিশ্চিত, ঠিক সেই মুহূর্তে যদি তিনি যুদ্ধ বন্ধের কিংবা লুটতরাজ থামানোর নির্দেশ জারি করতেন, তাহলে সৈন্যরা যেমন এককদমও অগ্রসর হতো না, তেমনি সাথে সাথে তারা হাত গুটিয়ে নিতে দেরি করতো না। অধীনস্থদের সাথে তার আচরণ ছিল ভদ্র এবং দয়ালু অভিভাবকতুল্য। তাদেরকে অকাতরে দান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু যারা বিরোধিতা করতো তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিতেন, যা দেখে মানুষের লোমকুপ কাটা দিয়ে উঠত।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে—তৈমুর ভীতি ও হিংস্রতা প্রদর্শনকে রাজ্য বিস্তারের একটা মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছিলেন। তার দেওয়া শাস্তি দেখে মনে হতো এটা কোনো আকস্মিক উত্তেজনার ফলশ্রুতি নয়; বরং অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্ত।

মোটকথা, পুরো বিশ্বজুড়ে তার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় বড় বাদশাহরা তার নাম শুনে কেঁপে উঠত। তিনি একের পর এক দেশ জয় করেই চলছিলেন।

অপরদিকে ইউরোপ সীমান্তে[১৫] ভূমধ্যসাগর থেকে নিয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিপুল-বিস্তৃত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল উসমানি সাম্রাজ্য। যার কর্তৃত্ব ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহহৃদয় সুলতান বায়েজিদ ইলদারামের হাতে। তুর্কি ভাষায় ইলদারাম মানে বিদ্যুৎ। বায়েজিদ ছিলেন সহজাত বীর। যুদ্ধমাঠে তিনি শত্রুর উপর বজ্রবৎ টুটে পড়তেন; বিধায় তাঁর উপাধি পড়েছিল ইলদারাম। বায়েজিদ তাঁর পিতা মুরাদ খানের যুগে একাধিক যুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার দরুন; বিশেষ করে কসোভো যুদ্ধে পুরো ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করতে অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপনের দরুন পিতা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইলদারাম উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তাঁর পিতা জনৈক খ্রিষ্টান সরদারের ধোঁকায় পড়ে শাহাদত বরণ করেন।

ঘটনা হচ্ছে, পরাজিত খ্রিষ্টান-বাহিনীর জনৈক সার্বীয় নেতা ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে মুসলিম শিবির অভিমুখে ফিরে আসে। সে মুসলিম সেনাদের উদ্দেশ্য করে বলে—'আমাকে জীবিত গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে নিয়ে চলুন। আমি খ্রিষ্টধর্মের সত্যতার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ। আমি মুসলমান হতে চাই এবং সুলতানের কাছে কিছু গোপন তথ্য ফাঁস করতে চাই।'

যখন বিশেষ বন্দিদের সুলতানের দরবারে পেশ করা হয় তখন একপর্যায়ে তাকেও সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। লোকটি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সুলতানের পায়ে মাথা রেখে দেয়। অতঃপর অকস্মাৎ একটা খঞ্জর বের করে সুলতানের উপর আঘাত করে বসে। সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ লোকটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে কঠিন আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল। আঘাতের ফলে সুলতান শাহাদত বরণ করেন। বিজয়ের পর যখন শাহজাদা বায়েজিদ বিজয়ীর বেশে উপস্থিত হয়ে পিতার হাতে চুমু খেতে চাচ্ছিলেন তখন তাঁর সব আনন্দ ফিঁকে হয়ে যায়। কেননা, পিতা তখন শাহাদতের দ্বারপ্রান্তে। পিতার মৃত্যুর পর সকল সেনাপতিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিনি পরবর্তী সুলতান হিসেবে মনোনীত হন।

কসোভোর এ যুদ্ধকে ইতিহাসের একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে গন্য করা হয়। ইতঃপূর্বে কেবল বাইজেন্টাইনরা এককভাবে উসমানীয়দের সাথে লড়ছিল। এ যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো পুরো ইউরোপ একত্র হয়ে মুসলমানদের পিষে ফেলতে এসেছিল। কিন্তু পরিণামে তারাই পিষে যায় এবং শাম ও ফিলিস্তিন জয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদের দেশ রক্ষার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়।

[১৫] এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কায়সারের সাম্রাজ্য; যাকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামে অভিহিত করা হয়।

পায়ের আওয়াজ

উসমানি সাম্রাজ্য সৌভাগ্য-বলেই সুলতান বায়েজিদের ন্যায় একজন দুর্ধর্ষ, দূরদর্শী, প্রজাদরদি ও উত্তম চরিত্রের শাসকের সেবা পেয়েছিল। পুরো ইউরোপকে দেখে নেওয়া ছিল তাঁর আজন্ম স্বপ্ন। চাইলে তিনি ইরান, খোরাসান, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার দিকে বের হয়ে বিশাল বিজয় অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু কেবল রাষ্ট্র-সম্প্রসারণই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। পূর্বসূরিদের মতো তাঁর মধ্যেও ধর্মপরায়ণতার উপস্থিতি ছিল পূর্ণমাত্রায়। বিদ্রোহের খবর পাওয়ার পরও মুসলিম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সহজে তলোয়ার উঠাতে যেতেন না। তিনি ছিলেন তাঁর বাপ-দাদার নীতির উপর অটল। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে শক্তি ক্ষয়ের পরিবর্তে ইউরোপে আক্রমণ চালিয়ে অমুসলিম সাম্রাজ্যগুলো নিজ কব্জায় নিয়ে আসা এবং অন্ধকার ইউরোপে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই ক্ষমতায় আরোহণের পরের বছর তথা ৭৯৩ হিজরিতে যখন শুনতে পান—বিজিত ইউরোপীয় অংশে বিদ্রোহ ধুমায়িত হয়ে উঠছে, সার্বিয়া ও বসনিয়া অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে; তখন তাঁর জিহাদের আগ্রহও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। তিনি তখন ঝঞ্ঝার আকারে ইউরোপের উপর আছড়ে পড়ে বসনিয়া থেকে দানিয়ুবের তীর পর্যন্ত পুরো বলকান অঞ্চল জয় করে উসমানি সাম্রাজ্যকে ফুরাত থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন। এরপরও তিনি ইউরোপ ভূখণ্ডে যতগুলো বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন, তা চিরকালের মুসলিম ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি হিসেবে স্মরণ হতে থাকবে।

সার্বিয়া, ফিলাডেলফিয়া, আফলাক, ওয়ালাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া এবং গ্রিসসহ এমন কোনো জায়গা ছিল না, যা তাঁর সাথে মোকাবিলার সামর্থ্য রাখত। সৌভাগ্যক্রমে তিনি পেয়েছিলেন এক বাহাদুর পুত্র এবং অভিজ্ঞতায় হৃদ্ধ তুর্ক সেনাপতিদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য। এরা তাঁর ন্যায়পারয়ণতা এবং সামরিক প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে নিজ থেকেই হয়ে উঠেছিল তাঁর জন্য প্রাণোৎসর্গকারী। তিনি নিজেই ছিলেন একজন অদম্য বীর; বিধায় বীরদের তিনি অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন। কমান্ডাররা ময়দানে কার চেয়ে কে বেশি অবদান রাখবেন—সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন। সুলতানের পায়ের শব্দ শুনে তাদের অন্তরে শুরু হয়ে যেত আনন্দের তুফান।

তাঁর বাহিনী অস্ট্রিয়া হয়ে হাঙ্গেরি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হাঙ্গেরির পরেই ছিল সুইজারল্যান্ড। পরে ফ্রান্স, তারপরেই স্পেন। মাঝখানের এ দেশ তিনটি তাঁর অধীনে এসে গেলে তিনি ইউরোপের বুক মাড়িয়ে পশ্চিম স্পেন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারতেন। এমন হলে মুসলিম আন্দালুসিয়ার পতন হতো না। ইউরোপও কখনো মুসলমানদের হাতছাড়া হতো না। স্পেনের পরই ছিল ডোবার প্রণালী ও ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে গ্রেট-ব্রিটেন। যার শহরগুলো তখনকার সময় ছিল পঁচা আবর্জনার স্তূপ। সেদিন ওই শহরগুলোকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার মতো শক্তি তাদের ছিল না। স্বপ্নগুলো যদি ডানা মেলতে পারত তাহলে আজ ইউরোপ ইসলাম নিধনের কেন্দ্রভূমি হবার যোগ্যতা রাখত না। এর পরেই ছিল আটলান্টিক মহাসাগর। যার ওপারে তখনকার যুগে ছিল অজানা এক মহাদেশ তথা আমেরিকা। সেই আমেরিকাটা মুসলমানরাই আবিষ্কার করতো এবং তারাই হতো এর হর্তাকর্তা। ফলে আজ পাশ্চাত্য জগৎ তথা জাতিসংঘ মুসলমানদের দিকে চোখ রাঙাতে পারত না। না-ই-বা মুসলিমবিশ্ব আমেরিকার হিংস্রতা আর বর্বরতার শিকার হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সে মুহূর্তে দুই মুসলিম সিংহ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে ভেঙে ফেলে নিজেদের নখ-দাঁত। ফলে মুহূর্তেই বদলে যায় ইতিহাসের মোড়। ইউরোপ-আমেরিকার মতো চীন এবং জাপানও রক্ষা পেয়ে যায় মুসলিম আধিপত্যের কবল থেকে। হতাশার আঁধিয়ারা বয়ে যায় সোনালি স্বপ্নের উপর দিয়ে।

সিংহের লড়াই

দুই ঝড়

উসমানি সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল সূর্য সুলতান বায়েজিদ এবং তৈমুর লং ছিলেন ইসলামের দুই অজেয় সিংহ। তারা যদি ইগো সমস্যায় না ভোগে নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন, পৃথক পৃথক অবস্থানে আমৃত্যু বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যেতেন, অথবা একে অন্যকে সহযোগিতা যুগিয়ে যেতেন তাহলে আজ বিশ্বের মানচিত্রটাই হতো অন্যরকম। ইসলাম আজ থাকত এক অপরাজেয় শক্তি। সারাটা পৃথিবী থাকত মুসলমানদের করতলগত। কিন্তু কাফেরবিশ্ব ঠিকই তাদের ভবিষ্যৎ দুর্গতি প্রত্যক্ষ করতে পারছিল এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ শঙ্কামুক্ত করার লক্ষেই তারা ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়ে সেই সিংহদ্বয়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছিল। বীরদ্বয়ের স্বল্পকালীন সেই সংঘাত ছিল এতই ভয়ঙ্কর এবং এতই সুদূরপ্রসারী, যার পরিণতি আজ-অবধি মুসলিম বিশ্বকে ভোগতে হচ্ছে। এর ফলেই অমুসলিমবিশ্ব আজ নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত ও বিলাসী জীবন যাপন করছে।

বায়েজিদ ও তৈমুর ছিলেন দুই সর্বধ্বংসী ঝড়। তৈমুর বর্তমান ভারত, ইরান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কেমিনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কাজাখস্তান অধীনস্থ করে ফেলেছিলেন। তার সামনে ছিল কেবল চীন আর প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন ও থাইওয়ানসহ ছোটখাটো কিছু শক্তি। অপরদিকে সুলতান বায়েজিদ ছিলেন ইউরেশিয়ার বিশাল অঞ্চলের এক অপরাজেয় শক্তি। তিনি ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন ইউরোপের ঠিক কলিজার দিকে। ইউরোপের অমুসলিম শক্তিসমূহের সাথে জিহাদ ছিল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম বৃত্তি। তিনি নিকোপলিসের যুদ্ধে ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং জার্মানির যৌথবাহিনীকে এককভাবে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার পর তাদের পঞ্চাশোর্ধ্ব নেতাকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন—'তোমরা বাড়িতে গিয়ে হাত গুঁটিয়ে বসে থাকবে না; বরং আমার মোকাবিলায় আসার পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করে দেবে। আমি অচিরেই তোমাদের সামনে আসছি।' তাঁর সবচে বড় ইচ্ছেটা ছিল ইতালির রোম শহরে অবস্থিত ইউরোপের কেন্দ্রীয় উপাসনালয়ের আঙিনায় তাঁর ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবেন। তিনি একদিকে যেমন শত্রুদের সামনে এ অভিব্যক্তি

ব্যক্ত করতেন, তেমনি এ আশা বাস্তবায়নের তাওফিক প্রদানের জন্য নিভৃতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটিও করতেন। তাঁর সহজাত বীরত্ব, সুদৃঢ় মনোবল, সামরিক কৌশল ও যোগ্যতাদৃষ্টে এটা মোটেও অসম্ভব মনে হচ্ছিল না। তেমন হলে আজ ইতালিতে ভ্যাটিকেন সিটির[১৬] কোনো অস্তিত্ব থাকত না। না-ই-বা ওখানকার সংকীর্ণমনা পোপরা তাদের ধর্মীয় আসনে বসে 'আগামী শতাব্দী হবে খ্রিষ্টানদের' বলার দুঃসাহস পেত।

আজন্ম বিজয়ী

এ উভয় বীর ছিলেন আজন্ম বিজয়ী। তাদের অতিলৌকিক যোগ্যতার দরুনই শত্রুরা তাদের নাম শুনলেই কেঁপে ওঠতো। কোনো অবস্থায়ই এদের মোকাবিলার দুঃসাহস দেখাতে পারত না। তখনকার আজারবাইজান ছিল সাম্রাজ্য দুটির সীমান্ত নির্ধারক দেশ। ওই আজারি নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই মূলত এ বিশ্ববিজেতাদ্বয়কে পরস্পরের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল। আর সুযোগ বুঝে ইসলামের চিরশত্রুরা ছোটখাটো এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে বিশাল কাণ্ড বানিয়ে তুলে। যা ইসলামের বিজয়াভিযান এবং অপার সম্ভাবনাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

সীমান্তের ওই আজারি নেতারা যখন সুলতান বায়েজিদের কোনো পদক্ষেপকে খারাপ মনে করতো তখন তারা তৈমুর লংয়ের সাহায্যপ্রার্থী হতো। আবার তৈমুর যখন তাদের শাষাতেন তখন সুলতান বায়েজিদের দরবারে এসে আশ্রয়প্রার্থী হতো। এই ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে ইউসুফ তুর্কমান এবং আহমদ জালাইর নামক দুই আজারি নেতা সুলতান বায়েজিদের দরবারে এসে আশ্রয়প্রার্থী হলে সুলতান তাদেরকে তাঁর অধীন এলাকায় বসবাসের অনুমতি দিয়ে দেন। চক্রান্তপ্রিয় কায়সার বিষয়টা জানতে পেরে দুই সিংহকে মাঠে নিয়ে আসার জন্য ঘটনাটিকে আড়কাঠি হিসেবে দাঁড় করিয়ে মুসলিম শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে নিজেদের ভবিষ্যৎ শঙ্কামুক্ত করার প্রয়াস পায়।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে

স্বভাবজাত নীচু ও কুচক্রি কায়সার সুলতান বায়েজিদ খানের আশ্রিত হলেও পর্দার আড়াল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে ঘুঁটি চালিয়ে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে সুলতান তার আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে কুসতুনতুনিয়া অবরোধ করে তাকে চিরদিনের মতো পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু চতুর কায়সার চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে

[১৬] বিশ্ব ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের তীর্থস্থান।

সুলতানের সাথে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতে আরও বেশি কর আদায় করবে। এ ছাড়া কুসতুনতুনিয়ায় মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেবে। মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান মোতাবেক বিচারকাজ সম্পাদনের স্বাধীনতা প্রদান করবে। এতদ্ব্যতীত মুসলিম ব্যবসায়ীদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে। সুলতান বায়েজিদ সরল মনে তার এ অঙ্গীকারের উপর আশ্বস্ত হয়ে অবরোধ উঠিয়ে নেন। এ না-হলে ৮৫৭ হিজরি সনে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের মাধ্যমে যে অবিস্মরণীয় কাজ সম্পাদন করেছিলেন, তা ৫০ বছর পূর্বেই বায়েজিদের হাতে সম্পাদন হয়ে যেত। অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পরও হতভাগা কায়সার ইউরোপের নেতাদের সুলতানের বিরুদ্ধে অব্যাহত উসকানি দেওয়া অব্যাহত রাখে। সে তাদেরকে উসমানিদের অধিকৃত এলাকায় হামলার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে চলে।

ইউরোপের আর্তনাদ

৭৯৫ হিজরি সনে সুলতান তাঁর বড় ছেলে সুলায়মান পাশাকে বুলগেরিয়ার এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুলায়মান মাত্র তিন সপ্তাহের অবরোধের পর বুলগেরিয়া পদানত করে ফেলেন। সেখানকার রাজবংশ নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায় এবং পুরো বুলগেরিয়া তাদের কব্জায় চলে আসে। বুলগেরিয়ার পরই ছিল হাঙ্গেরি। বুলগেরিয়া পদানত হবার পর হাঙ্গেরীয়রা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। হাঙ্গেরির রাজা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পুরো ইউরোপের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়।

বাক্যটি আবার পড়ুন—একজনমাত্র মুসলিম শাসককে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত সিংহহৃদয় পুঙ্গবরা পুরো ইউরোপকে ডেকেছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি রোমান পোপরাও হাঙ্গেরির বাদশাহর ডাকে সাড়া দেয়। শুধু সাড়া দেওয়াই নয়; বরং তারা আরেক ক্রুসেডের ডাক দেয়। পোপদের ডাকে বিশাল এক ক্রুসেডবাহিনী তৈরি হয়ে ওঠে। সুলতান বায়েজিদের পিতা সুলতান মুরাদের যুগেও একবার পুরো ইউরোপ কসোভোর ময়দানে জমায়েত হয়েছিল। তখন তারা চূড়ান্ত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এবারও তারা একত্রিত হয়ে মাঠে বেরিয়ে আসে। এবার একত্রিত হয়ে মাঠে আসার পেছনে রোমান এবং গ্রিসের গির্জার পাদরিদের আহ্বান যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

রোমান পাদরিরা ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল—যেসব খ্রিষ্টান অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি পৌঁছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তাদের অতীতের যাবতীয় পাপ মোচন হয়ে যাবে। এদিকে তখন ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। কিন্তু ইউরোপের

গুরুত্বপূর্ণ নেতারা তাদের মধ্যে আপসরফা করে তাদেরকেও হাঙ্গেরির ময়দানে নিয়ে আসে। এভাবে প্রথমবারের মতো পূর্ব ইউরোপের পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপও একই সাথে ময়দানে নেমে আসে।

চরম ঔদ্ধত্যপনা

বলা হয়ে থাকে হাঙ্গেরির ময়দানে জমায়েত হওয়া ইউরোপীয় বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ। এ বাহিনীর বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কই তার অভিজ্ঞতম সেনাপতি এবং সৈন্যদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা লেখেন—'এবারকার ক্রুসেডবাহিনী এ হিসেবে আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিল যে, বাহিনীর প্রতিটি কমান্ডার এবং সৈন্য ছিল খ্যাতিমান যোদ্ধা। তারা এ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছিল যে, হাঙ্গেরির মাঠে সুলতানের বাহিনীকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং যুদ্ধ-জয় শেষে তারা কুসতুনতুনিয়ায় বিশ্রাম নিয়ে শামের দিকে অগ্রসর হয়ে শাম পদানত করে আরজে মুকাদ্দাসা তথা বায়তুল মাকদিস জয় করে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে পরাজয়ের শোধ নেবে। বাহিনীর কমান্ডারদের অন্তরে তাদের সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর এতটাই আস্থা ছিল যে, তারা ঔদ্ধত্যের সাথে বলে বেড়াচ্ছিল—'যদি আসমানও আমাদের উপর ফেটে পড়তে চায়, তাহলে আমরা সেটা তীরের ফলায় আটকে ফেলব।'

মোটকথা, পূর্ব ইউরোপের ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, জার্মানি এবং পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ অথচ কাপুরুষ যোদ্ধারা হাঙ্গেরির বাদশাহ সিগিসমুন্ডের নেতৃত্বে সুলতান বায়েজিদের উপর চড়াও হবার লক্ষ্যে এগিয়ে আসে। কনস্টান্টিনোপলের কায়সার যেহেতু ছিল সুলতানের ঘোরতর শত্রু, তাই সে প্রকাশ্যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও তাদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা যুগিয়ে যাচ্ছিল। প্রকৃত অর্থে সে-ই ছিল এই ক্রুসেডের নায়ক। সে-ই মূলত হাঙ্গেরির বাদশাহসহ পুরো ইউরোপকে 'তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার'—এই প্রচারণা চালিয়ে একজোট করে নেওয়ার নেপথ্য কারিগর ছিল।

গর্জনমুখর ঝড়

ক্রুসেডার খ্রিষ্টানদের এই ভয়ঙ্কর প্লাবন যখন এক ভয়াল ইচ্ছে বুকে ধারণ করে ধেয়ে আসছিল, তখন বায়েজিদ ছিলেন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের এশীয় এলাকায়। ক্রুসেডাররা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী লুটতরাজ চালিয়ে এগিয়ে আসছিল। পথে যেখানেই তারা কোনো মুসলিম বস্তি পেত তা ধ্বংস করে এগিয়ে আসত।

ফ্রান্সের ক্রুসেডাররা ইতঃপূর্বে সুলতানের যশ-খ্যাতির কথা শুনে থাকলেও কখনো তাঁর মুখোমুখি হয়নি। তাই অন্যদের তুলনায় তাদের উদ্দীপনা ছিল একটু আলাদা।

সুলতান তাঁর রাজধানী থেকে ছিলেন অনেক দূরে। ক্রুসেডবাহিনী যে গতিবেগে এগিয়ে আসছিল, সে গতিবেগ যদি অব্যাহত থাকত তাহলে খুবসম্ভব সুলতানের আগেই তারা তাঁর রাজধানী শহরে পৌঁছে যেত। তখন নিশ্চয় সুলতানের জন্য কাজটা কঠিন হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু পথে এক তুর্ক কমান্ডার সম্পূর্ণ একা এ বিশাল ক্রুসেডবাহিনীকে আটকে ফেলেন।

ক্রুসেডবাহিনী যখন ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়ে নিকোপোলিসের উপকণ্ঠে এসে উপনীত, তখন সেখানকার অখ্যাত এক তুর্ক কমান্ডার ইউগুলান অস্ত্র সমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যান। কঠিন অবরোধের পরও তিনি নির্ভিকচিত্তে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইউগুলানের এই বীরত্ব ছিল সুলতানের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। সুলতান সুযোগটা কাজে লাগিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসেন। ক্রুসেডাররা কল্পনাও করতে পারছিল না সুলতান এত দূর থেকে এত দ্রুত তাদের মাথার উপর এসে পড়বেন। তারা অহংকারে স্ফীত হয়ে প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছিল—'এবার সুলতান আমাদের ভয়ে ইউরোপে পা রাখারও সাহস করবেন না।' কিন্তু তারা নিকোপোলিসের ময়দানে ইউগুলানের সাথে জড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই সুলতান গর্জনমুখর ঝড়ের রূপ নিয়ে তাদের মাথার উপর এসে পতিত হন। তাঁর অপ্রত্যাশিত এ আগমনবার্তা শুনে ইউরোপীয় বাহিনী হতভম্ব হয়ে যায়। তাদের অন্তরে তখন এক হতাশায় মেঘ ছেয়ে যেতে থাকে।

তুমুল যুদ্ধ

দিনটি ছিল ২৩ জিলকদ ৭৯৮ হিজরি, মোতাবেক ২৪ সেপ্টেম্বর ১৩৯৬ খ্রিষ্টাব্দ। এদিন শুরু হয়েছিল সুলতানবাহিনীর সাথে সম্মিলিত ক্রুসেডবাহিনীর লড়াই। ফরাসি কমান্ডাররা ছিল খুবই উদ্দীপ্ত। তারা ছিল বাহিনীর সম্মুখসারিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা নিজেদের বোকামি টের পেয়ে যায়। নিকোপলিসের এই যুদ্ধ ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধতম যুদ্ধসমূহের একটি। মাত্র তিন ঘণ্টার ভেতরেই যুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে চলে যায়। সম্মিলিত ক্রুসেডবাহিনীর দম্ভ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাদের অজস্র সৈন্য যুদ্ধে কাটা পড়ে। রক্তে ময়দান রক্তজবার মতো টকটকে লাল হয়ে ওঠে। ১০ হাজারের মতো ক্রুসেডার-যোদ্ধা বন্দি হয়। এদের মধ্যে ৫০ জন ছিল অতি উঁচু স্তরের জেনারেল ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুবরাজ। হাঙ্গেরির রাজা কোনো মতে প্রাণ হাতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এই বিশাল বিজয়ের সংবাদ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সর্বত্র মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। বিজয়ের পর সুলতান সেইসব রাজ্যের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন যারা গাদ্দারি করেছিল। সুতরাং তিনি গ্রিস এবং সিসিলিতে হামলা চালিয়ে তা কব্জা করে নেন। কুসতুনতুনিয়ার কায়সারও যেহেতু পর্দার অন্তরালে থেকে কলকাঠি নাড়িয়েছিল, তাই সুলতান পুনরায় কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের ঘোষণা জারি করেন। সুলতানের নজিরবিহীন বীরত্ব, অসম সাহস এবং যুদ্ধকৌশল দেখে এটা যেকোনো অসম্ভব ঘোষণা ছিল না—এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিককে ঐকমত্য দেখা যায়। কিন্তু সেই আশা-উজ্জ্বল সময়ে ওই দুর্ভাগ্যজনক ট্রাজেডি সামনে চলে আসে, যা আলোচ্য প্রবন্ধের প্রকৃত আলোচ্যবিষয়।

হতাশার কবরস্থান

কায়সারের কূটচাল

নিকোপলিসের যুদ্ধে কায়সার খ্রিষ্টান যৌথবাহিনীর সাথে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল, একটা প্রতিশ্রুতির ভেতরে থাকার পরও সে যেভাবে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল; এর ফল কী হতে পারে—তা সে ভালো করেই জানত। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এবার সুলতান তাকে ক্ষমা করবেন না। এবার আর কোনো প্রতিশ্রুতিকেই তিনি পাত্তা দেবেন না। তাই ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখেই সে একটা কূটচালের আশ্রয় নেয়। সে দেখতে পাচ্ছিল তার স্বধর্মী ইউরোপীয় মিত্রদের কেউই সুলতানের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। অতএব, এদের কাছে সাহায্য প্রত্যাশার কোনো মানে নেই। সে সর্বাত্মক চেষ্টা করছিল যেকোনো উপায়ে তৈমুরকে সুলতানের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ কণ্টকমুক্ত করা। অতএব, তৈমুরের সাথে সৌহার্দ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে সম্ভব সবধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সে তখন অত্যন্ত বিনম্র ভাষায় তৈমুরের কাছে একটা পত্র প্রেরণ করে। মাওলানা আকবর শাহ খান নজিরাবাদির বর্ণনামতে পত্রখানা ছিল নিম্নরূপ :

> *'আমার সাম্রাজ্য হাজার বছরের প্রাচীন। মহানবি সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগেও কুসতুনতুনিয়ায় আমাদের রাজত্ব ছিল। বনি উমাইয়া এবং বনি আব্বাসিয়ার যুগেও আমরা তাদের সাথে সন্ধি করে সহাবস্থান করেছি। তাদের কেউই কুসতুনতুনিয়া দখলের ইচ্ছা করেননি। কিন্তু বর্তমান উসমানি সুলতান বায়েজিদ আমাদের কব্জাধীন বিপুল অঞ্চল দখল করে নিয়েছেন। এখন আমাদের সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র কুসতুনতুনিয়াও তাঁর রাক্ষুসে দাঁতের ভেতর। এমতাবস্থায় আমি একান্ত বাধ্য হয়েই আপনার সাহায্য ও দয়া প্রার্থী। এ মুহূর্তে বায়েজিদের বিরুদ্ধে আপনি ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনার জায়গা দেখছি না। আপনি যদি বায়েজিদকে মুসলিম এবং আমাকে অমুসলিম জ্ঞানে সাহায্য করতে না চান, তাহলে আমি আপনাকে*

নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই—আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বায়েজিদ ইউরোপ বিজয় শেষে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন—আপনার এ ভাবনা হবে নিতান্তই বোকামি। ইউরোপ বিজয় শেষে তার শক্তি হবে অসীম। দুনিয়ার কোনো পরাশক্তিই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারে না। বায়েজিদও আপনাকে সহ্য করবেন না। তিনি এখনই আপনার বিদ্রোহী ইউসুফ তুর্কমান এবং আহমদ জালাইরকে সম্মানজনক আতিথ্য প্রদান করে চলছেন। তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে রেখে আপনার শক্তি দুর্বল করার পরিকল্পনা আঁটছেন। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি প্রকাশ্যে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলা কি আপনার বীরত্বের গালে চপেটাঘাত হানা নয়?

আমি মনে করি, এ মুহূর্তে আপনার প্রথম প্রয়োজন হলো—এশিয়া মাইনরের অঞ্চলে হামলা চালিয়ে তা কব্জা করে নেওয়া। ভৌগলিক বিবেচনায়ও এ অঞ্চল আপনার কর্তৃত্বাধীন হবার কথা। অতএব, আশা করব আমাদের রক্ষার পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যতের লক্ষে আপনি এগিয়ে আসবেন। আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে সম্ভব সবধরনের সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার রইল।[১৭]

আত্মীয়তার আবেগ

তৈমুর তখন সবেমাত্র হিন্দুস্তানে কয়েকটি বড় আকারের যুদ্ধজয় শেষে বিশ্রামে ছিলেন। তার বাহিনী মুলতান এবং দিল্লি হয়ে গঙার প্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। তিনি হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবার অভিপ্রায়ী ছিলেন। হিন্দুস্তানের পর তার প্রথম টার্গেট ছিল চীন। কিন্তু কায়সারের চক্রান্ত ততক্ষণে রঙ ফলানো শুরু করেছিল। তৈমুর কায়সারের মতলবটা বুঝতে পারছিলেন। সে যে এর মাধ্যমে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চাচ্ছে—এটা বুঝতে তার কোনোই অসুবিধা হচ্ছিল না। তাই পত্রবাহককে কোনো জবাব না দিয়ে এমনিতেই ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পত্রে উল্লেখিত বিদ্রোহীদ্বয়কে বায়েজিদ কর্তৃক আতিথ্য প্রদানের বিষয়টি তার পৌরুষকে নিরন্তর আঘাত হেনে চলছিল। পাশাপাশি তার অধীন অঞ্চলে বায়েজিদ কর্তৃক হামলার সম্ভাবনাও তাকে প্রায় অস্থির করে তুলছিল। বিষয় দুটি তাকে এমনভাবে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল যে, একসময় হিন্দুস্তানসহ চীন বিজয়ের স্বপ্ন তার কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে।

[১৭] *তারিখে ইসলাম*: ১৩৫৭-১৩৫৮।

মানসিক এ দোলাচালে দুলতে থাকা তৈমুর একপর্যায়ে হিন্দুস্তানকে অরক্ষিত রেখেই রাজধানী সমরকন্দে ফিরে আসেন। সময়টা ছিল তার জীবনের সবচে' বড় মানসিক টানাপোড়েনের। যদি তিনি এ সময় আবেগকে সংযত রেখে বায়োজিদকে ইউরোপের দিকে মনোযোগী হবার সুযোগ দিতেন, তাহলে ব্যাপারটা হতো মুসলমানদের জন্য চিরকালীন একটা সৌভাগ্যের সিদ্ধান্ত। কসোভো ও নিকোপোলিসের যুদ্ধ ইতোমধ্যেই ইউরোপের শক্তির মাজা ভেঙে ফেলেছিল। বায়োজিদ উসমানীদের ইতালি জয় শেষে রোমান গির্জার আঙিনায় তার ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ানোর মহাযজ্ঞও ডানা মেলা শুরু করে দিয়েছিল। যদি তিনি কুসতুনতুনিয়া বিজয় শেষে ইউরোপের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতেন, তাহলে না আন্দালুসিয়া মুসলমানদের হাতছাড়া হতো না-ই-বা আটলান্টিকের দ্বীপ থেকে হিংস্র ইংরেজরা বেরিয়ে এসে মুসলিম বিশ্বের এত ক্ষতি করতে পারত। আফসোস! তৈমুরের এত শক্তি থাকার পরও তার আবেগকে কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হন।

আত্মার ফাঁদ

৭৫০ বছর আগে হজরত মুআবিয়া রা. রোমের কায়সারকে যে জবাব দিয়েছিলেন, তৈমুরও নিশ্চিতভাবে তাঁর যুগের কায়সারকে সেই একই জবাব দিতে পারতেন। তখনকার কায়সারও একই অভিসন্ধি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। সে চাইছিল—আলি এবং মুআবিয়া রা.-এর দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করে ফেলতে। কিন্তু মুআবিয়া রা. ছিলেন প্রিয়নবি সা.-এর সাহচর্য-ধন্য সাহাবি। নবিজি সা.-এর সাহচর্যের বদৌলতেই তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন। কায়সার শত প্ররোচনায়ও তাঁকে প্ররোচিত করতে পারেনি। তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা ছিল সাহাবায়ে রাসুল সা.-এর আত্মশুদ্ধির উজ্জ্বল প্রমাণ। ভবিষ্যতের মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশক। তিনি কায়সারকে লিখেছিলেন—

> *'কায়সার! যদি তোমার মোকাবিলায় আলি রা.-কে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে তাঁর সৈন্যদলের সম্মুখসারিতে যে সেনাপতি থাকবে, সে হবো আমি মুআবিয়া।'*

কিন্তু তৈমুরের দুর্ভাগ্য! তিনি আলেম-ওলামার সাহচর্যপ্রাপ্ত হয়ে আত্মাকে ইসলামের জন্য নিবেদন করতে পারেননি। অহমিকাবোধের গলায় ছুরি চালিয়ে জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। মুআবিয়া রা.-এর মতো বরকতময় সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। বায়েজিদের পক্ষ থেকে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে উদারতার সাথে তা ক্ষমা করতে পারেননি; বরং দেখে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। আর এভাবেই মুসলিম জাতি চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

বলকানের সিংহ

সুলতান বায়েজিদ তৈমুর লংয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত না-হয়ে হাঙ্গেরি এবং অস্ট্রিয়া বিজয় শেষে কুসতুনতুনিয়া অবরোধ করে বসা ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল দ্রুত কুসতুনতুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে ইতালিতে গিয়ে রোমান পোপদের খোঁজখবর নেবেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবতেও পারেননি আমির তৈমুর কায়সারের সহায়তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন।

তৈমুরকে বিশ্ববাসী ভয় করলেও সুলতান বায়েজিদের মনে তৈমুরের কোনো ভীতি কার্যকর ছিল না। তিনি ছিলেন আজন্ম লড়াকু ও সহজাত দুঃসাহসী। তৈমুরও সুলতান বায়েজিদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং দুর্দম সাহসের ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন না। তাই পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া মোকাবিলায় এসে পরাজয়ের তকমা নিয়ে ফিরে যেতে চাইছিলেন না।

তৈমুর কোনো ধরনের তাড়াহুড়োর আশ্রয় না নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শক্তি সংহত করতে থাকেন। এভাবেই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কায়সারীয় চক্রান্ত আলোর মুখ দেখতে থাকে। সুলতান বায়েজিদ ইলদারাম যখন গোয়েন্দা মাধ্যমে তৈমুরের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হন তখন তদীয় পুত্র উরতুগরুলের নেতৃত্বে উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত সিভাস নামক শহরে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেন; যাতে তৈমুর এগিয়ে এলে তাকে টিকিয়ে রাখা যায়।

অবস্থার বাধ্যবাধকতা

আগেই বলা হয়েছে অপরাপর উসমানি সুলতানদের মতো বায়েজিদও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইউরোপের সম্মিলিত ক্রুসেডারদের পরাজিত করে ইউরোপে ইসলামের বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখা। তাঁর সেনাবাহিনীর বীরত্ব আর খোদাভীতি দেখে এটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো মুসলমানের উপর তলোয়ার উত্তোলন না করার যে প্রতিজ্ঞা ছিল, তা থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়। কুসতুনতুনিয়া থেকে অবরোধ উঠিয়ে সেনাবাহিনীকে তৈমুরের মোকাবিলায় দাঁড় করাতে হয়। তৈমুর প্রস্তুতি সেরে নিয়ে বায়েজিদের কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন—'আমার বিদ্রোহীদ্বয়কে নিঃশর্তভাবে আমার হাতে তুলে দিন।'

কিন্তু বায়েজিদের আত্মমর্যাদা তৈমুরের এ আহ্বানে সাড়া দিতে পারছিল না। তিনি পরিষ্কার 'না' বলে দেন। যদিও বিদ্রোহীদের ব্যাপারটা কোনো বড় বিষয় ছিল না; কিন্তু কায়সারের চক্রান্ত তখন কাজ দেখানো শুরু করে দিয়েছিল। তৈমুর

একটিবারের জন্য ভেবে দেখেননি; বায়েজিদ কত বিশাল কাজ সমাধা করতে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে হটিয়ে নিয়ে আসা উম্মাহর জন্য কত বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। একবারও ভেবে দেখেননি; নিজে এত বড় দিগ্বিজয়ী হবার পরও তার তলোয়ার যেখানে অহর্নিশ মুসলমানদের নিরপরাধ রক্ত ঝরিয়ে চলছে, সেখানে বায়েজিদের তলোয়ার এ কলঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তৈমুর চিন্তা করে দেখেননি যে, তার তলোয়ার মুসলিম জাতিসত্তার ইজ্জত বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি করতে না পারলেও বায়েজিদের তলোয়ার উম্মাহকে করে তুলছিল গর্বিত ও আনন্দে স্পন্দিত।

বায়েজিদ সর্বাবস্থায় মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেন। এমনকি স্বজাতির রক্ত ঝরবে; শুধু এ কারণে অনেক সময় বিদ্রোহীদের ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু তৈমুর বায়েজিদের এই ধর্মীয় অবদানের কোনো পরোয়া না করে জবাব প্রাপ্তির পরপরই দ্রুত এগিয়ে এসে সিভাস শহরটি অবরোধ করে বসেন। অতঃপর চিরাচরিত হিংস্রতার প্রদর্শনী ঘটিয়ে উরতুগরুলসহ ৫ হাজার তুর্ক সৈন্যকে শহিদ করে সিভাসের কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেন।

প্রত্যাশার সমাধি

সুলতান বায়েজিদের চোখে তখনও ছিল ইউরোপ বিজয়ের রঙিন স্বপ্ন। তিনি বাধ্য হয়েই কুসতুনতুনিয়ার অবরোধ উঠিয়ে সেবাসের দিকে ধেয়ে যান। তাঁর সাথে সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লাখ ২০ হাজার। বিপরীতে তৈমুরবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষাধিক। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, সংখ্যাটা ছিল ৮ লাখের কাছাকাছি। সিভাসের ময়দান এত বিশাল বাহিনীর যুদ্ধের জন্য উপযোগী ছিল না। তাই বায়েজিদের আগমনবার্তা শুনে তৈমুর আঙ্কারার দিকে এগিয়ে আসেন। সেখানেই দুই বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি অবস্থানে তাবু ফেলে। উভয় পক্ষেই ছিল মুসলিম বিশ্বের চয়নকৃত ও অভিজ্ঞতায় হৃদ্ধ অসংখ্য যোদ্ধা। প্রাচ্যে যেমন তৈমুরের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, পাশ্চাত্যেও বায়েজিদের মোকাবিলা করার মতো কোনো শক্তি ছিল না। তাদের যে কারও পরাজয় ব্যক্তিবিশেষের পরাজয় ছিল না; ছিল ইসলামের বিশাল শক্তির পরাজয়। তারা যদি সেদিন যুদ্ধ এড়িয়ে পরস্পর আপসের পথে হাঁটতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তখনকার জ্ঞাত পুরো বিশ্বে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ত।

তৈমুরের সৈন্যসংখ্যা ছিল সুলতানের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি। বীরত্বেও তারা ছিল বিশ্বখ্যাত। তৈমুর ছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে অনমনীয়। ফলে দুই

বাহাদুর আঙ্কারার ময়দানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। অথবা বলতে পারেন দুটি সমুদ্র একটি আরেকটিকে ছোট করে দেখানোর জন্য ফুঁসে ওঠে। আর এভাবেই সংঘটিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচে বেদনাদায়ক ও সবচে ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ।

আকাঙ্ক্ষার পদদলন

১৯ জিলহজ ৮০৪ হিজরি, মোতাবেক ২০ জুলাই ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ দুই সিংহ একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ ছিল এমন এক ভয়ংকরতম যুদ্ধ, আকাশের চোখ ইতঃপূর্বে ভূপৃষ্ঠে এত বিভীষিকাময় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে কি না সন্দেহ।

তৈমুরের সৈন্যসংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশি এবং প্রাণবন্ত। পক্ষান্তরে সুলতানের বাহিনী ছিল অনেক ছোট এবং কুসতুনতুনিয়া অবরোধের ধকলে ক্লান্ত। কিন্তু তারপরও তৈমুরের বাহিনী উসমানীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে উপযুক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন না হবার অভিযোগ করতে পারবে না। এ দিন সুলতান সৈনাপত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পাশাপাশি শত্রুসারি-ভাঙ্গা বীর হিসেবে সবসময় ছিলেন সম্মুখসারিতে। তাঁর বীর সৈন্যরা বীরত্বের জৌলুশ দেখাতে একটুও পিছিয়ে থাকেনি। প্রতিপক্ষ অনেক ভারি হবার পরও সুলতানবাহিনী বার-কয়েক তাদেরকে তছনছ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধ সমানতালেই এগিয়ে যাচ্ছিল। স্বল্পসংখ্যক সেনা নিয়েও সুলতান যখন বিজয় প্রায় ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর বাহিনীর একদল তাতারি সৈন্য পক্ষ ত্যাগ করে তৈমুরের বাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এ সময় বায়েজিদের প্রাণ উৎসর্গকারী বেশ ক'জন বড়মাপের জেনারেলও মারা যান। তখন সুলতানের পাশে যে বাহিনী ছিল, তারা সংখ্যায় ছিল একবারে নগণ্য। কিন্তু তারপরও তারা বীরত্বের অকল্পনীয় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তারা যে বীরত্ব দেখাচ্ছিল তা ছিল প্রায় অলৌকিক।

সুলতান বায়েজিদ এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন যে, একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের সকল বাধা দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে সেই জায়গায় গিয়ে উপনীত হন, যেখানে দাঁড়িয়ে তৈমুর তার বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন। প্রাণ উৎসর্গকারীরা তাঁকে যথাযথ সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে বিরতিহীন লড়াইয়ে তারা ছিল একেবারে ক্লান্ত। মাগরিবের পূর্বেই তারা লড়াই করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যায়। সুলতান তখন সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অমিত-তেজা ওই সিংহ তখনও একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর একাকিত্বের সুযোগে পঙ্গপালের ন্যায় বিশাল বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে।

কোনো কোনো বর্ণনামতে—দূর থেকে তাঁর উপর ফাঁস ছুড়ে দিয়ে বন্দি করে নেওয়া হয়। আর কোনো বর্ণনায় দেখা যায়—শত্রুবাহিনী তাঁর ঘোড়ার পায়ে আঘাত হেনে তাঁকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিয়ে বন্দি করে নেয়। এভাবেই রাত আঁধার হতে হতে মুসলিম জাতির সোনালি ভবিষ্যতও গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আঙ্কারার অভিশপ্ত মাঠ হয়ে ওঠে মুসলিম জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বধ্যভূমি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বুকের আগুন

আঙ্কারার ময়দানে সুলতানের বন্দিত্ব মুসলিম বিশ্বের জন্য এমন এক হৃদয়বিদারক ঘটনা, যার কল্পনা অন্তরে হতাশা, আক্ষেপ ও মর্মযাতনার তুফান তুলে দেয়। যুদ্ধে তৈমুরের পরাজয় হলে ব্যক্তি তৈমুরের ক্ষতি হলেও জাতি থাকত ক্ষতিহীন। কেননা, প্রাচ্যে যে রাষ্ট্রগুলো তৈমুরের অধীন ছিল, সেগুলো কোনো অমুসলিম শক্তির হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, তৈমুর তো জীবনে কোনো অমুসলিম শক্তির সাথে জড়াননি। কিন্তু বায়েজিদের পরাজয়ের সাথে সাথে নিভে যায় উম্মাহর একটা প্রজ্জ্বলিত দ্বীপ। থমকে যায় মুসলমানদের ইউরোপ অভিমুখী অভিযাত্রা। আধমরা ইউরোপীয়দের দেহে ঘটে নবপ্রাণের উত্থান। তারা সমর্থ হয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার। এরপর তারা শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় উর্বর মুসলিম আন্দালুসিয়া। যে ইউরোপ ছিল মুসলিম অধ্যুষিত মহাদেশ হবার দ্বারপ্রান্তে, সেটা থেকে যায় খ্রিষ্টান অধ্যুষিত মহাদেশ হিসেবেই। যেখানে আজও তারা সেখানকার নামমাত্র মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে কোনো দ্বিধা করছে না। এ হতাশাজনক পরিণতির একমাত্র কারণ হচ্ছে তৈমুরের একগুঁয়েমি। আহ আফসোস!

'বুকের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে কলিজা ও ফুসফুস
নিজের চেরাগে নিজ ঘর জ্বালাল এক অন্ধ বেহুঁশ।

পাথরের অশ্রু

বায়েজিদের মতো প্রবল আত্মমর্যাদাবান ও আজন্ম বীরের পক্ষে কি বন্দিজীবন সহ্য করার মতো ছিল? না, তিনি এ অপমানের জীবন বেশিদিন সহ্য করতে পারেননি। ঘটনার মাত্র আট মাসের মাথায় তাঁর সিংহ-কায়া থেকে ঈগল-আত্মা দূর অজানায় পাড়ি জমায়।

সুলতানের বিয়োগ ছিল এতই শোকাবহ ঘটনা যে, ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়তে—তৈমুরের মতো পাষাণপ্রাণ মানুষের চোখ দিয়েও অশ্রু ঝরিয়েছিল। তৈমুর তখন সুলতানের ছেলে মুসাকে মুক্ত করে বলেন, 'চাইলে তোমার পিতার লাশ সাথে নিয়ে উসমানীয় সুলতানদের পাশে কবরস্থ করতে পারো।'

তৈমুর তার *তুজকে তৈমুরিতে* (দিনলিপি) এ যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। অথচ নিঃসন্দেহে এটা ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিজয়। নিঃসন্দেহে এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষই ছিল তার জীবনের সকল প্রতিপক্ষ অপেক্ষা কঠিন। তার এ নির্লিপ্ত বর্ণনা প্রমাণ করে বায়েজিদের ইনতেকালের পর তিনি প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ভোগছিলেন। এ কারণেই দেখা যায় অন্যান্য সাধারণ বিজয়ের বর্ণনায়ও তিনি যে আত্মম্ভরিতা ও উল্লাস প্রকাশসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন, আঙ্কারা বিজয় প্রসঙ্গে তেমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি। তার *তুজক* থেকে জানা যায়—তখনকার মুসলিমবিশ্ব তার এই বিজয়কে ঘৃণার চোখে দেখছিল।

বায়েজিদের অন্তর্ধানের পর তৈমুরও মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বেশি দিন বাঁচেননি। ওখান থেকে ফিরেই চীন বিজয়ের অভিপ্রায়ে বেরিয়ে পড়েন। বোধহয় এ অভিযানের মাধ্যমে ইতঃপূর্বের ভুলের প্রতিবিধান করতে চাইছিলেন। কারণ, এটাই ছিল কোনো অমুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে তার জীবনের প্রথম অভিযান। ইতঃপূর্বের প্রতিটি লড়াই ছিল আপন স্বজাতির বিপক্ষে। তখন প্রাচ্যে একমাত্র চীনই ছিল এমন অমুসলিম শক্তি, যে তার সাথে টক্কর দেওয়ার কিছুটা সাহস রাখত। কিন্তু তাকে চির হতাশা নিয়েই চীন অভিযানের পথে মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। শত্রুর চক্রান্তের শিকার ওই দুই সিংহের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা মুসলিম উম্মাহর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমূহ সম্ভাবনাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। সেই দ্বন্দ্বের কুফল উম্মাহ আজও ভোগ করে চলছে। আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে কখন এমন বিজয়ীর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি এ উভয় দিগ্বিজয়ীর অপূর্ণ অভিযান পূর্ণ করে পুরো বিশ্বকে ইসলামের আলোয় রাঙিয়ে তুলবেন।

বসফরাসের কিনারে

এই নিবন্ধের মূখ্য হচ্ছে সেই দ্বিতীয় সুযোগের আলোচনা, যেখানেও দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম উম্মাহকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সে মুহূর্তটির আলোচনার পূর্বে উসমানি সাম্রাজ্যের এক মহান বীরের এমন তুলনাহীন অবদানের কথা আলোচনা করা চাই, যার দর্শক ও শ্রোতাকে আজ-অবধি বিস্ময়ে অঙ্গুলি কামড়াতে দেখা যায়।

নামজাদা সেনাপতির নামজাদা দৌহিত্র

বায়েজিদ যখন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে নিয়েছিলেন এবং আশা করা হচ্ছিল অচিরেই তিনি শহরটি জয় করে উম্মাহর ৮০০ বছরের পুরানো স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে ইউরোপে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখবেন; তখন তৈমুর কর্তৃক তাঁর মোকাবিলার আসাটা ছিল চরম ভুল এবং মুসলিম জাতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী হতাশার কারণ। কেননা, পুরো ইউরোপ তখন বায়েজিদের ভয়ে থরথর করে কাঁপত। তাদের মধ্যে তাঁর মোকাবিলা করার মতো শক্তি ছিল না। কিন্তু আঙ্কারার ময়দানের অভিশপ্ত যুদ্ধ তাদের সবাইকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করে দেয়। যে মুসলিম বীরেরা ইউরোপীয়দের গোনায়ও ধরতেন না, তারা ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার পরিবর্তে বসফরাস প্রণালীর কাছেই থেকে যায়।

তৈমুরের হাতে সুলতান বায়েজিদ বন্দি হবার পর প্রকারান্তরে উসমানি সাম্রাজ্যই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কায়সার তার চক্রান্ত সফল হওয়ার ভিত্তিতে ছিল আনন্দে আত্মহারা। সে ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা ভাবছিল—তাদের শত্রুরা চিরদিনের মতো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সুলতানের ছেলে প্রথম মুহাম্মাদ প্রভুর দেওয়া বিস্ময়কর যোগ্যতা-বলে শুধু সাম্রাজ্যকে তার পুরানো ভিত্তির উপর মজবুতভাবে গড়ে তুলেননি; বরং মাত্র ১১ বছরের সংক্ষিপ্ততম সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে পূর্বের মতো এতটাই শক্তিশালী রেখে যান যে, একটি সাম্রাজ্যের

ধ্বংসাবশেষের উপর এত দ্রুত এমন বিশাল রাজত্বের অস্তিত্বকে ঐতিহাসিকরা তাঁর একটা কারামত[১৮] কাজ হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন।

সুলতান প্রথম মুহাম্মাদকে উসমানি সাম্রাজ্যের 'নুহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই দুর্জয় সুলতানের বংশধারায়ই জন্ম নেন দ্বিতীয় মুহাম্মাদ; যাঁর অনন্যসাধারণ কীর্তি আলোচনার লক্ষেই আমরা মূল আলোচনা থেকে কিছুটা দিক পরিবর্তন করছি।

শতাব্দীপ্রাচীন প্রত্যাশা

সুলতান মুহাম্মাদ দ্বিতীয় উসমানি খেলাফতের এমন এক মহাপ্রাণ দুঃসাহসী মুজাহিদ, যিনি কেয়ামত-অবধি কুসতুনতুনিয়া বিজয়ী হিসেবে প্রসিদ্ধির আকাশে উজ্জ্বল তারা হিসেবে আলো বিকিরণ করে যাবেন। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের এমন এক ক্ষণজন্মা দুর্জয় জ্যোতির্ময় যুবক, ইউরোপ তাদের হাজার বছরের ইতিহাস ঘেঁটেও যার তুলনা উপস্থিত করতে অক্ষম। মাত্র ২১ বছরের তরুণ যখন ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন, তখন তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কায়সার তার পিতৃপুরুষের চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী সুলতানের বিরুদ্ধে এখানে-সেখানে হাতাহাতি শুরু করে দেয়। সে সুলতানকে আরেকজন ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাবার হুমকি ছুঁড়তেও বাদ দেয়নি। সে তাঁকে একজন অনভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক মনে করতো। কিন্তু অচিরেই তার সে ভুল ভেঙে যায়। বুঝতে পারে তার এই পাগলাটে ও বোকামিপূর্ণ ধারণা যুবক সুলতানকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলছে। তিনিই শেষ পর্যন্ত কায়সার থেকে তাঁর দাদাকে হত্যা করানোর কঠিন প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কুসতুনতুনিয়া জয় করে উম্মাহর দীর্ঘ ৮০০ বছরের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন।

কুসতুনতুনিয়ার দুই উপহার

কুসতুনিয়া ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এক দুর্জয় শহর। পুরো শহরটি ছিল বিশাল উঁচু ও সুদৃঢ় দুর্গ পরিবেষ্টিত। শহরটির বিজয়ের সুসংবাদ এবং বিজয়ী মুজাহিদদের মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে খোদ প্রিয়নবি সা.-এর ভাষায়। আর সে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এ যাবৎ মুসলিম বাদশাহরা ১২ দফা শহরটি অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু কারও ভাগ্যে সে সৌভাগ্য জুটেনি।

কনস্টান্টিনোপল মূলত এশিয়া এবং ইউরোপের বিভক্তিরেখায় এমন এক উজ্জ্বল হীরাতুল্য শহর, যার উজ্জ্বল আলো চিরকাল দিগ্বিজয়ীদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। শহরটির ভৌগোলিক অবস্থান, চমৎকার আবহাওয়া, অনন্য নিরাপত্তাব্যবস্থা, প্রশস্ত

[১৮] পূণ্যবান মুমিনের পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়া অলৌকিক বিষয়।

বন্দর, বাজার, সড়ক, উঁচু উঁচু দালান, বিশাল অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দিক বিবেচনায় পৃথিবীব্যাপী সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়ে আসছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এই রাজধানী তার দুর্গের দৃঢ়তায়, দুর্ভেদ্যতায়, প্রাকৃতিক প্রহরায় সর্বকালের বিজয়ীদের মোকাবিলায় জগদ্দল পাথর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫৮ সালে শহরটি প্রতিষ্ঠা পাবার পর দুর্গব্যবস্থা দ্বারা দুর্ভেদ্য হিসেবে গড়ে ওঠা থেকে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের হাতে ১২ দফা অবরোধ হওয়ার পাশাপাশি মোট ২৯ বার বিভিন্ন বিজেতা কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিল। এর মধ্যে ৮টি অবরোধ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু তারপরও শহরটি অজেয় প্রমাণিত হয়ে আসছিল। সুলতান বায়েজিদের যুদ্ধকৌশল আর অসম সাহস দেখে মনে হচ্ছিল শহরটির অপরাজেয়তার রেকর্ডটি ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু কুদরত তো এ অনন্য সৌভাগ্য তাঁর দৌহিত্রের জন্য স্থির করে রেখেছিল। তিনি ছিলেন তাঁর রক্তের স্বার্থক উত্তরাধিকার। ইচ্ছার দৃঢ়তায়, বীরত্ব, দুঃসাহস ও কৌশল গ্রহণে তিনি ছিলেন এক অনন্য নওজওয়ান।

আমরা সামনে অগ্রসর হবার পূর্বে এ কথাটি বলতে চাই যে, এটাই একমাত্র শহর, যা বিশ্ববাসীকে দুটি জিনিসের সাথে পরিচিত করিয়েছিল। এক. রোমান আইন। দুই. ইউনানি বিজ্ঞান। তবে রোমান আইন ইতিহাসের থাপ্পড় খেয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলেও ইউনানি বিজ্ঞানের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া আজ-অবধি মুসলিম গবেষকদের জন্য একটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে আছে। যা 'হেকমত' শাস্ত্রের নাম নিয়ে আজও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পঠিত হয়ে আসছে।

সত্য ভবিষ্যদ্বাণী

হাদিসের অন্যান্য কিতাব ছাড়াও *বুখারি শরিফে* সেই হাদিস বিদ্যমান, যেখানে কনস্টান্টিনোপলে হামলাকারী মুসলিম মুজাহিদদের মাগফিরাত এবং সুসংবাদ বর্ণনার পাশাপাশি এ বিষয়েও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শহরটি প্রথম আক্রমণে বিজিত হবে না। কারণ প্রিয়নবি সা.-এর ওই হাদিসে বিজেতার পরিবর্তে গাজির কথা বিদ্যমান। বলা হয়েছে—'আমার উম্মতের যে বাহিনী সর্বপ্রথম কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তারা হবে ক্ষমাপ্রাপ্ত।'[১৯] অন্যত্র বলা

[১৯] *বুখারি* : ২৯২৪। হাদিসে মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের কোনো শহরে প্রথম অভিযান পরিচালনাকারীদের ব্যাপারে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আর কায়সার সাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপলে মুসলমানরা প্রথম অভিযান পরিচালনা করেছিল। সে হিসেবে অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত। - *অনুবাদক*

হয়েছে—'অবশ্যই তোমরা কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। কতো সৌভাগ্যবান হবে সে বাহিনী ও তার অধিপতি।'[২০] প্রিয়নবি সা. শহরটি বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়ার পাশাপাশি বিজয়ী বাহিনী ও তার সেনাপতির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, ঐতিহাসিকদের মতে কনস্টান্টিনোপল বিজয় ছিল তাঁর বাল্যকালের স্বপ্ন। আজ যে বয়সে আমাদের সন্তানরা তাদের মাম ও ডেডিদের কাছে ললিপপের আবদার করে থাকে, কার্টুন দেখে বিনোদিত হয়, খেলাধুলার রেকর্ড মুখস্থ করার চেষ্টা করে, সে বয়সে ওই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সবচে দুর্ভেদ্যতম দুর্গটি পদানত করার আশা বুকে লালন করতেন। এরপর রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাবার সাথে সাথে সেই আরাধ্য স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে জগদ্বাসীকে বিস্ময়-বিমোহিত করে দেন। নবিজি সা.-এর সুসংবাদের দাবিদার বনে যান।

হাদিসে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রসঙ্গটি দু-দফায় এসেছে। প্রথম দফার বিজয় তো ইতোঃমধ্যেই বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দফার বিজয়ের কথা এসেছে কেয়ামতের নিদর্শনাবলির বর্ণনা প্রসঙ্গে। বলা হয়েছে—'মাহদি আ.-এর নেতৃত্বে শহটি পুনর্বিজিত হবে। এবং মুসলিম-বাহিনী গনিমতের মাল বণ্টন করে নেওয়ার আগেই সংবাদ আসবে যে, ইহুদিদের বিশ্বনেতা দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটে গেছে। তখন মাহদি আ. সেখান থেকেই দাজ্জালকে ধাওয়া দেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়বেন।'[২১]

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফলে ইউরোপ জয়ের চাবি মুসলমানদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু হায়! তারা পুনর্বার আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। আর কালপরিক্রমায় আজ তাদের ও আমাদের অবস্থান হচ্ছে—আমরা ইউরোপীয়দের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছি। তাদের দেশের শ্রমিক হওয়াকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করছি। দ্বিতীয়বার কনস্টান্টিনোপল জয়ের পর আমাদের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। ইনশাআল্লাহ সেদিন পুরো ইউরোপ আমাদের হস্তগত হবে। আর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া নামক যে দুটি মহাদেশ তারা আবিষ্কার করে তাদের শাসন ও ধর্মীয়ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে, ইনশাআল্লাহ সে দুটো মহাদেশও আমাদের কব্জায় চলে আসবে। এভাবেই দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

[২০] *মুসনাদে আহমদ* : ১৮৯৫৭; শায়খ শুয়াইব আরনাউত তাহকিককৃত। ইমাম হাইসামি রাহ. বলেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ, বাজজার এবং তাবারানি রাহ. বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী সকলেই ছিকাহ তথা গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত। *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ*: ১০৩৮৪; দারুল ফিকর, বায়রুত। -*অনুবাদক*

[২১] *মুসলিম*: ৭৪৬০। শায়খ ফুয়াদ আবদুল বাকি কর্তৃক তাহকিককৃত। -*অনুবাদক*

বাস্তবায়িত হবে। মুসলমানরা তাদের প্রথম ভুলের কাফ্ফারা আদায়পূর্বক স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সুসংবাদ-সংক্রান্ত হাদিস সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্ ভালো করেই জানতেন। বাপ-দাদাদের বংশানুক্রমিক অসিয়তও তাঁর স্মরণে জাগ্রত ছিল। এ ছাড়া কায়সার থেকে দাদা হত্যার প্রতিশোধস্পৃহাও তাঁকে তাতিয়ে রেখেছিল।

ইতোঃমধ্যে বাইজেন্টাইন সম্রাট সুলতানের বাপদাদার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে উসমানি শাসনাধীন এলাকায় হামলার হুমকি দেওয়া শুরু করে দিয়েছিল। তার এ হুমকি ছিল 'ষাঁড়! এসো আমাকে মারো'-এর মতো। কায়সারের এ আচরণ সুলতানের অন্তরে শহরটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগুনে যেন ঘৃতাহুতির কাজ দিচ্ছিল। সুলতান তখন কুসতুনতুনিয়া বিজয়কে তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে নেন। তিনি এতটাই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, রাতভর বিছানায় পড়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করতেন আর শহরটি পদানত করার কথাই ভাবতেন। একরাতে অস্থিরতা এ পর্যায়ে চলে যায় যে, মধ্যরাতে তিনি মন্ত্রী খলিল পাশাকে ডেকে পাঠান। খলিল উপস্থিত হলে বলেন, 'আমার অস্থিরতা দেখতে পাচ্ছো? আমি তোমার ও তোমার সাথিদের কাছে একটিই প্রশ্ন রাখতে চাই—কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের জন্য তোমরা আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে কি?' বিশ্বস্ত মন্ত্রী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখন শান্ত করার প্রয়াস পান।

যেহেতু কুসতুনতুনিয়া ছিল বাইজেন্টাইন সম্রাটদের রাজধানী এবং সেখানকার অজেয় কেল্লায় বসেই যেহেতু বাইজেন্টাইন সম্রাটরা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সবধরনের শত্রুতা চালিয়ে যাচ্ছিল; এ জন্যেও তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সুলতানের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর আবেগ কখনো বিবেকের গণ্ডিকে এবং সাহস কখনো কৌশলের বেড়াকে ডিঙিয়ে যায়নি। তিনি জানতেন কুসতুনতুনিয়া হবে তাঁর সামনে একটি দুর্লঙ্ঘ বাধা। যে বাধাকে নিখুঁত পরিকল্পনা, অনুপম কৌশল এবং অশ্রুতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন ব্যতিরেকে উতরে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি ইতিহাস থেকে ইতঃপূর্বের সবকটি অবরোধের ফলাফল গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সেগুলোর ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করে নেন। এরপর নিজস্ব আঙ্গিকে নতুন পরিকল্পনা সাজিয়ে একে পদানত করার যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

তিনি নিজে ছিলেন একজন নামকরা সেনাপতি, গণিতজ্ঞ এবং দক্ষ প্রকৌশলী। তিনিই সর্বপ্রথম উসমানি খলিফাদের বৈঠকখানায় বিশ্বমানচিত্র সেঁটে নিয়েছিলেন। যা দেখে তাঁর উত্তরসূরিরা উদ্দীপ্ত হতেন। তিনি নিজ পর্যবেক্ষণে দেখতে পাচ্ছিলেন ইতঃপূর্বের অবরোধগুলোর ব্যর্থতার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল—যখনই কেউ কুসতুনতুনিয়া অবরোধে এগিয়ে এসেছেন, তখনই কায়সারদের প্ররোচনায় তাদের পেছনে বিদ্রোহ জেগে উঠেছে। অতএব, এ সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করার জন্য সুলতান বিদ্রোহগুলো দমনপূর্বক সারা দেশে ন্যায়বিচার ও সুশাসন ছড়িয়ে দেন। এতে রাষ্ট্রে পূর্ণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। এ ছাড়া তিনি তাঁর পুরানো শত্রু হাঙ্গেরির প্রখ্যাত যুদ্ধবাজ নেতা হুনইয়াডিরের সাথে সন্ধি করে নেন। এ ছাড়া কারমানিয়া[২২] অধিপতির সাথে সন্ধি করে তার কন্যাকে নিজ প্রাসাদে তুলে নেন। কায়সারের এক ভাই ছিল মুরিয়ার শাসনকর্তা। সুলতান আগেই সেখানে একটি বাহিনী পাঠিয়ে সেখান থেকে সাহায্য আসার পথ বন্ধ করে দেন।

বসফরাসের একপ্রান্তে ছিল এশিয়া, অপরপ্রান্তে ছিল ইউরোপ। তাঁর প্রপিতামহ সুলতান বায়েজিদ বসফরাসের এশীয় উপকূলে একটা দুর্গ তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ কুসতুনতুনিয়ার শহরপ্রাচীর থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে ইউরোপীয় উপকূলে রোমেলি হিসার নামে আরেকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে নেন। দুর্গটি ৮৫৬ হিজরির গ্রীষ্মের আগেই তৈরি হয়ে উঠেছিল। এভাবে বসফরাস প্রণালীর[২৩] উভয় তীর মুসলিম মুজাহিদদের আওতায় এসে যায়। বসফরাস হচ্ছে মার্মারা উপসাগর ও কৃষ্ণসাগরের সংযোগস্থল এবং দার্দানেলিস চ্যানেল হচ্ছে মার্মারা ও এজিয়ান সাগরের সংযোগস্থল। এরপর এজিয়ান সাগর সামনে গিয়ে ভূমধ্য সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

[২২] বর্তমান ইরানের একটি ঐতিহাসিক শহর। একে কিরমান, কিরমানিয়া কারমানিয়া প্রভৃতি নামে ডাকা হয়।

[২৩] যেখানে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের হতাশ বেকার যুবকরা কাজের খুঁজে বেরিয়ে সাগরে ডুবে মরছে অথবা স্থানীয় গার্ডদের হাতে বন্দি হয়ে লাঞ্ছনার জীবন যাপছে।

অবদানের অবদান

সৃষ্টিশীল চিন্তার উৎকর্ষ

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ কুসতুনতুনিয়ার পাশে পা রাখার এবং অবরোধ নিশ্চিদ্র করার সাথে সাথে পরীক্ষিত মুজাহিদ-বাহিনী গড়ে তুলেন। নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁদের প্রস্তুতির সামগ্রিক সরঞ্জাম তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কুসতুনতুনিয়া ছিল ইউরোপের এমন এক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র, যা বিজয়ের জন্য প্রথাগত যুদ্ধপ্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না। সুলতান বিষয়টি ভালো করেই জানতেন। তিনি ছিলেন একজন মিলিটারি জিনিয়াস। তাঁর সামরিক প্রজ্ঞা ছিল অতুলনীয়। তিনি এমন কিছু খুঁজছিলেন যা দেখে শত্রুদের হতাশায় বৃদ্ধাঙ্গুলি কামড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। তারা সামনে আসার আগেই পরাজয়ের উপকূলে আছড়ে পড়বে। যুদ্ধ জয়ের জন্য কেবল শক্তির প্রাচুর্য এবং কৌশলের দুর্বোধ্যতাই যথেষ্ট নয়; বরং ভাগ্যের সহায়তাও দরকার। আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা ছিল সুলতানের নিত্যদিনের অভ্যাস। যুদ্ধে রওয়ানা হবার আগে সুলতান তাঁর পুরো বাহিনীকে সাথে নিয়ে দু-রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নেন। অত্যন্ত কাতরস্বরে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। সুলতান যুদ্ধ বিষয়ে অব্যাহত ইস্তেখারা[২৪] জারি রেখেছিলেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাছে আল্লাহর দরবারে বিজয়ের দুআ করার বিনীত আবেদন করে যাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে আকা শামসুদ্দিন এবং আকা বাইন নামক দুই বুজুর্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

একজন সফল বিজেতার জন্য এমন সৃষ্টিশীল সামরিক কৌশল অবলম্বন জরুরি, যা হবে প্রথাগত কৌশল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নতুবা বড় কোনো জয় এনে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। আল্লাহ সুলতানকে এ যোগ্যতা উদার হাতেই দান করেছিলেন। তিনি তাঁকে অসম্ভবকে সম্ভব করে প্রদর্শন করার মতো অনমনীয় দৃঢ়তা দান করেছিলেন। তিনি পরপর এমন তিনটি কৌশল প্রদর্শন করেন, যা ইতঃপূর্বে কখনো কোথাও প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

[২৪] আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কাজের ভালোমন্দ জানার জন্য বিশেষ দুআসহকারে নফল নামাজ আদায়।

তোপ ও মিনার

কুসতুনতুনিয়ার মজবুত দুর্গ ভাঙার জন্য তিনি এমন কিছু তোপ তৈরি করান, তৎকালীন বিশ্বে যেগুলোর কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে একটা দুর্গপরিবেষ্টিত শহর ধ্বংসের জন্য তোপের ব্যবহার প্রথমে কুসতুনতুনিয়ায়ই প্রয়োগ হয়েছিল। সুলতান হাঙ্গেরির জনৈক অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর সহায়তা নিয়ে এমন একটি তোপ তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। যেটি প্রায় ৩০০ টন ওজনের পাথরগোলাকে এক মাইল দূরে ছুঁড়ে মারতে পারত।

এ ছাড়া তিনি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন শহরপ্রাচীরের উচ্চতা বরাবর কয়েকটি মিনার। মিনারগুলোর মাথায় ছিল গুম্বুজ। সেখানে মুজাহিদরা মোর্চা বেধে শত্রুর উপর তির ও গোলা নিক্ষেপ করতো। সেই মিনারগুলোতে থাকত লম্বা একটা সিঁড়ি। যা পরিখা পার হবার জন্য দেয়ালের সাথে সেঁটে দিয়ে দেয়ালশীর্ষে পৌঁছার জন্য ব্যবহার করা হতো। কুসতুনতুনিয়াবাসীও যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে বসা ছিল। তারা তোপের আঘাতে ভেঙে যাওয়া দেয়াল দ্রুত মেরামত করে নিত। মাটির পাতিলে আগুনে গোলা রেখে সেগুলো দ্বারা কাঠের তৈরি মিনারগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করতো। কিন্তু সুলতান ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অনমনীয়। অবরোধ চলাকালে তিনি তৃতীয় এমন একটা বিস্ময়কর প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এবং অচিন্তনীয়। যার কল্পনা আজও বিশ্ববাসীকে হতভম্ব করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অসম্ভব থেকে সম্ভব

কুসতুনতুনিয়া শহরটি ছিল অনেকটা ত্রিকোণাকার। দু-প্রান্তে ছিল জলভাগ। উত্তরপ্রান্তে ছিল গোল্ডেনহর্ন। গোল্ডেনহর্ন মানে হচ্ছে সোনালি শিং। যেহেতু চ্যানেলটি ছিল অনেকটা শিং আকৃতির এবং ভোরের আলো চ্যানেলটির স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হলে মনে হতো চ্যানেলটিতে যেন কোটি কোটি সোনার টুকরো নাচানাচি করছে; সেহেতু এর নাম পড়ে যায় গোল্ডেনহর্ন। হর্নের একপ্রান্তে ছিল গিলতা নামক শহর। অপর দিকে ছিল কুসতুনতুনিয়া তথা ইস্তাম্বুল। গিলতার বর্তমান নাম কাসিমপাশা। এর দক্ষিণে মার্মারা সাগর। স্থলবাহিনী কেবল শহরের পূর্বদিক থেকেই হামলা করতে পারত। কিন্তু ওইদিকে পরপর তিনটি সুদৃঢ় প্রাচীর শহরটিকে সুরক্ষা দিয়ে আসছিল। প্রাচীরগুলোর উপর ১৭০ ফুট দূরত্বে ছিল শক্তিশালী বুর্জ। প্রাচীরের পাশে ছিল ৬০ ফুট চওড়া ও ১০০ ফুট গভীর পরিখা। সাগরের দিকে গোল্ডেনহর্নের মুখে ছিল শক্ত লৌহশিকলের প্রতিবন্ধক। এ

লৌহশিকল এড়িয়ে কোনো যুদ্ধজাহাজের পক্ষেই হর্নে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য। লড়াইয়ের সময় ওই দিকটিকে ৮টি বড় জাহাজ এবং ২০টি ছোট নৌকার প্রহরায় আরও দুর্ভেদ্য করে তোলা হতো। সব বিবেচনায় শহরটিকে পৃথিবীর দুর্ভেদ্যতম দুর্গশহর হিসেবে গন্য করা হতো।

যুদ্ধ চলাকালে সুলতান অনুভব করেন গোল্ডেনহর্নের দিক থেকে যতক্ষণ শহরের উপর আক্রমণ শানানো যাচ্ছে না, ততক্ষণ শহরটি পদানত করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু হর্নের মুখে দুর্ভেদ্য বাধা থাকার দরুন হর্নে প্রবেশের কল্পনাও ছিল অবান্তর। সুলতান প্রতিনিয়ত আল্লাহর সাহায্য কামনা করে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে সহায়তা করেন। তিনি এমন এক দুঃসাহসী ও বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাতের ভেতরই তা কার্যকরী করেন, যা দেখে বিশ্ব ইতিহাস একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন—বসফরাস থেকে শুকনো বাইপাস দিয়ে বহরের ছোট্ট যুদ্ধজাহাজগুলো গোলাবারুদসহ হর্নে অবস্থিত শত্রুবাহিনীর পেছনে নামিয়ে নেবেন। বাইপাসের দৈর্ঘ ছিল সাত মাইল। চড়াই-উতরাই এবং ঘন গাছ-গাছালিসমৃদ্ধ সেই পাহাড়ি বাইপাস দিয়ে একটা যুদ্ধবহর টেনে নেওয়া ছিল অলৌকিক ব্যাপারের মতো। কিন্তু সুলতানের মনোভাব ছিল এতোটাই দৃঢ় যে, কোনো সেনাপতি সে সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ না করলেও সুলতান তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে যান। তাঁর প্রাণোৎর্গকারী সৈন্যরা এমনই অনুগত ছিল যে, তারা বাহ্যত এ অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়ে দেয়।

মুজিজা, কারামত ও ইস্তেদরাজ

সুলতানের নির্দেশে চড়াই-উতরাইসমৃদ্ধ সে পাহাড়ি বাইপাসে কাঠ বিছিয়ে তাতে চর্বি এবং পিচ্ছিল পদার্থ ঢেলে নেওয়া হয়। অতঃপর ১২ জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরি মোতাবেক ২২ এপ্রিল ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দের রাতে ছোট্ট আকারের ৭০টি ছোট্ট যুদ্ধজাহাজের বহর ওই বিছানো তক্তার উপর তুলে দিয়ে গোল্ডেনহর্নে শত্রুবাহিনীর পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় সম্ভাব্য বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শত্রুবাহিনীকে তাদের পরিকল্পনা সর্ম্পকে অন্ধকারে রাখার জন্য বসফরাসে অবস্থিত সুলতানের নৌবহরের সৈন্যরা গোলাবৃষ্টি চালিয়ে হর্নের মুখে থাকা শত্রুবাহিনীকে তাদের সাথে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

স্থলপথে নৌবহর চালিয়ে নেওয়ার কাজটা এত দ্রুততার সাথে কার্যকর করা হচ্ছিল যে, বাইজেন্টাইনরা প্রতিরোধ করবে দূরে থাক বিষয়টা তাদের চিন্তায়ও আসেনি। ভোর হলে কুসতুনতুনীয় বাহিনী প্রাচীরের নিচে সুলতানের নৌবহর দেখতে পেয়ে হতভম্ব হবার পাশাপাশি ভয় ও আতঙ্কে একেবারে চুপষে যায়। তারা দেখতে পায়,

তুলনামূলক ছোট উসমানীয় যুদ্ধজাহাজগুলো গোল্ডেনহর্নে রাজহাঁসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। সেখানে পানিস্বল্পতার দরুন তাদের বড় যুদ্ধজাহাজগুলো আসতে না পেরে দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে হতাশায় আঙুল কামড়াচ্ছিল।

ঐতিহাসিক ও পর্যবেক্ষক মহল সুলতানের এ দুঃসাহসিক পদক্ষেপকে এমন এক অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত আখ্যা দেন যে, এই পদক্ষেপের যতই প্রশংসা করা হোক না কেন, তা কমই থেকে যাবে।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক স্টিফেন জুগো মনুষ্য ইতিহাসের এ ক্যারিশমাটিক ঘটনাটিকে Almost without parallcl in history আখ্যা দেওয়ার পর মুজিজার মুজিজা The miracle of miracles বলেছেন। কিন্তু মি. স্টিফেনের এ পর্যবেক্ষণ সঠিক নয়। কেননা, মুজিজা তো সেই অলৌকিক ঘটনাকে বলে, যা আম্বিয়া আ. থেকে প্রকাশ পায়। আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত যদি অন্য কারও থেকে এমন অতিলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় আর লোকটি পূন্যাত্মা হয়, তাহলে তার মাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনাকে বলে কারামাত। আর পাপাত্মা হলে বলে ইস্তেদরাজ। তবে উক্ত তিন প্রকারের অলৌকিক ঘটনায় বস্তুর সহায়তা নেওয়া হয় না। অতএব, সুলতানের এ অতিলৌকিক কাজটা যে মুজিজা কিংবা ইস্তেদরাজ নয় এটা সুস্পষ্ট। তবে এটা কারামতও নয়; বরং এটা তাঁর উন্নত চিন্তাধারা, তাঁর প্রকৌশলীদের দক্ষতা এবং অনুগতদের অতুলনীয় ও বিরল আনুগত্যের ফলাফল।

যুদ্ধের রাতে

অবরোধের ৫১ দিন অতিবাহিত হয়ে চলছিল। সুলতান সব দিকে থেকে জাল সংকুচিত করে নিয়ে আসছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি চূড়ান্ত হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শহরবাসীকে অস্ত্র সমর্পণের শর্তে প্রাণের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা তাদের ধারণামতে শহর রক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তাদের নেতাও ছিল সত্যিকার অর্থের একজন বীরপুরুষ।[২৫] সে কর আদায়ের শর্তে রাজি হলেও শহরের কর্তৃত্ব হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। সুলতানও ছিলেন অনমনীয়। শেষ পর্যন্ত ১৮ জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরি মোতাবেক ২৭ মে ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ পরামর্শসভা আহ্বান করা হয় এবং পরবর্তী দিন ভোরে হামলার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই রাত সুলতানসহ মুজাহিদগণ স্থানে স্থানে জিকিরের আসর বসিয়ে ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এতে তাদের অন্তরে আবেগ-উদ্দীপনা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

[২৫] মুসলিম ঐতিহাসিকগণও প্রাণ খুলে তার (দ্বিতীয় কনস্টান্টিনের) বীরত্বের প্রশংসা করে থাকেন।

এক উৎসর্গপ্রাণ বাহাদুর

পরবর্তী দিন শুরু হয় চূড়ান্ত লড়াই। অবরুদ্ধ বাইজেন্টাইনরাও প্রদর্শন করে বীরত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। উভয় পক্ষ থেকে বর্ষিত হতে থাকে রক্ত ও আগুনের বৃষ্টি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে চলছিল সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার মোকাবিলা। হামলার ভয়াবহতা থেকে প্রতিরোধের মাত্রা কম ছিল না মোটেও। দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে চূড়ান্ত ঘাত-প্রতিঘাত। উভয় পক্ষের বীরগণ দেখিয়ে যাচ্ছিল তাদের বীরত্বের জৌলুশ। সুলতান ছিলেন ঘোড়ার উপর আরোহী। তিনি তাঁর প্রপিতামহ সুলতান বায়েজিদের মতো একটা ভারি মুগুর হাতে নিজ তত্ত্বাবধানে তৈরি ১২ হাজারের জেনেসারি কমান্ডো-বাহিনীর কমান্ড করে যাচ্ছিলেন। এ সংখ্যা দ্বারা সেই কল্যাণ কামনা উদ্দেশ্য ছিল যে, হাদিসে এসেছে—'১২ হাজার মানুষ তাদের সংখ্যাস্বল্পতার দরুন পরাজিত হবে না।'

অবশেষে দুপুরের দিকে ভূমি আগুনের সমুদ্রে পরিণত হয়ে ওঠে। আকাশ ধোঁয়ার বাদলে ছেয়ে যায়। উভয় বাহিনী ছিল পূর্ণ আবেগ ও উদ্দীপনার মধ্যে। কেউ সাহস হারাচ্ছিল না। সে সময় জেনেসারি বাহিনীর হাসান আগা নামক এক বিশালাকায় দুঃসাহসী মুজাহিদ দেয়ালে চড়ে সেখানে মুসলিম-বাহিনীর পতাকা ওড়াতে সমর্থ হয়ে ওঠেন। জাতি এই মহান মুজাহিদকে কখনো ভুলতে পারে না। কেননা, তিনিই জীবনের বিনিময়ে বিজয়ের প্রথম ইট নির্মাণ করেছিলেন।

আফসোস! আজ অনেক মুসলিম জানে না কুসতুনতুনিয়ার দেয়ালে প্রথম পতাকা উত্তোলনকারীর নাম কী ছিল? আগা হাসান ৩০ জন সাথিসহ দুর্লঙ্ঘ সে দেয়াল টপকাতে সমর্থ হয়ে যান। যদিও তিনিসহ তাঁর ১৮ জন সাথি দেয়ালের উপর লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। তথাপি তাঁরা অন্যান্য মুজাহিদদের জন্য দেয়ালে উঠার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। উসমানি বাহিনী তখন স্রোতের বেগে দেয়ালের উপর উঠে আসে। তাঁদের ঘুর্ণি আক্রমণে বাইজেন্টাইনদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সুলতানের ঘোষণা অনুযায়ী জুহরের পূর্বেই কুসতুনতুনিয়া বিজিত হয়।

আরেক ভবিষ্যদ্বাণী

জুহরের সময় কুসতুনতুনিয়া বিজয়ী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ তাঁর মন্ত্রীবর্গ, সেনাপতি এবং মুজাহিদিনসহ সেন্ট রোমানস দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। এই দরজায়ই মুসলিম-বাহিনীকে প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এখানেই কুসতুনতুনিয়া অধিপতি লড়াই করতে করতে মারা যায়। উল্লেখ্য যে, তার মৃত্যুর

মাধ্যমে প্রিয়নবি সা.-এর আরেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। নবিজি সা. বলেছিলেন—'যখন কায়সার সাধারণ মৃত্যু ব্যতিরেকে নিহত হবে, তারপর আর কোনো কায়সার জন্ম নেবে না।'[২৬]

সুলতান শহরে প্রবেশ করে এ-গলি ও-গলি হয়ে একসময় আয়া সুফিয়া গির্জায় এসে উপনীত হন। এ সময় তিনি বিনয় প্রদর্শনের জন্য মাথায় মাটি ঢেলে দেন। সুলতান তখন মাত্রাতিরিক্ত আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর অন্তর মোমের ন্যায় কোমল হয়ে ওঠে। বিজিত কুসতুনতুনিয়া এবং এর ধ্বংসাবশেষ দেখে তাঁর মুখ থেকে এমনিতেই কবি ফিরদাউসির একটি পঙক্তি উচ্চারিত হয়, যার অর্থ—

'কিসরার রাজপ্রাসাদে মাকড়সা জাল টানিয়ে নিয়েছে।
আর আফরাসিয়াবের গুম্বুদে পেঁচারা বুম বুম ডাকছে।'

সুলতান গির্জায় প্রবেশ করে প্রথমেই ছবিগুলো মিটিয়ে ফেলেন। এরপর আজান দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে জুহরের নামাজ আদায় করেন। ৮৫০ বছরের প্রচেষ্টার পর যখন আজান ধ্বনিত হচ্ছিল, তখন প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে যে আবেগের ঢেউ খেলছিল তা কেবল অনুভব করা যায়; ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

খ্রিষ্টানদের একটা ধারণা ছিল কেউ দুর্গ জয় করে নিলেও গির্জার কাছে পৌঁছতেই আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে তাদের হত্যা করে ফেলবেন। সুলতান অত্যন্ত বিনয়ীর বেশে গির্জায় প্রবেশ করেন। কিন্তু আসমান থেকে কোনো কিছু অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে মেরে ফেলেনি। উপস্থিত পাদরিরা তাদের মনগড়া মিথ্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল।

বিজয়ের পর সুলতান পুরো মুসলিম বিশ্বে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিলে মুসলিমবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। সেদিন থেকে তাঁর নামের সাথে 'ফাতিহ' (বিজয়ী)-নামক আলাদা শব্দটি জুড়ে যায়। আজ পর্যন্ত মুসলিম এবং অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ওই নামেই স্মরণ করে থাকেন। কেয়ামত পর্যন্তও তিনি ওই নামেই স্মরিত হতে থাকবেন।

চলুন! এবার আমরা মূল আলোচ্যবিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

[২৬] তিরমিজি: ২২১৮।

আটলান্টিকের ওপারে

সাগরযুদ্ধের শুরু

আমরা আলোচনাটা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই পুনরায় শুরু করছি। মধ্যযুগের মুসলিম বিজেতাগণ হজরত খালিদ বিন ওলিদ রা.-এর সেনাপতিত্বে শামকে[২৭] ইউরোপের বাইজেন্টানীয় খ্রিষ্টানদের কবলমুক্ত করে নিলে ইউরোপ জয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। তবে তখন ইউরোপ অভিমুখে এগিয়ে যাবার রুট ছিল মাত্র দুটি। এক. কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে ইউরোপ-প্রবেশের চাবিগ্রহণ। দুই. সিনাই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশ অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেখানে মূর্খতার যে অন্ধকার বিরাজ করছিল, তা দূর করে জাবালুত তারিক[২৮] প্রণালী পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করা।

ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যখানে রয়েছে বিশাল মার্মারা সাগর। এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রবেশের রুট দুটো। বসফরাস কিংবা দার্দানেলিস। যে প্রণালী দিয়েই ইউরোপে প্রবেশ করার ইচ্ছা থাক না কেন উভয় দিকেই নৌবহরের ব্যবহার ছিল অনস্বীকার্য। প্রথম যুগে তাই ওই পথে ইউরোপে প্রবেশের প্রয়াস স্থগিত রেখে মুসলিম-বাহিনী আফ্রিকা বিজয়ের দিকে মনোযোগ দেন।

হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো!

মুসলিম শাসকদের মধ্যে হজরত আমিরে মুয়াবিআ রা. সর্বপ্রথম নৌবহর ব্যবহারের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনিই ইসলামে সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধের সূচনা ঘটান। এদিকে আফ্রিকা পৌঁছতে যেহেতু মাত্র ১০০ মাইল চওড়া সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করা

.....

[২৭] তখনকার যুগে শাম বলতে বর্তমানের সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান এবং লেবাননসহ বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বোঝাত।

[২৮] ভূমধ্য-সাগরকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযোগকারী সমুদ্রপণালী। স্পেনবিজয়ী তারিক বিন জিয়াদের নামে মুসলমানরা যে প্রণালীর নাম দিয়েছিল জাবালুত তারিক। পশ্চিমা কর্তৃক বিকৃত উচ্চারণ জিব্রালটা।

ছিল যথেষ্ট, তাই শাম বিজয়ের পরপরই আমর ইবনুল আস রা.-এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ আফ্রিকায় পৌঁছে যান। মিসর জয়ের মাধ্যমেই এ মহাদেশ জয়ের সূচনা ঘটে। এরপর মুসলিম-বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের আলো জ্বেলে বর্তমান লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিশ এবং মরক্কো হয়ে একেবারে আটলান্টিকের তীরে এসে পৌঁছান। মরক্কোর পরেই ছিল সুবিশাল আটলান্টিক মহাসাগর। যা পাড়ি দেওয়ার প্রযুক্তি তৎকালীন বিশ্বে আবিষ্কৃত হয়নি। মুসলিম-বাহিনীর আমির উকবা বিন নাফে রা. তাঁর ঘোড়াকে সমুদ্রের পানিতে নামিয়ে দিয়ে যে ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন তা হচ্ছে—

> 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছি। মধ্যখানে যদি এ সমুদ্র অন্তরায় হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে অবশ্যই আমি ওপারের দেশগুলোতে পৌঁছে যেতাম। যারা আপনাকে অস্বীকার করে, তাদের সাথে যুদ্ধ করতাম; যতক্ষণ না আপনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত বন্ধ করা হতো।'[২৯]

ইউরোপের দরজায়

উকবা বিন নাফে রা.-এর অশ্ব যে বালুকাময় উপকূলে পায়ের খুর মারছিল, সেখানকার সামনের দিকে সমুদ্রের বুকে ছিল অনাবাদ কয়েকটি দ্বীপ; ওইগুলোকে খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ বলা হতো। বর্তমানে ওইগুলো ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ নামে খ্যাত। ওই দ্বীপগুলোকেই তখনকার যুগে পৃথিবীর সীমান্ত মনে করা হতো। তখন ওইগুলোর ওপারে কী আছে মানুষের জানা ছিল না। এ জন্যেই মরক্কোকে 'আল মাগরিব' এবং 'আল মাগরিবুল আকসা' অর্থাৎ, পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত বলা হতো। আজ-অবধি মরক্কো আরববিশ্বে ওই নামেই প্রসিদ্ধ। এটা হচ্ছে হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দশকের কথা। এর প্রায় ৮০০ বছর পর যখন দূরপাল্লার জাহাজ নির্মিত হয় এবং ভূগোলে নতুন নতুন আবিষ্কৃত রাষ্ট্র সংযোগ হতে থাকে, তখন এমনও সময় আসে যখন মুসলমানরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে 'নয়া দুনিয়া'[৩০] আবাদ করার সামর্থ্য রাখত। কিন্তু তখন তাদের পাপের বোঝা এতটাই ভারি হয়ে উঠে, যদ্দরুন তারা এ সৌভাগ্য অর্জনের অংশীদার হয়ে উঠতে পারেনি।

আমাদের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ক্ষণ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর এ ক্ষণটির শুরু ছিল যেদিন মুসলমানরা মরক্কোর সাগর উপকূলে দাঁড়িয়ে ভূমধ্য ও আটলান্টিককে

---

[২৯] *রিয়াজুন নুফুস*: ২৫ ব-হাওয়ালা *মওসুআতুল ফিদা ফিল ইসলাম*: ২/৩৭১।

[৩০] তখনকার সময়ে আমেরিকাকে 'নিউ ওয়ার্ল্ড' বা 'নয়া দুনিয়া' নামে অভিহিত করা হতো।

সংযোগকারী প্রণালীর ওপারে একটি নয়নাভিরাম সবুজ-শ্যামল রাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছিল। ওটাই ছিল হিস্পানিয়া। ওটাই ছিল পৃথিবীর ভূস্বর্গখ্যাত মুসলিম আন্দালুসিয়া তথা স্পেন। এই প্রণালীই পরবর্তীতে 'জাবালুত তারিক' নামে স্মরিত হয়ে আসছে।

'বসফরাস' আর 'জাবালুত তারিক' হচ্ছে পূর্ব ও দক্ষিণে ইউরোপ প্রবেশের দুটি দরজাতুল্য। মুসলিম-বাহিনী এ উভয় দরজা দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে অনেক গভীরে ঢুকে গিয়েছিল। তাঁদের জন্য মহাদেশটির অপর প্রান্তে পৌঁছা হতো বিশ্বের জন্য এক মহা সৌভাগ্য। কিন্তু যে দুবার তারা এগিয়ে গিয়েছিল প্রতিবারই তাদেরকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু ইউরোপ তাঁদের থেকে শিখে রাখা বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যায়। তারা সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাসহ অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক নাম না-জানা দ্বীপসমৃদ্ধ এলাকা তথা ওশেনিয়া। তাই আজ উক্ত মহাদেশগুলোতে উড়ছে তৃত্ববাদের পতাকা। আর ওরা সবাই মিলে মুসলমানদের জন্য পৃথিবীটাকে করে তুলছে সংকীর্ণ।

প্রকৃত হকদার কে?

আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া ছিলেন দশম উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের দৌহিত্র এবং মুআবিয়া বিন হিশামের পুত্র। তিনি ইসলামের ইতিহাসে বেশ ক'টি নামে পরিচিত। যথাক্রমে আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া, আবদুর রহমান আন নাসির, আবদুর রহমান প্রথম এবং আবদুর রহমান আদ দাখিল। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে যখন আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়া খেলাফতের পতন হয় তখন উমাইয়া বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, হাকিম এবং তাদের সহযোগীরা আব্বাসি খলিফা আবদুল্লাহ বিন সাফ্ফাহর জিঘাংসার শিকার হন। সে সময় পরীক্ষার রঙমঞ্চে ২০ বছর বয়সী পরাজিত উমাইয়া শাহজাদা আবদুর রহমান কোনোভাবে মরু ও গিরি নদী পাড়ি দিয়ে ফিলিস্তিন গিয়ে পৌঁছান। ফিলিস্তিন থেকে রোম সাগরের তীর ধরে চলতে চলতে লিবিয়ার মরু অঞ্চলে এসে পৌঁছতে মরুভূমির প্রায় ২ হাজার মাইল পাড়ি দেন। এভাবে কঠিন সফর শেষে আবদুর রহমান একসময় আলজেরিয়া উপকূলীয় এলাকায় তাঁর মাতুলালয় বারবার গোত্র নাফরায় এসে আশ্রয় নেন।

এদিকে আব্বাসি গোয়েন্দারা তাঁকে সর্বত্র খুঁজে ফিরছিল। অব্যাহত ধাওয়ায় থাকায় কোথাও তিনি শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সমুদ্র উপকূল, এটলাস পর্বতমালার উপত্যকা এবং ধুধু মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছিলেন। এতকিছুর পরও তাঁর সংকল্পে কোনো প্রকার দুর্বলতা আসেনি। না-ই-বা নড়বড়ে হয় তাঁর লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞা। বিপদ যখন আফ্রিকার ভূখণ্ডেও তাঁকে তাড়া করে ফিরছিল তখন তিনি সেখান থেকে পথ ধরেন আন্দালুসিয়ার দিকে। আন্দালুসিয়ায় তাঁর প্রচুর আত্মীয়স্বজন বসবাস করতেন এবং সেখানে মুসলিম শাসনের প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু তখন আন্দালুসিয়াও শান্ত ছিল না। মুসলমানরা ছিল ভ্রতৃঘাতি যুদ্ধে লিপ্ত। তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্বল। শাসকশ্রেণি ছিল খ্যাতির কাঙাল এবং বিলাসপ্রিয়। অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের চক্রান্ত ছিল অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। শাসকরা ছিল অর্ধ-ঘুমে। আমলারা ছিল নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

আবদুর রহমান ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আন্দালুসিয়ায় এসে প্রবেশ করেন। আন্দালুসিয়ায় আসার পর সেখানকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হন। তখন থেকেই তাঁর নাম হয় আবদুর রহমান আদ দাখিল।

আবদুর রহমানের ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় নেতৃত্বগুণের কারণে গোত্র ও বর্ণের পরিচয় এড়িয়ে অসংখ্য আন্দালুসীয় মুসলিম তাঁর পতাকাতলে জমায়েত হতে থাকে। এদের মধ্যে ইয়ামেনিদের সংখ্যা ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবদুর রহমান কিছুটা সাফল্য অর্জনের পর কর্ডোভার দিকে এগিয়ে যান এবং আব্বাসীয়দের খ্যাতনামা শাসক ইউসুফ ফিহরিকে হত্যা করে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন।

কর্ডোভা বিজয়ের পর অসহায় উমাইয়ারা একটা রাষ্ট্রীয় ভিত্তি পেয়ে যায়। কিন্তু তাঁর সরকার শক্তিশালী হবার পূর্বেই খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের নির্দেশে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর ইবনে মুগিস বড় একটি বাহিনী নিয়ে কর্ডোভার উপর চড়াও হলে বাধ্য হয়ে আবদুর রহমানকেও ময়দানে নেমে আসতে হয়। এ যুদ্ধে তাঁর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনি যে দিকেই এগিয়ে যেতেন সেদিকেই প্রতিপক্ষের বুহ্য তছনছ হয়ে যেত। উত্তর আফ্রিকার বারবার[৩১] যুদ্ধবাজরা এমন দক্ষতা, চাতুর্য এবং অসম সাহস ও বীরত্ব দেখে হতবাক হয়ে যায়। আরবদের এমন বীরত্ব আর বাহাদুরি তারা ইতঃপূর্বে কখনো দেখেনি। যুদ্ধে আবদুর রহমান বিজয়ী হয়ে ইবনে মুগিসের কর্তিত মাথা বাগদাদে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন। খলিফা মনসুর প্রাণের শত্রু এবং প্রবল বিরোধী হবার পরও তাঁকে 'কুরাইশের বাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিজয়ের পর তাঁর সামনে আসে রাষ্ট্র পরিচালনার কঠিন পরিস্থিতি। তখন তাঁর সামনে কঠিনতর বিষয়টি ছিল মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দূর করে জাতি হিসেবে সবাইকে এককাতারে নিয়ে আসা। তাঁর বৈপ্লবিক পলিসি এবং উন্নত চিন্তাধারা মুসলিম আন্দালুসীয়দের পরিবেশ পালটে দেয়। তারা ক্রমশ খ্রিষ্টান নেতৃত্বের কবল থেকে মুক্তি লাভ করতে থাকে। দাসত্ব থেকেও নিকৃষ্টতর জীবন কাটানো কৃষকগণ ভূ-স্বামীদের অনাচার থেকে রেহাই পেতে থাকে। কৃষিতে আসে নতুন বিপ্লব। উৎপাদন বেড়ে যায় অনেকগুণ।

আবদুর রহমানই সর্বপ্রথম বেতনভাতার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করেন। তিনি সেঁচ ব্যবস্থায়ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাঁর সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন দুর্বলশ্রেণির জীবনে নবপ্রাণের সঞ্চার ঘটায়। দেশজুড়ে

[৩১] উত্তর আফ্রিকার একটি যুদ্ধবাজ জাতি। এরা নিজেদেরকে 'আমাগিজ' বলত। আমাগিজ মানে 'মুক্ত এবং অভিজাত মানুষ'। -*অনুবাদক*

প্রতিষ্ঠা পায় অসংখ্য বিদ্যাপীঠ, লাইব্রেরি এবং আদালত। বিভিন্ন শাস্ত্রে মুসলমানরা উন্নতি লাভ করে বিস্ময়কর পর্যায়ের। দেখতে দেখতে আন্দালুসিয়া হয়ে ওঠে পৃথিবীর বুকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজধানী। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানের অন্বেষণে চলে আসতে থাকে দলে দলে। আন্দালুসিয়ার বাজারগুলোতে শাল, সিল্ক, অস্ত্র, সুতা, জুতো, চাটাই, জাফরান, ভিনেগার, গরম মসল্লা, রঙ, ফল, ফুল, মিষ্টি, ওষুধ, শুকনো ফল এবং সাবানসহ খাদ্যজাত পণ্য পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে।

আবদুর রহমান তাঁর ৩২ বছরের শাসনকালে তুলনাহীন বীরত্ব, অতুল ধৈর্য এবং কর্মপরাকাষ্ঠার জৌলুশ দেখিয়ে স্পেনের বিশাল অঞ্চল নিজ অধীনে নিয়ে আসেন। স্পেনের বুকে তিনি মুসলিম শাসনের যে চারা লাগিয়েছিলেন তা ক্রমান্বয়ে বটবৃক্ষ হয়ে ৮০০ বছর মুসলিম উম্মাহকে ছায়া প্রদান করে গেছে। আবদুর রহমানকে তাঁর যে গুণটি ইউরোপীয় শাসকশ্রেণি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছিল তা হচ্ছে, ইলমের প্রচার প্রসারে অবদান রাখা এবং জ্ঞানী-গুণীদের সম্মান প্রদান। তিনি নিজে ছিলেন একজন সমরকবি। যুদ্ধমাঠে তাঁর উত্তেজক রণসংগীত সৈনিকদের অন্তরে আবেগ-উত্তেজনার আগুন ধরিয়ে দিত। এ ছাড়া নিজেও ছিলেন একজন উঁচুমাপের বিদ্বান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবান্ধব ব্যক্তিত্ব। উলামায়ে কেরামের মজলিসে রাত কাটানো ইবাদতকারী। তাঁর অনুপম এ গুণাবলি অনাগত শতাব্দীতে আন্দালুসিয়ার জমিনে এমন রঙ নিয়ে এসেছিল, যার আলোকে পুরো ইউরোপ আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

আন্দালুসিয়ার উর্বর জমিনে উলামা, ফুজালা, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, গণিতজ্ঞ, রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিকসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমন জগদ্‌খ্যাত দক্ষ মানুষ জন্ম নেন, যাদের গবেষণাকর্ম বর্তমান ইউরোপের উন্নতির ভিত্তি রচনা করেছে। এটা স্বীকার্য সত্য যে, ইউরোপের বর্তমান উন্নতি মুসলিম আন্দালুসীয়দের অবদান। আবদুর রহমান আদ দাখিল ইলম ও প্রজ্ঞার যে চারা লাগিয়েছিলেন, তা ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন সে বৃক্ষে ইবনে জায়দুন, ইবনে আম্মার, ইবনে রুশদ, ইবনুল খতিব, ইবনে বাজাহ, ইবনে তুফাইল, আবু মহাম্মাদ আল আসালি, আল ইদরিসি, ইবনে জুহর, ইবনে বাইতার, আকবর মুহিউদ্দিন আল আরাবি, ইবনে হাজম, ইসহাক মুসিলি, লিসানুদ্দিন আল খতিব, ইবনে হানি, আহমদ আল কুসায়লি, সাবিত বিন কুরাহ, হানাইয়ান ইবনে ইসহাক, ইউহান্না বিন মুআবিয়া এবং আল ফারাবির ন্যায় বিশাল বিশাল কাণ্ড গজিয়ে পুরো বিশ্বে ছেয়ে ফেলেছিল।

আবদুর রহমানের জীবন ছিল বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং পেশিবহুল শরীরের অধিকারী। দৃষ্টিতে ছিল ঈগলের ক্ষিপ্রতা। ময়দানে ছিলেন সিংহের মতো নির্ভিক। মেধা ছিল অস্বাভাবিক সতেজ। ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দুঃসাহসী, দূরদর্শী, প্রত্যুৎপন্নমতি, ভদ্র ও নম্রভাষী। তিনি ছিলেন ইসলামজগতের ক্ষণজন্মা বীর খালিদ বিন ওলিদ রা., আবু উবাদা ইবনুল জাররাহ রা., কাকা বিন আমর রা., মহাবীর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহ.দের কাতারে গণ্য হবার মতো ব্যক্তিত্ব। ময়দানে নিজেই অগ্রসর হয়ে হামলা করতেন এবং বিজয় না আসা পর্যন্ত পাথরের মতো অটল থাকতেন। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য কবি। ছিলেন আরবের রণসংগীত-বিশারদ। সৌন্দর্য পরিচয়ে ছিলেন অসম্ভব রকমের দক্ষ। তাঁর যুদ্ধ প্রথম যুগের সাহাবায়ে কেরামের ইখলাস, লিল্লাহিয়াত এবং বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। আবদুর রহমানের কতিপয় রণসংগীতের উর্দু অনুবাদ শায়খ মনজুর এলাহি তার গ্রন্থ *নিরাঙ্গে উন্দুলুসে* উল্লেখ করেছেন, যেগুলো নিজেই নিজের উদাহরণ :

বিদগ্ধদের ঘায় আগুন ধরানো ব্যক্তি
সে তো আমিই ছিলাম, সম্পূর্ণ একা।
যে দু-ধারি তরবারি করেছিল উলঙ্গ,
যে পেরিয়েছে বালি ও পানির দিগন্তহীন পাথার।
মরীচিকা আর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ হাতের মুঠোয় পুরে
শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠা করেছে সাম্রাজ্য।
নামাজের জন্য নির্মাণ করেছি মসজিদ।
লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া বাহিনীকে
মুতির মালার ন্যায় গেঁথে নিয়েছি এক সুঁতোয়।
বিরান উজাড় বস্তিকে পুনঃ করেছি আবাদ

প্রবল প্রতিপক্ষ হবার পরও খলিফা মনসুর তাঁকে 'কুরাইশের বাজ' এবং আরবের নেতারা তাঁকে 'আরবের সম্মান' উপাধি দিয়েছিলেন। প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল যখন কর্ডোভা পৌঁছে তাঁর বিখ্যাত কবিতা *মসজিদে কর্ডোভা* রচনা করেন, তখন তাঁর সম্বোদিত ব্যক্তি ছিলেন এই আবদুর রহমান আদ দাখিল।

এখানে আমরা পাঠকদের দৃষ্টি ভিন্ন একটি দিকে নিয়ে যেতে চাই। পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা কখনো গবেষণা ও ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনায় সাম্প্রদায়িকতা এড়িয়ে নিরপেক্ষতা ও বিশ্বস্ততার আশ্রয় নিতে পারে না। আমেরিকার বিখ্যাত সাইন্টিস্ট ও ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট ১৯৭৮ সালে লিখিত তার বিখ্যাত *দ্য হান্ড্রেড* গ্রন্থে আমির আবদুর রহমান আদ দাখিলকে তাদের রোমান সম্রাট

শার্লেমাইনের সাথে তুলনা করে শার্লেমাইনকে অগ্রাধিকার দান করে তাকে ১০০ জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ শার্লেমাইনের মতো এক মূর্খ কোনোভাবেই আমির আবদুর রহমান আদ দাখিলের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা রাখে না। আমরা এখানে শার্লেমাইনের কিছু কর্মতৎপরতা, তার বিজয়াভিযান এবং বিজয়োত্তর কাজকর্মের আলোচনা শেষে ফলাফল নির্ধারণের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

শার্লেমাইনের রাজত্ব ছিল ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং হল্যান্ডকে নিয়ে। এ ছাড়া ইতালি, জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার অংশবিশেষও ছিল তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শার্লেমাইন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আবরা নদীর তীরবর্তী স্পেনের উর্বরা একটা এলাকা দখল করে নেয়। তার এ বিজয় ছিল অনেক চক্রান্তের ফসল। শার্লেমাইন পুরো স্পেন কব্জা করার স্বপ্ন দেখে আসছিল। সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে খলিফা আবু মানসুরের সাহায্য পাচ্ছিল। শার্লেমাইন তার যুগের বাদশাহদের মধ্যে বড় এক বিজেতা হিসেবে গণ্য ছিল। তাকে বর্তমান খ্রিষ্টানরা কিংবদন্তির মর্যাদা দিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যখন সে তার রাজ্য সম্প্রসারণের লক্ষে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে আক্রমণ চালায় তখন নির্যাতন-নিপীড়ন আর বর্বরতার অমোচনীয় স্বাক্ষর রেখে যায়। তখন ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, ক্ষমা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তার থেকে উধাও হয়ে যায়। আসলে ওইগুলো আদতে তার মধ্যে কখনো ছিলই না।

শার্লেমাইনের মস্তিষ্কে খ্রিষ্টবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ভূত এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্সালোনার মুসলিম গভর্নর ইবনুল আরাবির সাথে চক্রান্ত করে স্পেনের আমির আবদুর রহমান আদ দাখিলের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করে। সে বার্সালোনা ও বেবারিয়াকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে সারাগোসার দিকে অগ্রসর হয়। এখানে সে আরবদের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হলে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে একদিনের ভেতরেই সাড়ে চার হাজার মানুষকে হত্যা করে ফেলে। এই বর্বরতার পরও সেখানে আরবদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন সে সারাগোসা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে পিরেনিজ পর্বতমালার গিরিপথ অতিক্রম করছিল তখন আমির আবদুর রহমান আদ দাখিল তার জেনারেল হুসাইন বিন ইয়াহইয়া আনসারিকে শার্লেমাইনের মোকাবিলায় প্রেরণ করেন। হুসাইন দ্রুত সেখানে পৌঁছে শার্লেমাইনের বাহিনীকে গাজর আর মুলোর মতো কাটা শুরু করেন। শার্লেমাইন বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয় এবং তাকে কোনো মতে প্রাণ হাতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়।

শার্লেমাইন বাহিনীর যে বড় অংশটা হুসাইন বাহিনীর হাতে কাটা পড়ে, সেখানে আরবদের তরবারিগুলো বজ্র হয়ে তাদের মাথায় পতিত হয়। সেখানে তখন

আরবদের ঘোড়ার পদাঘাতে আগুনের ফুলকি ওড়ছিল। শার্লেমাইন সেখান থেকে পালিয়ে ৩০ ক্রোশ[৩২] দূরে এসে স্বস্থির নিঃশ্বাস নেয়। সে এত দূরে সরে এসেছিল, যেখান থেকে তার মরণযাত্রী বাহিনীর আর্তনাদ ও গোঙানির পাশাপাশি আরবদের হৃদয়-কাঁপানো রণসংগীত শোনা যাচ্ছিল না। আবদুর রহমানের হাতে শার্লেমাইনের এ চরম পরাজয় তার মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত স্মরণ ছিল। সে যতদিন জীবিত ছিল ভুলেও কখনো আর স্পেনের দিকে ফিরে তাকানোর সাহস পায়নি।

এ বিজয়ের পর যখন আবরা নদীর তীরবর্তী স্পেনীয় এলাকা তার হস্তচ্যুৎ হয়ে যাচ্ছিল, তখন বাধ্য হয়ে আমির আবদুর রহমানের দরবারে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। অতঃপর সন্ধির প্রস্তাবকে বিশ্বস্ততার পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সে তার কন্যা জুলিয়ানাকে আমির আবদুর রহমানের কাছে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করে। আমির আবদুর রহমান জুলিয়ানাকে বিয়ে করলেও তার সাথে একাত্ম হননি। তিনি কেবল তার সাথে সন্ধি করে নেন।

আমির আবদুর রহমানের কাছে এ পরাজয় ছাড়াও সম্রাট শার্লেমাইনের জীবনেতিহাসে রয়েছে অসংখ্য জুলুম ও বর্বরতার কালো কালো দাগ। বিরুদ্ধবাদীদের চোখ উপড়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ছিল তার একটা হিংস্র হবি। এ ছাড়া ব্যাপ্টিস্টকরণ[৩৩], মৃত্যুদণ্ড প্রদান, খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করাও ছিল তার কুৎসিত চরিত্রের অঙ্গ। শার্লেমাইনের ব্যক্তিত্বে যেমন ছিল না ধর্মীয় সহনশীলতা, তেমনি ছিল না মানবিক উদারতা। সে ইউরোপে গির্জাবাদের সংকীর্ণতা এবং ইজারাদারির যে ভীত রচনা করেছিল তা উন্নতি পেয়ে ১৬৩২ সালে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে ইনকুইজিশন আদালতের যাবজ্জীবন বন্দিত্বের রায় প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। গ্যালিলিওর অপরাধ ছিল—তিনি গির্জার মতবাদের বিপরীতে সূর্য নয়; বরং পৃথিবী পরিভ্রমণশীল বলে মত ব্যক্ত করেছিলেন। সংকীর্ণমনা গির্জাধিপতিরা এ অপরাধে গ্যালিলিওকে কাফের আখ্যা দেয়। একইভাবে বিখ্যাত দার্শনিক জিওনার্দো ব্রুনোকে ১৬০৩ সালে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। অনেককে ফাঁসির কাঠে ঝুলানো হয়।

---

[৩২] দূরত্ব পরিমাপের প্রাচীন একক। ব্রিটিশ কর্তৃক মাইল-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগে উপমহাদেশে এই এককটি ব্যবহৃত হতো। বাংলা অঞ্চলে ৮ হাজার হাত দূরত্বকে ১ ক্রোশ ধরা হতো।

[৩৩] ব্যাপ্টিজম হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে বিশ্বাসী খ্রিষ্টানদের পাপমোচন এবং পুনর্জাগরণের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের প্রক্রিয়া। ব্যাপ্টিজম প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক প্রবাহমান পানির উৎস, যেমন : নদী, সমুদ্র ও ঝরনায় সম্পাদিত হয়। যিনি আগেই পানির ব্যাপ্টিজমে দীক্ষিত হয়েছেন এবং পবিত্র উদ্দীপনাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি যীশুখ্রিষ্টের নামে ব্যাপ্টিজম সম্পন্ন করেন। -*উইকিপিডিয়া*

শার্লেমাইন তার যুগসহ পরবর্তী প্রজন্মে যে ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া রেখে গিয়েছিল, তা ইউরোপের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। বিজ্ঞানচর্চা ও মুক্তচিন্তার উপর শার্লেমান চার্চের যে খবরদারি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল, তা পুরো ইউরোপকে অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত করে ফেলেছিল।

শার্লেমাইন শাসনের ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া নির্ধারণে ইউরোপের হাজার বছরের অন্ধত্বের গূঢ়তম কারণটির প্রতি উহ্য দৃষ্টি থাকলে চলবে না। এই সুদীর্ঘ অন্ধত্বের শুরু হয়েছিল কিন্তু তাদের জাতীয় বীর, ইউরোপ বিজেতা, খ্রিষ্টবাদের মুক্তিদাতা শার্লেমাইনের হাত ধরে।

এই হচ্ছে আবদুর রহমান আদ দাখিল আর শার্লেমাইনের কাহিনি। এবার আমরা পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই—১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে এতদুভয় থেকে কে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য? আবদুর রহমান আদ দাখিল নাকি সম্রাট শার্লেমাইন?

ইতিহাসের বড় ট্রাজেডি হচ্ছে, ইতিহাস কিন্তু ঐতিহাসিকদের হাতেই রচিত হয় এবং প্রসিদ্ধ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভুল সিদ্ধান্তের হাতে লঘিষ্ঠ সত্য মার খেয়ে থাকে। ভবিষ্যতেও মার খেয়ে চলবে। ঠিক সেভাবে, যেভাবে দুর্বল ব্যক্তি সবলের হাত থেকে তার উত্তরাধিকারদের নিরাপত্তাবিধানে থাকে অক্ষম। জাতিসমূহের দুর্ভাগ্যজনক ট্রাজেডির মধ্যে এটিও একটি যে, তাদের সত্য এবং প্রকৃত স্বর্ণও সন্দেহযুক্ত ও মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। মাইকেল এইচ হার্টের মতো লেখকদের অপরাধ অল্প হলেও জাতির স্বপ্নহীনতা ও চেতনাহীনতার দায় অনেক বড়। স্বপ্নহীনতা ও চেতনাহীনতার কারণে আমরা অপরাধী সত্য; কিন্তু প্রজ্ঞার চাহিদা আর ইনসাফের ব্যাপারটি মাথায় থাকলে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তিদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা, আবদুর রহমান আদ দাখিল, ইবনে তাইমিয়া, ইমাম গাজালি, ইমাম রাজি, ইবনে সিনা, আল বেরুনি, আল খাওয়ারিজমি এবং সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহিমাহুমুল্লাহদের এই তালিকায় গন্য করা ছিল অবশ্য কর্তব্য।

আল্পস পর্বতমালা থেকে প্রত্যাবর্তন

আন্দালুসিয়ায় মুসলমানদের বিজয়ীর বেশে প্রবেশের মৌলিক কারণ গোপনের জন্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা অনেক চেষ্টা করেছে। আর মুসলিম পড়ুয়া-সমাজে যারা ওই মিথ্যে ও বানোয়াট ইতিহাস পাঠ করেছে, তাদেরকে এই মিথ্যের পাঁকে পড়ে হাবুডুবু খেতে দেখা যাচ্ছে। যে সত্যকে কোনো অসাম্প্রদায়িক চেতনার ঐতিহাসিক অস্বীকার করার জো রাখে না তা হচ্ছে—স্পেনের শাসক গথদের শাসনব্যবস্থা স্পেনবাসীর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল। তারা হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণরূপে অতিষ্ঠ। শাসকশ্রেণির ভোগ-বিলাস, পাদরিদের উন্মাদনা এবং আমলা কর্তৃক জনগণের সাথে দাসসুলভ আচরণসহ নানাবিধ ট্যাক্সের যাঁতাকলে পিষ্ট জনতাকে রাজচক্রের উপর ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছিল। বিপরীতে বিজয়ী মুসলিম শাসকদের ন্যায়বিচার ও সুশাসন, মুসলিম শাসনাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নতি ও সমৃদ্ধি, মুসলিম সামাজিকতায় অমুসলিমদের মানবিকতা ও ন্যায্য দাবির পক্ষপাতিত্ব ইত্যাকার গুণাবলি দ্বারা তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। মুসলিম বাদশাহদের উদার মানবিক আচরণের ফলে তারা তাদের প্রতি এতটাই ঝুঁকে পড়েছিল, অন্তর থেকে তাদেরকে এতটাই ভালোবাসতো যেমনটি বর্তমানকালে আমাদের একশ্রেণির মুসলিম আমেরিকার নামে পাগলপারা। এরা যেন রাষ্ট্রকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে পারার মধ্যে নিজেদের সৌভাগ্য দেখে থাকে।

অতএব, যখন স্পেন অধিপতি বুড়ো রডারিক কর্তৃক তার জনৈক অধীনস্থের কুমারি কন্যা লাম্পটের শিকার হয় এবং ফরিয়াদি পিতা তারিক বিন জিয়াদকে স্পেনে আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। আর তিনি ৯২ হিজরির শবে কদরের একদিন পর ২৮ রমজানুল মুবারক ১৯ জুলাই ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াদিয়ে লাক্কায় অবিস্মরণীয় বিজয়ের স্বাক্ষর রেখে স্পেন অধিপতি রডারিকের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। এরপর তাঁকে সামনে এগিয়ে যেতে আর তেমন কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর বীরত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অস্বাভাবিক যোগ্যতা এবং ইসলামের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বিজিতদের সাথে অতুলনীয় ব্যবহারে মুগ্ধ স্পেনবাসী যেমন চোখ তুলে তাকাবার সাহস করেনি, তেমনি এ বিজয়কে তারা তাদের পরাজয় হিসেবে গন্য করেনি। গুটিকতেক ক্ষমতাপাগল ছাড়া কেউ তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

তারেকের পর মুসা বিন নুসাইরের আগমন ঘটলে মুসলিম গাজিরা অপ্রতিরোধ্য বন্যার বেগে আন্দালুসিয়ার শহর-বন্দর জয় করে আল্পস পর্বত পাড়ি দিয়ে ফ্রান্সে

গিয়ে পৌঁছান। আন্দালুসিয়া বিজয়ের এ অগ্রবাহিনী দক্ষিণ-ফ্রান্সের বিপুল এলাকা জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু শীতকালের আগমন তাদের অগ্রযাত্রার পেছনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মরুচারী আরবরা তীব্র শীত সহ্য করতে না পেরে আর নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে আল্পস পর্বতমালায় ফিরে আসেন। তখনকার সময় এ পর্বত ছিল স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারক। মুসা বিন নুসাইরের ইচ্ছা ছিল পরবর্তী বছর সুইজারল্যান্ড, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া হয়ে কনস্টান্টিনোপলের লাগোয়া বলকান এলাকার রাষ্ট্র বুলগেরিয়া, রোমানিয়া এবং ইতালি জয় শেষে পুনরায় কনস্টান্টিনোপল এসে পৌঁছাবেন। অতঃপর রোমানদের এ রাজধানী বিজয়ের মাধ্যমে ইউরোপ বিজয় সমাপ্ত করে ইউরোপকে দামেশকের সাথে জুড়ে নেবেন।

মুসা আর তারিকের উচ্চাভিলাষী ও ইমানি শক্তিতে বলিয়ান মুজাহিদদের ইতঃপূর্বের কর্মদক্ষতা দেখে এটা মোটেও অসম্ভব মনে হচ্ছিল না। কিন্তু হায়! ইসলামের আলো পুরো ইউরোপকে আলোকিত করে তোলার পূর্বেই কেন্দ্র থেকে মুসা আর তারিককে তাদের বিজয়াভিযান অসমাপ্ত রেখে দামেশকে ফিরে যাবার নির্দেশ আসে। কেন্দ্রের এই নির্দেশ কেবল এ মহান দিগ্বিজয়ীদ্বয়কেই হতাশ করেনি; বরং ওই অঞ্চলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে এক ঘোর অমানিশার দিকে ঠেলে দেয়। দামেশকের মসনদে উপবিষ্ট সুলায়মানের স্বেচ্ছাচারি সিদ্ধান্ত এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম জাতিকে আন্দালুসিয়া ও সিন্ধু বিজেতার পুরো সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত রাখে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে যখন তারিক বিন জিয়াদ আন্দালুসিয়া জয় করেন, ঠিক সে বছর আরবের তরুণ তুর্কি মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু থেকে মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু তখনকার শাসকের সংকীর্ণ দৃষ্টি, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি অঞ্চল দুটিকে তার আমলনামার মতো কালো রেখে দেয়।

সুলায়মান আন্দালুসিয়া ও সিন্ধুর বিজেতাদ্বয়কে ডেকে এনে বন্দি করে তাঁদেরকে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দেয়। ফলে অঞ্চল দুটোতে কয়েকশত বছরের জন্য ইসলামের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য শতাব্দী কয়েক পরে সে অগ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয়। পূর্ব ইউরোপে উসমানি সুলতানগণ এবং উত্তর-পশ্চিমের হিন্দুস্তান আফগান বিজেতারা জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের বিজয় কেবল ভূখণ্ড বিজয়ের মধ্যেই থেকে যায়। প্রথমযুগের বিজেতাদের মতো মানুষের অন্তর জয় করে নিতে সক্ষম হয়নি। কেননা, ওই সময়ের বিজেতাদের কর্মপদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যে ধারণা ছিল, তা এই কালের বিজেতাদের মধ্যে ছিল না। এদের বিজিত এলাকায় ইসলাম এলেও অন্তরের গভীরে জায়গা করে নিতে পারেনি; যা আজ ভালো করেই অনুমিত হচ্ছে।

ইতালির দরজায়

মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন জিয়াদের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁরা মধ্য-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো জয় করে কুসতুনতুনিয়া এসে পৌঁছুবেন। অতঃপর এই সুন্দর পাথরটি ইসলামের আংটিতে জুড়ে নিয়ে দামেশকে এসে উপনীত হবেন। কিন্তু হায়! তাঁদের সে সোনালি আশা বাস্তবতার মুখ দেখতে পারেনি। মুসার প্রায় ৭০০ বছর পর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ইস্তাম্বুল বিজয়ের মাধ্যমে ইউরোপ জয়ের এক দুর্লঙ্ঘ বাধা অপসারণ করে নিলে আরেকবার পূর্বসূরিদের সোনালি আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ এসে যায়। কেননা, তখনো আন্দালুসিয়ায় চলছিল মুসলিম শাসন। আন্দালুসিয়ার অবস্থান হচ্ছে দক্ষিণ ইউরোপে। যদি পূর্বদিক থেকে তুর্কিরা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আন্দালুসীয়রা হামলা চালাত, তাহলে মধ্যখানের ইউরোপীয় ভূখণ্ড পাকা আপেলের মতো মুসলমানদের হাতে ঝরে পড়ত। কিন্তু ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, স্বেচ্ছাচার আর স্বার্থপূজার ধ্বংস হোক! এই নষ্ট গুণগুলো আন্দালুসীয় মুসলমানদের এগিয়ে আসতে দেয়নি।

আমরা আগেই বলে এসেছি সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ৮৫৭ হিজরিতে কনস্টান্টিনোপল জয় করে নিয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপল বিজয় শেষে সুলতান সেখানে না থেমে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। ৪ জুমাদাস সানি ৮৮৫ হিজরি আহমদ কর্ক পাশা নামক তাঁর জনৈক খ্যাতনামা জেনারেল বিজয়ীর বেশে ইতালির ভূখণ্ডে গিয়ে প্রবেশ করেন। ইতঃপূর্বে কোনো উসমানি মুজাহিদ সেখানে পৌঁছুতে পারেননি। তিনি ইতালির দক্ষিণ উপকূলীয় বন্দর ওন্টারিওতে গিয়ে পৌঁছান। ইতালি বিজয়ের জন্য বন্দরটি কব্জা করা ছিল পূর্বশর্তের পর্যায়ে। শহরটিকে ইতালির প্রবেশদ্বার হিসেবে গন্য করা হতো। এর পূর্ববর্তী বছর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এক বিশাল যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।

সুলতানের অভ্যাস ছিল—তিনি তাঁর অভিপ্রায়গুলো রহস্যের আড়ালে রাখতেন। সময়ের পূর্বে সেগুলো কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত না। এমনকি তাঁর দুনিয়াখ্যাত জেনারেল ক্রিমিয়া বিজেতা আহমদ কর্ক পাশা, ভেনিস বিজেতা মাহমুদ পাশাসহ মাসিহ পাশারাও সুলতানের অভিপ্রায়গুলো আগে জানতে পারতে না। কখন কোন দিকে হামলা করতে হবে সেটা ছিল কেবল তাঁর একক সিদ্ধান্তের উপর। তিনি যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপারগুলো এতটাই রহস্যের চাদরে আবৃত্ত রাখতেন যে, বলা হয়—একবার কোনো এক অভিযানের জন্য সেনাবাহিনীতে সেনা ভর্তি চলছিল। তখন তাঁর জেনারেদের মধ্যে একজন সাহস করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—'মহামান্য সুলতান! আমরা কোন শহরটি বিজয়ের জন্য সৈন্যসমাবেশ ঘটাতে যাচ্ছি?' সুলতান তাকে জবাব দিয়েছিলেন—'আমার দাঁড়ির অসংখ্য লোমের মধ্যে একটিও যদি এই গোপনীয়তা ভেদ করে ফেলে, তাহলে আমি ওটা ছিঁড়ে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলব।'

তবে জনসাধারণ আভাস ও লক্ষণে অনুমান করছিল এবারের বিশাল প্রস্তুতিটা বোধহয় রোম বিজয়ের জন্য। কেননা, ইতোঃমধ্যে ইতালিতে আক্রমণের দরজা খোলে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর বাপ-দাদার রোম বিজয়ের স্বপ্ন পূর্ণ হতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু হায়! হঠাৎ করেই মুসলিম উম্মাহর আশা-ভরসা দপ করে নিভে যায়। ৩ মে ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৪ রবিউল আউয়াল ৮৮৬ হিজরি ৫১ বছর বয়সী সুলতান হঠাৎ করেই কোনো রোগ ব্যতীত নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

যদিও এখন বলা সম্ভব নয় যে, তিনি জীবিত থাকলে পরবর্তী বছর কী হতো, তথাপি এটা স্থির করেই বলা যায় যে, তাঁর মৃত্যু ইউরোপের প্রাণহীন কায়ায় প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে যায়। ইউরোপ সুলতানের ভয়ে এতটাই তটস্ত ছিল যে, আবুল হাসান আলি নদবি রাহ. তাঁর *ইসলামি দুনিয়া পর উরুজ আওর জাওয়াল কা আসর* গ্রন্থের ২১৬ পৃষ্ঠায় লেখেন—

> 'সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের মৃত্যুসংবাদ শুনে রোম পোপ পুরো ইউরোপকে আনন্দ উদযাপনের নির্দেশ দেয়। সে আরও নির্দেশ দেয়—সর্বশ্রেণির খ্রিষ্টান যেন তিন দিনব্যাপী শুকরিয়ার প্রার্থনা করে। নিশ্চয় ইউরোপীয়দের এ আনন্দটা ছিল তাদের বিলীয়মান রাজধানী রক্ষা পাবার ভিত্তিতে। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুযায়ী তখন ইতালি ব্যতীত ইউরোপে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট ছিল না, যার জন্য স্বয়ং সুলতানকে এগিয়ে যেতে হতো। এ ছাড়া তখন স্পেনের উপর সমাগত কঠিন বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা হচ্ছিল এই জাগ্রত মেধাসম্পন্ন সুলতান পূর্ব-ইউরোপ থেকে দক্ষিণ-ইউরোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে তারও একটা বিহিত ব্যবস্থা করে আসবেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়,

সুলতানের মৃত্যুর ফলে কেবল ইতালিই বেঁচে যায়নি,[৩৪] স্পেনের খ্রিষ্টানরাও বাইরের সাহায্য নিয়ে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের মৃত্যুর মাত্র ১১ বছর পর ৮৯৭ হিজরি মোতাবেক ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে চিরতরে গ্রানাডা থেকে মুসলিম শাসনের বাতি নিভিয়ে দেয়। এরপর স্পেনে ছেড়ে আসা ইলম ও প্রজ্ঞা দ্বারা নিজেদেরকে সাজিয়ে তুলে। ফলে আজ তারা বিশ্বের সকল সমুদ্রের পানি নাড়িয়ে ফেনা তোলার পাশাপাশি গ্রহপুঞ্জগুলো দখলের পায়তারা করছে।'

স্পেনের পতন আমাদের মূল আলোচনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাহিনিটা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। স্পেনে যখন বনি উমাইয়ার শাসন বিলুপ্ত হয় তখন স্পেন উপদ্বীপে গড়ে উঠে ছোট ছোট অসংখ্য স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য। রাজ্যগুলোর প্রত্যেক শাসনকর্তাই মনে করতো মুসলমানদের উন্নতি এবং ইউরোপে মুসলমানদের ঠিকে থাকা তার রাজত্ব ঠিকে থাকার উপরই নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করতো অপরের চেয়ে বড় এবং একজন অপরজনের বিরুদ্ধে লেগেই থাকত। মুসলমানদের এ অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারী খ্রিষ্টানরা অনেক দূর এগিয়ে যায়। তারা ক্রমশ তাদের রাজ্যবিস্তার শুরু করে। অবশ্য মুরাবিতিন[৩৫] এবং মুওয়াহহিদিনদের[৩৬] যুগে মুসলিম রাজ্যগুলোর পারস্পরিক মতভেদ অনেকটা কমে এসেছিল। কিন্তু সেটা ছিল অত্যন্ত সাময়িক। তাদের পরে খ্রিষ্টানরা পুনরায় তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে মেতে ওঠে। দুর্ভাগ্য এমনভাবে ঝাঁকিয়ে ধরে যে, মুসলমানদের দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে একসময় পুরো ইউরোপ স্পেনকে মুসলিমশূন্য করার ব্যাপারে একজোট হয়ে ওঠে। তখন তাদের মন-মগজে মুসলিম হত্যার ভূত চেপে বসে।

এদিকে দিন দিন মুসলিম শাসকরাও হয়ে উঠছিলেন একজন অপরজনের প্রাণের শত্রু। তাদের জন্য প্রতিপক্ষকে হত্যা করা হয়ে উঠেছিল বাড়তি একটা বিনোদনের বিষয়। কোনো অজুহাত ছাড়াই মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলনে

.....

[৩৪] সুলতানপুত্র দ্বিতীয় বায়েজিদ ইতালি থেকে উসমানীয় বাহিনীকে ডেকে এনে দখল করা ওট্রান্টো বন্দর ইতালিয়ানদের হাওয়ালা করে দেন।

[৩৫] আফ্রিকার বারবার জাতির একটি গোত্র। এরা একাদশ শতাব্দীতে ১০৬১ থেকে ১১৪৭ পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শাসনকাজ পরিচালনা করে। এরপর তারা স্পেনে তাদের শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করে নেয়। এই সরকারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম বীর ইউসুফ বিন তাশফিন। যিনি ১০৬১ থেকে ১১০৭ পর্যন্ত মোট ৫০ বছর শাসনকাজ চালিয়ে গেছেন।

[৩৬] আফ্রিকার বারবারদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইবনে তুমারত; যিনি ছিলেন ইমাম গাজ্জালির ছাত্র। তারা দ্বাদশ শতাব্দীতে আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। তাদের রাজত্ব ছিল উত্তর আফ্রিকার মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত।

কোনো ইতস্ততা করতো না। সবচে বড় অভিশাপ যেটি ছিল সেটি হচ্ছে—একজন মুসলিম অধিপতি তার প্রতিপক্ষকে পদানত করার উদ্দেশ্যে বিনা শর্তে খ্রিষ্টানদের ডেকে আনতে কুণ্ঠিত হতো না। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের কঠিন থেকে কঠিনতম শর্তও তারা মেনে নিতে কোনো দ্বিধা করতো না। এতদভিন্ন বেদনাদায়ক ব্যাপারটি ছিল, খ্রিষ্টানদের সহায়তায় বিজয়ী হবার পর মুসলিম শাসকরা তাদের বিজিত ভূখণ্ডের অর্ধেক বা একাংশ খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্বে তুলে দিতে একটুও ভবিষ্যৎ চিন্তা করতো না। এভাবেই খ্রিষ্টানদের কঠিন কাজটা মুসলমানরা তাদের নিজেদের হাতেই সমাধা দিয়ে যেতে থাকে।

মুসলমানদের লাঞ্ছনা আর অধঃপতন এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল যে, খ্রিষ্টানদের সাথে উপযাচক হয়ে সন্ধিকরণ, তাদেরকে কর প্রদান এবং নিজেদের দুর্গগুলোর চাবি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে কোনো প্রকার লজ্জাতাড়িত হতো না। কিন্তু আপন স্বজাতির সাথে সন্ধি করতে বা তাদের সাথে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে লজ্জাবোধ করতো। ঠিক সে মুহূর্তে যখন উসমানীয় মুজাহিদগণ রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে তা খ্রিষ্টানদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসছিলেন, ততদিনে স্পেনের বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে হতে একেবারে গ্রানাডায় এসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

প্রিয় পাঠক! অনুগ্রহ করে উপর্যুক্ত লাইন কটি পড়ে বর্তমান মুসলমানদের অবস্থানকে পতনকালের স্পেনীয় মুসলমানদের অবস্থানের সাথে তুলনা করে বলুন স্পেনের সে করুণ ইতিহাস থেকে বর্তমানকালের মুসলমানদের জন্য শিক্ষা নেওয়ার কোনো উপকরণ আছে কি না।

গ্রানাডার টাকশালে

দুই পাগলের সম্মিলন

স্পেনের পাশে ক্যাস্টল এবং অ্যারাগন নামক যে দুই রাজ্য ছিল—ওরা ছিল আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী। ওই সময় সেখানকার ক্ষমতায় ছিল রাজা ফার্দিনান্দ এবং সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা। এরা উভয়েই ছিল মুসলমানদের কট্টর শত্রু।

স্পেনের পতনকালে আপদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যারা ছিল আজন্ম শত্রু, তারা পরস্পর শত্রুতা ভুলে কেবল যে একাত্ম হয়ে যায় তা-ই নয়; বরং রাজ্য দুটো একত্র হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—যেকোনো মূল্যে স্পেন থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। এখানে যেন কসম খাওয়ার মতোও একজন মুসনমানের অস্তিত্ব না থাকে। ঐতিহাসিকরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন—

> 'এরা ছিল মাত্রাহীন লোভী এবং চরম সাম্প্রদায়িক। ফার্দিনান্দের ছিল রাজ্যজয় এবং স্বেচ্ছাচারিতার নেশা। ইসাবেলার নেশা ছিল স্পেন উপদ্বীপকে মুসলিমশূন্য করা। তাদের এ নেশা একসময় পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়।'

ইহুদিরা ইতঃপূর্বেও ধর্তব্যের মতো কোনো শক্তি ছিল না। তারা কখনো খ্রিষ্টানদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। পক্ষান্তরে মুসলমানদের একহাতে ছিল ক্ষুরধার কলম, অপর হাতে ছিল রক্তপায়ী তলোয়ার। তাই ইসাবেলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার বাহিনীকে উত্তেজিত করার নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করতে থাকে। কখনো সে তার সেনাক্যাম্পে এবং লড়াইয়ের ময়দানে বর্ম পরে হাজির হতো।[৩৭] একবার সে এই বর্ম পরিহিত অবস্থায় জনৈক মুসলিম মুজাহিদের আক্রমণ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যায়। মুসলমানদের নয়নাভিরাম, আলিশান ইমারতগুলো তার চোখে কাটা হয়ে বিধত। একবার তার ইচ্ছে জাগে, সে গ্রানাডায় অবস্থিত আল হামরাকে কাছে থেকে দেখবে। এ লক্ষে সে প্রাসাদের নিকটবর্তী হলে অল্পের জন্য মুজাহিদদের হাতে বন্দিত্ব এড়াতে সক্ষম হয়।

[৩৭] সেই বর্মটা আজও মাদ্রিদের শাহি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ঘটনা হচ্ছে—সে আল হামরা দেখার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি ইমারতের ছাদে উঠে মানুষের হাতে তৈরি ওই বিস্ময়কর সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। কতিপয় মুজাহিদ তখন তার অবস্থান জানতে পেরে দ্রুত ইমারতটি টার্গেট করে অবরোধ করে ফেলেন। ইসাবেলার সৌভাগ্য; তাকে যখন প্রায় বন্দি করে নেওয়া হচ্ছিল, ঠিক সে সময় তার দেহরক্ষী-বাহিনী এগিয়ে এসে জীবনের বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সেদিন ইসাবেলা বন্দি হলে বোধয় স্পেনের ইতিহাসের পট ভিন্নভাবে রচিত হতো। ইসাবেলাকে তার বাকি জীবন মুসলমানদের কারাগারে কাটাতে হতো। আর মুসলমানরা হয়তো স্পেন হারাতেন না।

ইনকুইজিশন

ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলা ধর্মীয় দিক দিয়ে ছিল গোঁড়া ক্যাথলিক। তারা সকল জাতিগোষ্ঠী এবং ভিন্নমতের অবসান ঘটিয়ে স্পেনকে সম্পূর্ণ ক্যাথলিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখার জন্য ছিল বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে তারা ইনকুইজিশন নামক মানবেতিহাসের এক ঘৃণ্যতম আদালতের জন্ম দেয়। ভয়ঙ্কর এই আদালতে সর্বশ্রেণির মানুষকেই জবাবদিহি করতে হতো। এমনকি যেসব পাদরি ধর্মীয় শাখাগত বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো, তাদেরকেও ইনকুইজিশন আদালতে উপস্থিত করা হতো। তাদেরকেও ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।

এসব আদালতের এখতিয়ারের কোনো সীমারেখা ছিল না। তারা যে কাউকে ইচ্ছা করলে গ্রেফতার করে কেবল মাসের পর মাসই নয়; বরং বছরের পর বছর কোনোপ্রকার শুনানি ব্যতিরেকে বন্দি করে রাখার অধিকার রাখত। এ ছাড়া শুনানির পূর্বে বন্দিদের অপরাধ কী? বাদী কে—ইত্যাকার বিষয়গুলো স্পষ্ট না করারও অধিকার রাখত। মামলা চলাকালে যদি কোনো বন্দি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করতো, তাহলে তাকে এমন কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো যে, বন্দি লোকটি আরোপিত অপরাধ স্বীকারের মধ্যেই নিজের কল্যাণ খুঁজত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অপরাধ স্বীকার করার পর তাকে বলা হতো, তুমি বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে—'আমি কোনো প্রকার ভয়-ভীতি এবং জোর-জবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায়, স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগগুলো স্বীকার করছি।' যদি কেউ এমনটি করতে রাজি না হতো, তাহলে তার উপর জারি হতো অনিঃশেষ শাস্তির ধারাবাহিকতা। শাস্তির মেয়াদ নির্ধারণের মধ্যেও ধরাবাধা কোনো নিয়ম ছিল না।

সাধারণত ইনকুইজিশন আদালতগুলোর প্রধান ব্যক্তি হতো উন্মাদপ্রায় পাদরি। তাদের মুখ থেকে যা কিছু উচ্চারিত হতো সেটাই হতো আইন, সেটাই হতো চূড়ান্ত কথা। আদালতগুলোর কর্মকর্তারা নিজেদের পরিচিতির জন্য সবুজ ক্রস গলায় ঝুলিয়ে রাখত। এদের দেখলেই মানুষ আতঙ্কে কেঁপে উঠত। স্পেনের বিখ্যাত চিকিৎসক 'ম্যাগোমেল সার্বেতু'কে এই ইনকুইজিশন আদালত ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। এই মহান চিকিৎসককেই রক্তপ্রবাহের আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে।[৩৮] ইনকুইজিশন আদালতের আসামীদের শাস্তি শুনানো ও শাস্তি প্রদানকে একটা ধর্মীয় কাজ হিসেবে গন্য করা হতো। যারা এ ধর্মীয় কাজ থেকে গা-বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করতো, তাদেরকেসহ তাদের পরিবার-পরিজনকেও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো।

ভারতের ঘৃণ্য পুটা আইন মূলত স্পেনের এই ইনকুইজিশন আদালতের কালাকানুন থেকে আহরিত। এই আইন প্রণয়নের জন্য ভারতীয় নীতিনির্ধারণী একটি টিমের স্পেন সফরের কথা সুবিধিত। কিন্তু এই মানবতাবিরোধী কালাকানুন যেভাবে স্পেনীয়দের কপালে চিরস্থায়ী কলঙ্কের টিকা পরিয়ে রেখেছে, ভারতীয়দের কপালেও তা-ই পরাবে। যা স্মরণ করতে ভারতীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই লজ্জাবোধ করবে। আজকাল প্রতিবাদস্বরূপ কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর যে সংস্কৃতি দেশে দেশে বহুল প্রচলিত, খুব সম্ভব এর ভিত্তি হচ্ছে অপরাধীর অনুপস্থিতিতে শাস্তি আরোপের অমানবিক পদ্ধতি থেকে।

নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার নজীরবিহীন প্রদর্শনী

কর্ডোভাসহ অপরাপর বিখ্যাত শহরগুলো খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যাবার পর মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র গ্রানাডায় তখন সুলতান আবুল হাসানের শাসন চলছিল। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর সব হারিয়ে তারা এমন এক মহান সুলতান খুঁজে পেয়েছিলেন, যার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অতীত ভুলের মাশুল আদায় করা যায়। তিনি ছিলেন একজন বাহাদুর সেনাপতি এবং সুন্দর ব্যবস্থাপক। আশা করা যাচ্ছিল তিনি যথাযথভাবেই হতাশাগ্রস্ত মুসলিম জাতিসত্তাকে উদ্ধার করতে পারবেন। তিনি সিংহাসনে আসীন হলে মুসলমানরা আশায় বুক বাধে। এ আশা যে অমূলক কিছু ছিল না, তার একটা

[৩৮] 'বলা হয়ে থাকে' শব্দপ্রয়োগের কারণ হচ্ছে এ আবিষ্কার মূলত মুসলমানদের। কিন্তু আমেরিকা-আবিষ্কারসহ অন্যান্য শাস্ত্রীয় আবিষ্কার ও গবেষণাগুলোকে এভাবেই খ্রিষ্টানদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রমাণ হল—শত্রুরা তাঁর ভাই মুহাম্মাদ বিন সাদকে[৩৯] তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তারা আজজাগাল এবং সুলতান আবুল হাসানের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে স্বার্থোদ্ধারের পথ ধরে এগিয়ে যায়। কিন্তু প্রখর ধীমান ও সতর্ক আজজাগাল দ্রুত গ্রানাডায় পৌঁছে ভাইয়ের হাতে আনুগত্যের শপথ করে নিলে খ্রিষ্টানদের এ চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। যদি আত্মাকে বিলিয়ে দেওয়ার এ মহান গুণটি পরবর্তীরা চর্চা করতেন, তাহলে স্পেনের ইতিহাস বোধয় এতটা হৃদয়বিদারক হতো না।

পুরো স্পেন থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়ে তখন গ্রানাডায় সুলতান আবুল হাসানের নেতৃত্বে সমবেত। তারা তখন অস্তিত্বের লড়াইয়ে নেমে নিজেদের অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছিল। ফার্দিনান্দ গ্রানাডা দখলের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি শুরুর পর ৮৮০ হিজরিতে[৪০] সুলতান আবুল হাসানকে পত্রযোগে হুমকি দেয়—'যদি কল্যাণ চাও তাহলে আমাদেরকে প্রদেয় করের পরিমাণ জানিয়ে দাও।' তখন যদি গ্রানাডার মসনদে আবুল হাসান ছাড়া মেরুদণ্ডহীন কোনো বাদশাহ থাকত, তাহলে সানন্দচিত্তে কর প্রদানের মাধ্যমে আরও কয়েক ঘণ্টার জীবন ভিক্ষা চাইতে একটুও দ্বিধা করতো না।

কিন্তু আবুল হাসান ফার্দিনান্দকে যে কঠিন জবাব দিয়েছিলেন ইতিহাস তা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তিনি জবাবে লিখেছিলেন—

> 'গ্রানাডার টাকশাল এখন মুদ্রা উৎপাদন করে না; বরং সেখানে এখন এমনসব তলোয়ার উৎপাদন হয়, যা খ্রিষ্টানদের ঘাড় থেকে মস্তক উড়িয়ে দেওয়ার জন্য থাকে সর্বক্ষণ উন্মুখ।'

আবুল হাসানের এ দুঃসাহসিক জবাব রাজা ফার্দিনান্দ এবং সম্রাজ্ঞী ইসাবেলাকে একেবারে কাঁপিয়ে দেয়। অথচ অবস্থাটা ছিল এতটাই করুণ, যখন সুলতান আবুল হাসান রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন গ্রানাডার শাসন ৪ হাজার বর্গমাইলের চেয়েও কম জায়গায় সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। আর ক্যাস্টল ও অ্যারাগনের পাশাপাশি স্পেনের দখলকৃত শহর মিলিয়ে ফর্দিনান্দ ও ইসাবেলার রাজত্ব ছিল সোয়া লাখ বর্গমাইলব্যাপী। কিন্তু সুলতান আবুল হাসান আর তাঁর সঙ্গী-সাথিরা যখন দৃঢ় ইচ্ছা করে নেন—'আমাদেরকে এখানে স্বাধীনভাবেই বেঁচে থাকতে হবে। খ্রিষ্টানদের অধীনতা থেকে আমরা মৃত্যুকেই প্রাধান্য দেব।' তখন এই সিদ্ধান্ত

---

[৩৯] যিনি সুলতান আজজাগাল নামে খ্যাত ছিলেন এবং মালাগায় নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন, শত্রুরা তাঁর মোকাবিলায় টিকতে না পেরে পুরানো প্রতারণার আশ্রয় নেয়। আজজাগাল ছিলেন সুলতান আবুল হাসানের ভাই। মালাগার শাসক। আফ্রিকার তিলমিসান শহরে মারা যান।

[৪০] সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের ইনতেকালের ৬ বছর পূর্বে।

যেন মুসলমানদের অন্তরে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায় এবং তা অসংখ্য রণপ্রান্তরে ক্যারিশমাটিক জৌলুশও দেখায়।

বাহাদুর পিতার হতভাগা পুত্র

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা; যারা একত্রে রাজ্য পরিচালনা করছিল। তারা আবুল হাসানের এ তেজোদ্দীপ্ত জবাব শুনে কয়েক বছরের ভেতর আক্রমণের দুঃসাহস করেনি। কিন্তু তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি থেমে থাকেনি। অবশেষে ৮৮৭ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে[৪১] সুলতান আবুল হাসান খবর পান ফার্দিনান্দ কয়েক বছরের প্রচেষ্টার পর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গ্রানাডার দিকে ধেয়ে আসছে। তার বাহিনীতে রয়েছে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নাইটদল। বড় বড় পাদরিরা এদের মাথায় হাত বুলিয়ে বরকতের দুআ দিয়ে পাঠিয়ে ছিল। এ ছাড়া সমগ্র ইউরোপের গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা চলছিল– এ যাত্রায় যেন স্পেন থেকে ইসলামের নাম আর চিহ্ন মিটিয়ে ফেলা যায়।

সুলতান আবুল হাসান এ ধরনের সংবাদে ভীত হবার মতো লোক ছিলেন না। খবরটা শুনে যেন তার জিহাদি জযবায় আগুন ধরে যায়। সংখ্যায় অল্প হবার পরও গ্রানাডায় অবরুদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের পরিবর্তে তিনি ময়দানে বেরিয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত করে বসেন। এ সিদ্ধান্তের আলোকে গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী লুজা শহরের উপকণ্ঠে ২৩ জুমাদাল উলা ৮৮৭ হিজরিতে সুলতান এবং ফার্দিনান্দ-বাহিনীর মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা প্রাণপণ লড়াই করে স্পেনবিজয়ী মুজাহিদদের হারানো গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সংখ্যায় অল্প হবার পরও তারা ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীকে ন্যস্তনাবুদ করে ফিরিয়ে দেন। তাঁদের সাহস এবং জিহাদের আকাঙ্ক্ষা বহুগুণ বেড়ে যায়।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়! সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন সুলতান মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার মরণপণ জিহাদে বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করছিলেন এবং ভবিষ্যতের খ্রিষ্টশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা আঁটছিলেন; গ্রানাডায় বসে তার হতভাগা পুত্র আবু আবদিল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলছিল।

[৪১] সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের ইনতেকালের পূর্ববর্তী বছর।

হতভাগা শাসক

আবু আবদিল্লাহ ইসলামি ইতিহাসের সেই দুর্ভাগা শাসক, যে তার বোকামির মাধ্যমে ইউরোপ থেকে মুসলমানদের নির্বাসিত হবার এবং ইলমি, চারিত্রিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হয়ে উঠেছিল। যার কর্মকাণ্ড আজ-অবধি আমাদেরকে লাঞ্ছনার অতলে ফেলে রাখছে। তার পিতা সুলতান আবুল হাসান লুজার ময়দানে সম্মিলিত খ্রিষ্টান-বাহিনীকে পরাজয়ের মাধ্যমে স্পেনের স্থিতি, সেখানে ইসলামের রেনেসাঁ এবং ঐক্যের একটা সোনালি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তিনি যখন লুজার ময়দানে পরাজিত বাহিনীর লাশের আশপাশে প্রদক্ষিণ করছিলেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় এ দুঃসংবাদ এসে পৌঁছুয় যে, তারই পুত্র আবু আবদিল্লাহ্ গ্রানাডা কব্জা করে সেখানে তার স্বাধীন কর্তৃত্ব ঘোষণা করে বসেছে।

মুসলিম-বাহিনীর অধীন কয়টি-ই-বা শহর ছিল। নির্বোধ আবু আবদিল্লাহ অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার মাধ্যমে সেগুলোও বণ্টন করে নেয়। অথচ এমনটা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা, পিতার পর সে-ই তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকার হতো।[৪২] যদি সে সিংহাসনের জন্য এতটা উন্মাদ হয়ে না পিতার হাতকে আরও শক্তিশালী করতো, তাহলে সে আরও বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হতো। কিন্তু তার চরিত্র-পাঠে মনে হয় মুসলমানদের লাঞ্ছনা আবু আবদিল্লাহর রূপধারণ করে তাদের ভাগ্যে চেপে বসেছিল। যেখানেই মুসলমানদের কিছুটা আশার কিরণ দেখা যেত, সেখানেই সে হতাশা আর অপমানের কারণ হয়ে উপস্থিত হতো।

সুলতান আবুল হাসানের অসহায়ত্ব কী পর্যায়ের ছিল তা এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, তিনি সম্মিলিত খ্রিষ্টান-বাহিনীকে পরাজিত করার পর বাড়ি ফিরে যেতে পারেননি। কোনো উপায় না দেখে তিনি সেখান থেকে মালাগায় চলে আসেন। আর এভাবেই তখনকার মুসলিম শাসনাধীন স্পেন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অর্ধ-পূর্বাংশে পুত্র এবং অর্ধ-পশ্চিমাংশে পিতার সমান্তরাল শাসন চলছিল। ছোট্ট এই রাষ্ট্রটি দু-খণ্ড হয়ে যাওয়ায় খ্রিষ্টানদের আনন্দের কোনো সীমা থাকেনি। তারা আন্দালুসিয়া দখল করার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। সুতরাং সেভিল[৪৩] এবং

[৪২] অল্প কিছুদিন পর সুলতান আবুল হাসান পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে অকেজো হয়ে পড়েছিলেন।

[৪৩] পতনের কয়েক বছর পূর্বে মুসলমানদের হাতছাড়া হওয়া আন্দালুসিয়ার একটি বিখ্যাত শহর।

সেখানকার আশপাশের খ্রিষ্টানরা একত্রিত হয়ে সুলতান আবুল হাসানের অধীন মালাগায় আক্রমণ চালিয়ে বসে। বাহাদুর সুলতান তখন আরেক দফা তাঁর অপূর্ব রণকৌশল দেখিয়ে এবং মুজাহিদিনে ইসলামের অতুলনীয় শৌর্যের মাধ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে সেভিলের শাসকসহ প্রায় ২ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্যকে বন্দি করে নেন। বাকিরা হয়তো ময়দানে নিহত হয়, কিংবা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

কিন্তু এবারও তিনি আনন্দ উদযাপনের আগেই শুনতে পান, তারা মালাগা থেকে বের হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন—জানার সাথে সাথে নির্বোধ আবু আবদিল্লাহ মালাগা দখলের উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ছুটে আসছে। এবার সুলতান আবুল হাসানের কাছে হতভাগা ক্ষমতালিপ্সু পুত্রকে চরম শিক্ষা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় বাকি থাকেনি।

একসময় পিতা ও পুত্র ময়দানে মুখোমুখি হলে পিতার আক্রমণে দিশাহারা পুত্র আবু আবদিল্লাহ পালিয়ে গ্রানাডায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আবু আবদিল্লাহর এ পরাজয় মুসলমানদের অন্তরে শান্তির আশ্বাস নিয়ে আসে। তারা একটু স্বস্তি লাভ করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার ডানায় খ্রিষ্টানদের সাথে জিহাদের পালক গজিয়ে ওঠে। সে খ্রিষ্টান অধিকৃত লুজিয়ানায় আক্রমণ চালিয়ে বসে। কিন্তু তার মোকাবিলায় ছিল অতি অভিজ্ঞ কিছু যুদ্ধবাজ খ্রিষ্টান সেনাপতি। তারা যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ আবু আবদিল্লাহকে ধোঁকা দেয়। হামলা শুরু হলে তারা গ্রানাডা-বাহিনীকে প্রায় বিনা বাধায় এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু যখন গ্রানাডা-বাহিনী লুটতরাজ চালিয়ে ফিরে আসছিল, তখন খ্রিষ্টান-বাহিনী একটা গিরিপথে লুকিয়ে ওত পেতে থাকে। গিরিপথে পৌঁছামাত্রই শুরু করে দেয় চতুর্মুখি আক্রমণ। আকস্মিক এ আক্রমণের মাধ্যমে বেশিরভাগকে হত্যা করে অনেককে বন্দি করে ফার্দিনান্দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ সংবাদ শুনে গ্রানাডাবাসী; যারা আবু আবদিল্লাহর লোভী এবং বিদ্রোহী মানসিকতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এরপর তারা সুলতান আবুল হাসানের দরবারে পৌঁছে গ্রানাডার শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেবার আবদার জানায়। তারা শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া মুসলমানদের এই মুমূর্ষপ্রায় অবস্থা থেকে উদ্ধারের আবেদন করে। কিন্তু মুসলমানদের বিপদ তখনো শেষ হয়নি। এর বড় কারণ ছিল—তারা পুরো স্পেন থেকে পরাজিত হয়ে সীমিত জায়গায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার পরও নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তৈরি ছিল না।

গভীর দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে অনুমিত হয়; যখন তাদের পায়ের তলার মাটি সংকুচিত হয়ে আসছিল এবং গ্রানাডা তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, তখনও তারা পদ ও সম্পদের মোহ ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত

স্বার্থ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি চেপে বসেছিল। তাদের জান এবং মাল শত্রুর রাক্ষুসে মুখের সামনে থাকার পরও তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। তারা দিনরাত কান্নাকাটি করতো ঠিক, আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতো সত্য, বিভিন্ন পরামর্শ এবং পরিকল্পনাও করতো; কিন্তু স্বভাবের বক্রতা পরিবর্তনের জন্য তৈরি ছিল না। চোখের সামনে ভয়াবহ পরিণতি দেখেও তারা নেতৃত্বের লোভ থেকে আত্মসংবরণ করতে পারত না। কারণ, এতে তাদের বিলাসী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সুলতান আবুল হাসান পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে অব্যাহতি নিয়ে তদীয় ভ্রাতা আজজাগালকে গ্রানাডার শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেওয়ার এবং খ্রিষ্টানদের কবল থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নির্দেশ দিয়ে ঘরের কোণায় বসে পড়েন।

সুলতান আজজাগালের মধ্যে তাঁর বাপ-দাদার পৌরুষ এবং সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল। গ্রানাডার কর্তৃত্ব তাঁর হাতে এসে যাবার পরপরই তিনি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি এবং সেনাসদস্যদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেন। খ্রিষ্টানরা তার এ কর্মকাণ্ড দেখে তাকে সময় দেওয়া ভয়ানক হবে মনে করে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে বসে। যুদ্ধের একপর্যায়ে তারা সুলতানের তাঁবুর কাছে পৌঁছে যায়। মুসলিম-বাহিনী তাদের নেতার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে নিজেদেরকে সামলিয়ে এমন প্রতিআক্রমণ চালায় যে, তাদের সে আক্রমণে যুদ্ধের চিত্রপট সম্পূর্ণ পালটে যায়। খ্রিষ্টান-বাহিনী দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। তাদের হাজার হাজার সৈন্য মাঠে লাশ হয়ে স্তূপাকারে পড়ে থাকে।

খ্রিষ্টান-বাহিনীর পেছনে পেছনে ফার্দিনান্দ আরেকটি বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিল। সে যখন যুদ্ধের অবস্থা জানতে পারে, তখন আর সামনে অগ্রসর হবার সাহস করতে পারেনি। তবে নিজেদের ক্রোধ প্রশমনের জন্য পথে মুসলিম বস্তিগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে চলে যায়। এই যুদ্ধের অকৃতকার্যতার ফলে ফার্দিনান্দের বিশ্বাস জন্মে যায়—মুসলিম-বাহিনী সংখ্যায় যতই অল্প থাক না কেন, মাঠে সরাসরি তাদের সাথে পেরে উঠা সম্ভব নয়। এরা সংখ্যায় যতই অল্প হোক না কেন যদি তারা পরস্পর মতানৈক্য ভুলে মাঠে চলে আসে, তাহলে আজও পুরো স্পেন আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাই ফার্দিনান্দ যুদ্ধের পথ পরিহার করে রাজনৈতিক চক্রান্তের পথ ধরে এগিয়ে যায়। এখান থেকেই সেই বেদনাদায়ক অধ্যায়ের শুরু।

অনৈক্যের শাস্তি

ফার্দিনান্দ এবং তার উপদেষ্টা মুসলমানদের চারিত্রিক অধঃপতনের বিষয়টি টার্গেট করে নিয়েছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল মুসলিম শাসকশ্রেণি ক্ষমতাকে দায়িত্বশীলতা নয়; বরং ভোগবিলাসের মাধ্যম মনে করে থাকে। জনসাধারণও জাতীয় স্বার্থের উপর নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। প্রত্যেকেই যার যার ধ্যান-ধারণায় বিভোর। জায়েজ না জায়েজের কোনো পরোয়া না করে কার আগে কে লাভবান হবে—এ ব্যাপারে যেন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বিপদে যদিও যুদ্ধের মাঠে চলে আসে; কিন্তু মাথার উপর থেকে বিপদ সরে যাওয়া-মাত্রই তারা নিজেদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। আবার সেই লোভ ও ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় শত্রুর অর্ধেক কাজ এই লোভী ও আয়েশি সম্প্রদায়ই সম্পাদন করে চলছিল।

ফার্দিনান্দ তার উপলব্দিতে পৌঁছার পর দাগাবাজির পথ ধরেই অগ্রসর হয়। এমতাবস্থায় চরিত্রহীন মুসলমানরাই শত্রুর অর্ধেক কাজ সমাধা দিয়ে যাচ্ছিল। শত্রুকে তেমন একটা কষ্ট করতে হয়নি। ফার্দিনান্দ তখন ক্ষমতালোভী আবু আবদিল্লাহকে বন্দিখানা থেকে মুক্ত করে তার সাথে উত্তম আচরণ করে। তাকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেয়।

আবু আবদিল্লাহ বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক ফার্দিনান্দের দরবারে আসা-যাওয়া করতে পারাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিতবোধ করে। সে মনে করছিল এটা তার বিরাট সম্মান। কেননা, শত্রু তাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। একদিন ফার্দিনান্দ কথায় কথায় আবু আবদিল্লাহকে বলে—

> ‘গ্রানাডার সিংহাসনের দাবিদার তো মূলত তুমি। তোমার চাচা আজজাগাল জোরপূর্বক সেখানে শাসন করে যাচ্ছেন। তুমি যদি তোমার অধিকার ফিরে পেতে চাও আর আমাদের সাহায্য কামনা করো, তাহলে আমরা আমাদের সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে তোমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাব। আমরা চাই আমাদের ও আমাদের প্রতিবেশি মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে যেন সম্পর্ক

ভালো থাকে। কেউ যেন কারও উপর অন্যায় হাত না বাড়ায়। আমরা সবসময় শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে। গ্রানাডার সিংহাসনের অধিকারীরা নিজেদের তো মুসলমান বলে দাবি করছে। কিন্তু ওরা আসলে মুসলমানদের দুর্নাম ছাড়া কিছু করছে না। ওদেরকে আমরা কখনো ক্ষমা করতে পারব না। তবে যে পরিমাণ ভূখণ্ড তোমার অধীনে আসবে, সেখানে আমাদেরকে বন্ধুর মতোই পাবে। যেকোনো প্রয়োজনে ডাকলে আমাদেরকে তোমার পাশে পাবে। আমাদের দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে—এটা কখনো ভাববে না।'

ফার্দিনান্দের প্রতরণামূলক এ কথাগুলো বোকা ও ক্ষমতালিপ্সু আবু আবদিল্লাহকে আবার উত্তেজিত করে তুলে। সে তখন খ্রিষ্টানদের বিরোধিতায় না গিয়ে তাদের দয়া ও অনুকম্পার উপর জীবন চালিয়ে যাওয়াকেই কল্যাণ মনে করে। আবু আবদিল্লাহ যদি নিজে প্রতারিত হয়েই বসে থাকত, সাধারণ মুসলমানকে তার সাথে না জড়িয়ে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিত, তাহলে হয়তো এতটা লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হতো না।

আজজাগালের নেতৃত্বে প্রশাসন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। কিন্তু আবু আবদিল্লাহ সেই শাসনকে তার ভবিষ্যতের সেই সবুজ বাগান হিসেবে দেখে আসছিল—ফার্দিনান্দ তাকে যে বাগানের স্বপ্ন দেখিয়ে চলছিল। প্রতারিত আবু আবদিল্লাহ তখন ফার্দিনান্দের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সোজা মালাগায় গিয়ে পৌঁছায়। সে সেখানকার জনগণকে একথা বোঝানোর প্রয়াস পায় যে, ফার্দিনান্দের সকল সহায়তা আমার সাথে রয়েছে। তোমরা যদি আমাকে নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিতে রাজি থাকো, তাহলে ফার্দিনান্দের পক্ষ থেকে চির নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। অন্যতায় অচিরেই দেখতে পাবে আজজাগালের অধিকৃত ভূখণ্ডে কেয়ামতের কী বিভীষিকা বয়ে যাচ্ছে। ভীরু ও আত্মপূজারি জনগণও ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা না করে সামান্য ফুসলানোর প্রেক্ষিতেই শত্রুর বাড়ি থেকে দাওয়াত খেয়ে আসা আত্মবিকৃত আবু আবদিল্লাহর কথায় সাড়া দিয়ে দেয়। আবু আবদিল্লাহ তখন নিজেকে সুলতান ঘোষণা করে বসে এবং মালাগার বাইরে তার কর্তৃত্ব প্রসারে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

সুলতান আজজাগাল যখন জানতে পারেন শত্রুর বন্দিদশা থেকে মুক্ত তাদের এজেন্ট মালাগার সিংহাসনে আসীন হয়ে গেছে, তখন তিনি তার বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু পথে থাকতেই জানতে পারেন এবার খ্রিষ্টানরা প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেই মাঠে নামার সুযোগ খুঁজছে। তিনি দেখতে পান আন্দালুসিয়ার সমুদয় খ্রিষ্টান একবাক্যে দুর্ভাগা আবু আবদিল্লাহর সঙ্গ দেওয়ার

জন্য প্রস্তুত। গ্রানাডার পাশের বেজিনের খ্রিষ্টানরা তাদের নেতা ফার্দিনান্দের সাহায্য-সহযোগিতায় সবার চেয়ে বেশ অগ্রগামী। সুতরাং আজজাগাল মালাগাবাসীকে তাদের অবস্থায় রেখে গ্রানাডায় ফিরে আসেন। এরপর শত্রুর শেখানো বুলি অনুসারে আবু আবদিল্লাহ আজজাগালের কাছে পত্র লেখে—

'আপনি লুজা[৪৪] আমার হাওয়ালা করে দিলে আমি আপনার সাথে মিলে ফার্দিনান্দের মোকাবিলায় চলে আসতে পারি।'

আবু আবদিল্লাহর এই আবেদনের মধ্যে কতটুকু বাস্তবতা ছিল, কতটুকু বিশ্বাস্য ছিল; তা না বললেও চলে। সুলতান তার আবেদনে সাড়া দিচ্ছিলেন না; কিন্তু তাঁরই কতিপয় অদূরদর্শী আমির এবং হতভাগা জনগণের চাপে তাকে রাজি হতে হয়। তারা তাকে প্রশ্ন করছিল—এমনটি করলে ক্ষতি কী? কিন্তু আবু আবদিল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা যে বাতুলতা,—সুলতান তাদেরকে সেটা বোঝাতে পারছিলেন না। মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের পূর্ণতাহেতু সুলতানকে শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতে হয়। আর এভাবেই লুজা আবু আবদিল্লাহর কব্জায় চলে যায়। লুজার কর্তৃত্ব হাতে পাবার সাথে সাথে নির্লজ্জ আবু আবদিল্লাহ ফার্দিনান্দকে ডেকে পাঠায় এবং তার অভ্যর্থনার জমকালো আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

গ্রানাডার নিরাপত্তার জন্য লুজা ছিল একটি নিরাপত্তাপ্রাচীরের মতো। ফার্দিনান্দ কয়েকবার সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তা দখলে নিতে পারেনি। কিন্তু আফসোস! আজ তার প্রতিপক্ষরাই তাকে ডেকে তারই হাতে তুলে দিচ্ছে। ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন—এটা জুমাদাস সানি ৮৯১ হিজরি সনের ঘটনা।

এবার মুসলমানরা চোখ খুলে দেখতে পায় সুলতানের কথাই ঠিক ছিল। বিদ্রোহী যুবরাজ তো বলে একটা আর করে আরেকটা। যে শহরটা বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করেও তারা দখলে নিতে পারেনি, সেটা মাত্র কয়েকদিনের ভেতর সে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। তারা তখন সজাগ হলেও কুদরত তাদেরকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিতে রাজি হয়নি। আসলে কথা হচ্ছে, যে জাতি ভালো-মন্দের যাচাই এবং হক-বাতিলের পার্থক্য সময়মত করতে পারে না, পরে ভুল বুঝতে পারলেও তা সংশোধনের সুযোগ পায় না। কেননা, ইতঃপূর্বেই তাদের সামনে ভালোমন্দ উভয়টি পেশ করা হলে তারা যখন মন্দটিই বেছে নিয়েছে তখন পরবর্তীতে আর আপত্তি করবে কীভাবে? কুদরতও তাদেরকে সে সুযোগ দেয়নি।

[৪৪] বর্তমানে 'লুজা' স্পেনের একটি প্রদেশ।

আবু আবদিল্লাহ এবার গ্রানাডার পাশে খ্রিষ্টানদের নিরাপত্তাছায়ায় বসে গ্রানাডার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। খ্রিষ্টানরা তাকে প্রবল উৎসাহ যুগিয়ে চলছিল। তাদের উৎসাহে হতভাগা আবু আবদিল্লাহ নিজেকে আন্দালুসিয়ার বাদশাহ মনে করছিল। তার ভাবনায় ছিল—আমার পেছনে আছে প্রবল পরাক্রান্ত খ্রিষ্টশক্তি। অতএব, আমাকে 'সুলতানে গ্রানাডা' হতে ঠেকায় কে?

এদিকে যখন চক্রান্ত অব্যাহত, ওইদিকে তখন মালাগার বাসিন্দারা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সুলতান আজজাগালের আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে মালাগা থেকে খ্রিষ্টান শাসনের চিহ্ন মিটিয়ে ফেলতে উদ্যত। এ বিষয়টা জানতে পেরে যে ফার্দিনান্দ এতদিন ধরে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের কথা আওড়ে চলছিল স্বরূপে আবির্ভূত হয়। সে এক বিশাল বাহিনী সাথে নিয়ে মালাগা অবরোধ করে বসে। এতদ্‌সঙ্গে উপকূলের দিক থেকে তার কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ এগিয়ে এলে মালাগা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সুলতান আজজাগাল যেহেতু মালাগাবাসীর আনুগত্যের সংবাদ শুনেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর আনুগত্যের ঘোষণার কারণেই মালাগাবাসী চরম বিপদের মুখে; তাই শত প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েও তিনি মালাগাবাসীর সহায়তার জন্য গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু হায়! হতভাগা আবু আবদিল্লাহ এই সুযোগে গ্রানাডা দখল করে নেয়। সুলতান আজজাগাল আবু আবদিল্লাহ কর্তৃক গ্রানাডা অভিমুখে এগিয়ে যাবার সংবাদ শুনে পেছনে ফিরতে চাইছিলেন; কিন্তু যখন জানতে পারেন ইতোঃমধ্যে গ্রানাডা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তিনি একটি মাঠে থেমে যান। ঐতিহাসিকরা সে মাঠকে 'ওয়াদিয়ে আশ' নামে স্মরণ করে থাকেন।

সেদিনের মুসলমানদের অসহায়ত্ব ছিল এই—তারা চতুর্দিক দিয়ে খ্রিষ্টান-বাহিনীর অবরোধের শিকার হয়ে পড়েছিল। সে-সাথে তাদের মধ্যকার অনৈক্য এবং ক্ষমতালিপ্সা ছিল আকাশস্পর্শী। তারা ভালোমন্দের যাচাই-বাচাই ছাড়া সেই ক্ষমতাবানের সহযোগী হয়ে যেতো যে-ই তাদেরকে হাত নাড়িয়ে ডাকত। যদিও গ্রানাডার মুসলমানদের কাছে এটা গোপন ছিল না যে, আবু আবদিল্লাহ এ পর্যন্ত তাদের কী উপকার করেছে এবং সুলতান আজজাগাল কোন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে মালাগাবাসীদের সহায়তায় গ্রানাডা থেকে বের হয়েছেন? তথাপি তারা আবু আবদিল্লাহকে গ্রানাডার মসনদে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তারা ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার কথা বলেই তার আনুগত্য গ্রহণ করে নেয়। মালাগাবাসী ছিল

খ্রিষ্টানদের দু-ধারী তলোয়ারের নিচে। তাদের এ বিপদ মূলত গ্রানাডার শাসকের কারণেই।

মোটকথা, গ্রানাডাবাসী আবু আবদিল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় এবং সেখানকার মেরুদণ্ডহীন কবি এবং বুদ্ধিজীবিরাও আবু আবদিল্লাহর নামে প্রশংসাগাঁথা শুরু করে দেয়। মালাগাবাসী সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিসর এবং তুর্কির মুসলিম শাসকদের সাহায্য প্রার্থনা করে। এসব রাষ্ট্রের মুসলিম মুজাহিদরা ইতঃপূর্বেও কয়েকবার স্পেনীয় মুসলমানদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু স্পেনীয় মুসলমানদের চরিত্র এতটাই বিগড়ে গিয়েছিল যে, খ্রিষ্টানদের বিপদ মাথার উপর থেকে কেটে যাওয়া-মাত্রই তারা ওই সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে নেমে আসতে মোটেও লজ্জিত হতো না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবারের ডাকে তাদের কেউই সাড়া দেয়নি। তখন তুর্কির শাসক ছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের পুত্র বায়েজিদ দ্বিতীয়। তিনি এমন এক আজব মেরুদণ্ডহীন প্রাণী ছিলেন, যিনি তাঁর ক্ষণজন্মা পিতার জয় করা ইউরোপীয় বিশাল এলাকার কর্তৃত্ব এমনিতেই ছেড়ে এসেছিলেন। অতএব, তিনি মালাগাবাসীর সাহায্যে চলে আসবেন—সে ছিল আকাশ-কুসুম কল্পনা।

সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে মালাগাবাসী ফার্দিনান্দের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। হায় দুর্ভাগ্য! কাল যারা জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে ফার্দিনান্দকে স্বাগতম জানিয়েছিল আজ তারা অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে তারই দয়ার ভিখারি। কিন্তু ফার্দিনান্দের জবাব কী ছিল? 'আজ তোমাদের রসদ ফুরিয়ে এসেছে এবং তোমরা সবদিক থেকে নিরাশ হয়েই সন্ধির আবেদন জানাচ্ছ। তোমাদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি হতে পারে না। তোমরা নিঃশর্তে শহরের চাবি আমাদের হাতে তুলে দাও!'

মালাগাবাসীর সরলতা প্রত্যক্ষ করুন। তারা তখনো ফার্দিনান্দের দয়া ও অনুকম্পা প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু তাদের সকল আশায় পানি ঢেলে ফার্দিনান্দ শহর দখল করে নেওয়ার পরই সর্বশ্রেণির মুসলমানকে বন্দি করে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে নেয়। সবার সম্পদ এবং জায়গা-জমি জবরদখল করে নেয়। শহরের বেশিরভাগ মুসলমান; যারা কোনো কাজে আসবে না—তাদেরকে আফ্রিকার দিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। সেই নির্বাসিতদের সাথে করে কিছু নিয়ে যাবার অনুমতি ছিল না। ফলে পাথেয়শূন্য এই অসহায় মুসলিম কাফেলার অধিকাংশই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পথিমধ্যে মারা যায়।

ফার্দিনান্দ এবং তার মাতাল স্ত্রী ইসাবেলা আশপাশের সমুদয় মুসলিম বস্তি এবং এবং দুর্গগুলো দখল করে সেখানে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রাখে এবং যাদেরকে তারা

কোনো প্রয়োজনের মনে করেনি তাদেরকে আফ্রিকার দিকে ঠেলে দেয়। এভাবে একের পর এক শহর জয় করতে করতে তারা 'আশ' উপত্যকার দিকে অগ্রসর হয়। যেখানে তখন অবস্থান করছিলেন রাজ্যহারা সুলতান আজজাগাল। সর্বহারা সুলতানের মধ্যেও আগের সেই বিক্রম অবশিষ্ট ছিল না। তিনি যুদ্ধ ব্যতিরেকেই 'আশ' উপত্যকা ফার্দিনান্দের হাতে ছেড়ে দেন। এরপর ফার্দিনান্দ সেই 'আল মুরিয়া' দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়, যাকে গ্রানাডার শেষ প্রতিরক্ষা হিসেবে গন্য করা হতো। এরপর মুসলিম শাসনাধীন বলতে কেবল গানাডাই বাকি থেকে যায়।

যখন গ্রানাডার সৌভাগ্য সূর্য ডুবতে বসছিল তখন আবু আবদিল্লাহ্ আল হামরা রাজপ্রসাদে চাটুকার পরিবেষ্টিত হয়ে তার চাচা আজজাগালের পরাজয়ের উপর আনন্দ লুটছিল। সে বলছিল—'আজ আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এবার আমিই সর্বেসর্বা একক সুলতান। আমার পেছনে রয়েছে খ্রিষ্টানদের আশীর্বাদ এবং সার্বিক সহযোগিতা।' আবু আবদিল্লাহ যখন আল হামরায় বসে এ রঙিন স্বপ্ন দেখছিল, তখন আচমকা ফার্দিনান্দের পক্ষ থেকে তার কাছে এ মর্মে পত্র পৌঁছে—'তোমার চাচা সুলতান আজজাগাল পুরো স্পেন আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। অতএব, তুমি গ্রানাডা ও আল হামরা আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

শেষ মোর্চা

পত্র পেয়ে আবু আবদিল্লাহর বুঝতে বাকি থাকেনি আপনজনদের সাথে গাদ্দারি ও শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করে তিনি আন্দালুসিয়া এবং এর অধিবাসীদের মতো নিজের উপর কত বড় জুলুম করেছেন। ফার্দিনান্দের জন্য তিনি যা করেছেন, কেউ এতটুকু করবে বলে তার ধারণাও ছিল না। কিন্তু স্বার্থ চরিতার্থ হয়ে যাওয়ামাত্রই তারা স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হতে এতটুকু দেরি করেনি। তখন সে শহরবাসীকে একত্রিত করে ফার্দিনান্দের পত্র পাঠ করে শোনায়। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে—'আমাদের সামনে কেবল দুটি পথ খোলা। হয় তার কথামত গ্রানাডা এবং আল হামরার চাবি তুলে দেওয়া, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া।'

গ্রানাডাবাসী ভালো করেই জানত এই বিপদের মূল কারণ আবু আবদিল্লাহর সত্তা, তার বোকামি, নেতৃত্বলিপ্সা এবং অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতা। নিজের স্বার্থ রক্ষার্থেই সে আন্দালুসিয়াকে এই চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থে তার মায়ের আবেদনটুকুও রক্ষা করেনি।[৪৫] কিন্তু তখনকার অবস্থায় ফার্দিনান্দের মোকাবিলায় যুদ্ধ করা ছিল অবান্তর। তারপরও গ্রানাডাবাসী যুদ্ধের পক্ষেই মত ব্যক্ত করে। বিপদ মাথার উপর জেনেও সে কোনোক্রমেই খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধের পক্ষপাতি ছিল না। সে সাহসও তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু জনগণকে একবাক্যে যুদ্ধের উপর একমত দেখতে পেয়ে কিছুটা সাহস করে বসে।

ফার্দিনান্দকে কোনো জবাব দেওয়া না হলেও সে জানত মুসলমানরা এমনিতে শহর হস্তান্তর অপেক্ষা মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দেবে। তাই সে জবাবের অপেক্ষা না করেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে গ্রানাডা অবরোধ করে বসে। গ্রানাডাবাসী যে পর্যায়েরই থাক না কেন, তারপরও তাদের শিরাগুলো বহন করছিল বীর মুসলিমদের রক্তের উত্তরাধিকার। যদিও রাজনীতি, দলাদলি এবং সম্পদের প্রাচুর্য তাদের চরিত্রকে

.....

[৪৫] সুলতান আবুল হাসানের প্রথমা স্ত্রী; আবু আবদিল্লাহর মাতা। সুলতানা আয়েশা কয়েকবার তাকে সাবধান করেছিলেন এবং আন্দালুসিয়া থেকে বিদায়ের মুহূর্তে যিনি তাকে উদ্দেশ্য করে যে ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন তা হচ্ছে—'যা পুরুষের মতো বীরত্ব দিয়ে হেফাজত করতে পারোনি, তার জন্যে নারীর মতো কান্না কেন'?

একবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেই কঠিন দিনেও তারা গ্রানাডার বাগানে, ফুয়ারার কিনারে এবং ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বসে কবিতা আবৃত্তি এবং শাস্ত্রীয় আলোচনায় বিভোর থাকত।

মোটকথা, তাদের ঘুনেধরা ইমানে আগুন লেগে শিখা ছড়াতে বেশি সময় লাগেনি। শহরবাসী যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায়। তারা সংখ্যায় অল্প হবার পরও এমন ঘূর্নিবেগে হামলা চালায় যে, ফার্দিনান্দ-বাহিনী দিশেহারা হয়ে ওঠে। গ্রানাডাবাসীর আক্রমণের এ তীব্রতা প্রত্যক্ষ করে ফার্দিনান্দের অনুমিত হয়—এটা দখল করার জন্য আরও প্রস্তুতি এবং আরও চক্রান্তের প্রয়োজন। এ অবস্থায় এখানে পড়ে থাকার অর্থ হবে অনর্থক প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়। তাই সেই অন্তিম যুদ্ধের অভিপ্রায়ে এখান থেকে অবরোধ উঠিয়ে দূরে সরে যায়। গ্রানাডাবাসী তখন ছিনিয়ে নেওয়া দুর্গ এবং শহরগুলো তাদের দখলে নিয়ে আসে। উদ্ধারকৃত অঞ্চলগুলোর মধ্যে আল বাশারাত ছিল অন্যতম। আল বাশারাতবাসী আবু আবদিল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করে সেখানে নতুনভাবে ইসলামি হুকুমত জারি করে নেয়। মুসলমানগণ সংখ্যায় হাতে-গোনার পর্যায়ে থাকলেও এ বিজয় তাদের সাহস অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তারা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আশাপাশ থেকে খ্রিষ্টান শাসন পরিষ্কার করতে লেগে যান। জাতিসমূহের উন্নতি-অধোগতির এক পর্যায়ে এমনও সময় আসে, যখন পিঠ দেয়ালে গিয়ে ঠেকে যায়, তখন তারা টলতে টলতে নিজেদেরকে সামলে নিয়ে অতীত ভুলের কাফফারা আদায়ে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। গ্রানাডাবাসী তখন সেই ক্রান্তিকালই অতিক্রম করছিল। তারা নিজেদের অতীতের ভুলের মাশুল আদায় করে চলছিল। খুব সম্ভব এ প্রচেষ্টায় তাদের ভুল শুধরে যেত; কিন্তু সেই নাজুক মুহূর্তে জাতির উপর এমন একটা আঘাত লাগে, যা থেকে মৃতপ্রায় রোগীর বাঁচা ছিল অসম্ভব।

ঘটনা হচ্ছে—সুলতানের চাচা আজজাগাল তখন আল বাশারাতে বসবাস করছিলেন। আবু আবদিল্লাহর নেতৃত্বে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গ্রানাডাবাসীর এ বিজয় তাঁর সহ্য হয়নি। তিনি ফার্দিনান্দের কাছে সংবাদ পাঠান—'আবু আবদিল্লাহ থেকে এভাবে নীরব থাকা হবে আত্মঘাতী পদক্ষেপ। সময় যত গড়াবে তার ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে। তখন তাকে সামাল দেওয়া হবে অত্যন্ত দুরূহ। ফার্দিনান্দ আজজাগালের কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পায়। সত্যিই তখন গ্রানাডাবাসীর অন্তরে ইমানের যে ঝলক দেখা যাচ্ছিল, যদি তারা আরও কিছুটা অবকাশ পেত তাহলে তাদেরকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াত। আজজাগালের জন্য উচিৎ ছিল জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং পরকালীন কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত জেদ দূরে রেখে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও অতীতকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি

হিংসা চরিতার্থে মেতে ওঠেন। যদি তিনি নিজেকে সংবরণ করে রাখতেন, তাহলে পরকালের মতো দুনিয়াতেও এর সুফল ভোগ করতেন।

ফার্দিনান্দ গ্রানাডা দখল করতে গিয়ে যে আঘাত পেয়েছিল, তাতে খুব তাড়াতাড়ি আর গ্রানাডাবাসীর মোকাবিলায় আসার কথা ছিল না। কিন্তু আজজাগাল খ্রিষ্টানদের কাছে লিখে পাঠান—'আমাকে সৈন্য ও অস্ত্র সহায়তা দেওয়া হলে আমি এ বিশৃঙ্খলা মিটিয়ে ফেলতে পারি।' এরপর তিনি নিজে 'আলমির' নামক দুর্গে পৌঁছে যান। এটা সেই দুর্গ, যা আবু আবদিল্লাহর গাদ্দারির কারণে তার হাতছাড়া হয়েছিল।

এবার আজজাগাল সেখান থেকে সেনাসাহায্য নিয়ে গ্রানাডা দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। এ সময় তারা উভয়েই মনে করছিলেন একমাত্র তিনিই গ্রানাডাবাসীর ত্রাতা এবং তার প্রতিপক্ষ ওদের জন্য আপদ। জনতার স্বার্থেই তার গ্রানাডার সিংহাসনে বসা জরুরি।

তখন ছিল ৮৯৫ হিজরি। গ্রানাডা পতনের এক বছর পূর্বের কথা। আজজাগাল রমজানুল মোবারকে[৪৬] খ্রিষ্টান-বাহিনীর সহায়তায় গ্রানাডা থেকে সেই এলাকাগুলো ছিনিয়ে নেন, যেগুলো গ্রানাডাবাসী তাদের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করার জন্য ফার্দিনান্দের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। হস্তচ্যুৎ সে এলাকাগুলো পুনরায় ফার্দিনান্দের দখলে আসার পরপরই ১৩ শাওয়াল ৮৯৫ হিজরি সে তার শক্তিশালী বাহিনী সাথে নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছায় এবং পাইকারিহারে মুসলমানদের হত্যা শুরু করে। সেখানে যতগুলো দুর্গ ছিল সবগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এমন গণহারে হত্যাযজ্ঞ চালায় যে, গ্রানাডার আশপাশে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার মতো একজন মুসলমানও অবশিষ্ট থাকেনি।

আজজাগালের এ বিশাল খেদমতের (!) বদৌলতে ফার্দিনান্দ ও তার বাহিনী চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করে। কিন্তু যেতে যেতে আজজাগালকে যে কথাগুলো বলে যায়, তাতে দুনিয়ার তাবৎ তল্পিবাহকদের জন্য কেয়ামতপর্যন্ত শিক্ষা বিদ্যমান থাকলেও আফসোস! কাউকে সেটা মানতে দেখা যায় না। মাওলানা আকবর শাহ খান নাজিবাবাদি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে সে কথাগুলো এভাবে উল্লেখ করেছেন—

> *'ফার্দিনান্দ আজজাগালের খেদমতের বিনিময়ে তাকে এ কথাগুলো শুনিয়ে দেয়—'সুলতান! এখন স্পেনে আপনার কোনো প্রয়োজনীয়তা*

.....

[৪৬] রমজানুল মোবারক সেই মাস, যে মাসে মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করেছিলেন। আজ সেই রমজানের সম্মান মুসলমানদের কাছে কেবল এইটুকুই রয়ে গেছে যে, মুসলমানরা এখন খ্রিষ্টানদের সহায়তায় নিজেদের ভাগ্য গড়ার চেষ্টা করে।

নেই। আমরা আপনাকে কেবল এইটুকু সহায়তা করতে পারি; আপনি যদি এখান থেকে (আন্দালুসিয়া থেকে) অন্য কোথাও চলে যেতে চান, তাহলে আমরা আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে পারি।'

একসময়ের দেশমাতৃকার প্রিয় সন্তান আজজাগাল হিংসাবশে যে লাঞ্ছনা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন, তার পক্ষে ফার্দিনান্দের এ কথাগুলোর কোনো জবাব ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে লাঞ্ছনার জীবন বরণ করে নিতে হয়। ফার্দিনান্দের জবাব শোনার পর কি জানি তার সিদ্ধান্ত পালটে যায়—এ ভয়ে তখনই আজজাগাল প্রিয় জন্মভূমি স্বপ্নের আন্দালুসিয়া ছেড়ে আফ্রিকা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। পরে তিলমিসান পৌঁছে তিনি বাকি জীবন অপরিচিতের মতো কাটিয়ে দেন।

মুসলমানদের সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে ফার্দিনান্দ তাদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে ছিল সম্যক অবহিত। সে জানত মুসলমানরা এখন আহত সাপের মতো ফনা তুলে ছোবল হানবে। তাই গ্রানাডার দিকে অগ্রসর না হয়ে সে তার বাহিনী নিয়ে দূরে চলে যায়। এদিকে আগুনের মতো তেঁতে থাকা গ্রানাডাবাসী শহর থেকে বেরিয়ে বার্সালোনা শহরটি দখল করে নেয়। কিন্তু খ্রিষ্টানদের যৌথবাহিনী দ্রুতই শহরটি তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। সেখানে তারা একজন মুসলমানেরও অস্তিত্ব বাকি রাখেনি।

গ্রানাডাবাসী সংখ্যায় ছিল অল্প। নেতৃবর্গের অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতায় তারা ছিল উত্যক্ত। তাদের হতাশার বড় কারণ ছিল—যখনই তারা বেরিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে, নেতৃত্বের অযোগ্যতার দরুন তা ধরে রাখতে পারেনি। তা ছাড়া পুরো আন্দালুসিয়া থেকে মুসলমানদের পাইকারিভাবে হত্যার সংবাদ তাদের কানে আসছিল। সর্বোপরি বাইরের মুসলিমবিশ্ব থেকে তারা সাহায্যের কোনো আলামত দেখতে পাচ্ছিল না।

ইসলামি ইতিহাসের বেদনাদায়ক দিন

৮৭৯ হিজরি মোতাবেক ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। ফার্দিনান্দ এবং তার উন্মাদ স্ত্রী ইসাবেলা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা পদানত করার জন্য এগিয়ে আসে। এ বিশাল বাহিনীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য অংশ নেয় অসংখ্য পাদরি। গ্রানাডার পাশে পৌঁছেই তারা সবুজ-শ্যামল মাঠের কৃষিখেত এবং নয়নাভিরাম বাগানগুলো জ্বালানো শুরু করে। এ ছাড়া এদিক-ওদিক হামলা চালিয়ে নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা শুরু করে।

গ্রানাডার উপকণ্ঠে পৌঁছেই ফার্দিনান্দ তার পুরানো বন্ধু আবু আবদিল্লাহর নামে পয়গাম পাঠায়—'যদি অস্ত্র সর্ম্পন না করো তাহলে আল হামরাসহ পুরো গ্রানাডা জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে ফেলব।' এ সময় স্পেনে কেবল গ্রানাডাই ছিল মুসলিম কর্তৃত্বে। সেখানকার মুসলমানরা জীবন-মরণের অন্তিম যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে ওঠেন। আট মাস অবধি খ্রিষ্টান-বাহিনীর অবরোধ চলছিল। কিন্তু তারপরও গ্রানাডার পতন ঘটানো সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা, শহরের একপ্রান্তে ছিল শালির পাহাড়। সেদিক দিয়ে অবরোধ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ছিল না বিধায় মুসলমানরা ওই পথে সাহায্য পেয়ে আসছিল। তবে শীত মৌসুমে যখন তুষারপাত শুরু হয় এবং পাহাড়ি পথে সাহায্য-সরবরাহ দুরূহ হয়ে ওঠে। তখন শহরবাসীদের মধ্যে অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করে। তারা শেষ পদক্ষেপস্বরূপ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 'ফার্দিনান্দ যদি আমাদের অস্ত্রগুলো পেতে চায়, তাহলে স্বয়ং তাকে এসে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা খ্রিষ্টানদের অবরোধে ক্ষুধায় কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ অপেক্ষা ময়দানে প্রাণ বিসর্জনকে অগ্রাধিকার দেবো। যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব।' তারা সমবেত হয়ে আবু আব্দিল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে—'যদিও আমরা সংখ্যায় ২০ হাজার থেকে কম এবং শত্রুবাহিনী লক্ষাধিক; কিন্তু আমরা তো আন্দালুসিয়া বিজেতা সেই তারিক বিন জিয়াদের রক্তের ওয়ারিস; যিনি অল্প ক'জন সৈন্য নিয়ে লক্ষাধিক রডারিক বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। অতএব, আমাদের অভিমত হচ্ছে, এবার যেন বীরত্বের উপর আপসকে অগ্রাধিকার দেওয়া না হয়।'

এই সাহসী মুসলমানরা যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা হলো—প্রতিদিন একজন বীর দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে দুর্গের বাইরে গিয়ে শত্রুপক্ষকে মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তেন। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়। তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে আসা খ্রিষ্টান বাহাদুররা কাটা পড়তে থাকে এবং মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে দুর্গে ফিরে আসতে থাকে। খ্রিষ্টান-বাহিনীর বেশ ক'জন নামিদামি জেনারেল নিহত হলে ফার্দিনান্দ তার বাহিনীর মধ্যে এদের জবাবে বের হবার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে বসে।

কিন্তু আবু আবদিল্লাহ ছিল এমনই হতভাগা যে, তখনও অপয় ও অকল্যাণ তার পিছু ছাড়েনি। সে যখন দেখতে পায় শহরবাসী মরতে অথবা মারতে একপায়ে খাড়া এবং দ্রুতই যুদ্ধ বা সন্ধির কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া গেলে জনতা তার বিশাল সাম্রাজ্যের(!) শৃঙ্খলা অতিক্রম করে যেকোনো সময় মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিতে পারে, তখন নিরুপায় হয়ে সে আল হামরায় মন্ত্রীদের এক পরামর্শসভা আহ্বান করে। পরামর্শসভায় মন্ত্রীবর্গের পাশাপাশি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকেও দাওয়াত দেয়।

সভা শুরু হলে ক্ষমতার বলে আল হামরার মসনদে উপবেশনকারী এবং নিজের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে দম্ভকারী মহান সুলতানের(?) সাহস এতই তলানিতে গিয়ে পৌঁছে যে, এবার তার মুখ থেকে এই বাক্য কটি ছাড়া আর কিছু বের হয়নি—'খ্রিষ্টানরা অবরোধও উঠিয়ে না নিলে আমাদের জন্য কী করা উচিৎ'? অর্থাৎ, দুর্বলচেতা এ অপদার্থ পরামর্শ দেওয়ার ছলে যেন মানুষকে ভীত করে তুলতে চাইছিল। চাইছিল পরামর্শ যেন তার মনমত আসে। মন্ত্রীবর্গ আর আমলারা ছিল তারই মতো পেটপুজারি ও ভোগবিলাসী। তারা লাঞ্ছনার হলেও বেঁচে থাকার শেষ কটা মুহূর্তের আশ্বাসকে হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। তাদের অধিকাংশের রায় ছিল সন্ধির পক্ষে।

হতাশাজনক এ অবস্থাদর্শন গ্রানাডার বাহাদুর সিপাহসালার মুসা বিন আবি গাস্সানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তিনি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলতে শুরু করেন—'শোনো হে কাপুরুষের দল! বিজয়ের আশা এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কোনো অবস্থায়ই সাহস হারানো উচিৎ হবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমরা এই কাপুরুষ খ্রিষ্টান-বাহিনীর অবরোধ ভেঙে তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারব।'

গ্রানাডার সাধারণ মানুষের অভিমতও ছিল তাদের বীর সেনাপতির মতো। কিন্তু সিদ্ধান্তের লাগাম ছিল যাদের হাতে, তারা ছিল মৃতপ্রায় নির্জীব। তারা বীর

সেনাপতির সাথে একমত না হয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে, 'যুদ্ধে যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে ফার্দিনান্দ পুরো স্পেনে একজন মুসলমানের অস্তিত্বও রাখবে না।'

দরবারি এ লোকগুলো যেন তাদের প্রজ্ঞা দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছিল। কিন্তু মৃত্যু যেমন কোনো বাহানার ধাঁধায় পড়ে পথ হারায় না, তেমনি কোনো কাপুরুষের তদবির মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণের সম্মিলিত আবেদনের পরও গ্রানাডার ব্যর্থ শাসক এবং তার কাপুরুষ আমলারা খোদ জনগণ থেকেও বেশি জনদরদি হয়ে ওঠে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়—'আমরা এমন শর্তে সন্ধি করে নেব, যাতে জনগণের মান-সম্ভ্রম এবং সহায়-সম্পদ সবকিছু রক্ষা পায়।' তারাও জানত খ্রিষ্টানরা আন্দালুসিয়াকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিমশূন্য করতে চায়। কারণ, তারা দেখে আসছিল ইতঃপূর্বে খ্রিষ্টানরা যেসব শহর জয় করেছে, সেখানে একজন মুসলমানের অস্তিত্বও রাখেনি। অথচ সন্ধি অপেক্ষা মুসলমানদের প্রাণের নিরাপত্তা এর মধ্যেই ছিল যে, কোনো ধরনের ঝামেলায় না গিয়ে শহরের দরজা খুলে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের হাতে শহরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া। কিন্তু হতভাগা আবু আবদিল্লাহ তো আজ-অবধি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর একটি সিদ্ধান্তও নিতে পারেনি। নির্লজ্জ এই লোকটি তারপরও নিজেকে তাদের বাদশাহ মনে করতো। তার সিদ্ধান্তের মধ্যেই ওদের কল্যাণ রয়েছে এই দাবিতে অটল ছিল। সে যখন বুঝতে পারে জনসাধারণ তার সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হয়ে যেকোনো সময় বিদ্রোহ শুরু করে দিতে পারে, তখন সে তার মন্ত্রী আবুল কাসিম আবদুল মালিককে গোপনে ফার্দিনান্দের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

খ্রিষ্টান সৈন্য এবং তাদের সেনাপতিরা দুর্গবাসীর অবস্থা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তারা দীর্ঘ আট মাসের অবরোধের পরও মুসলমানদের কিছু করতে না পেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। গ্রানাডার মন্ত্রীর উপস্থিতি এবং সন্ধির সংবাদ শুনে তাদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। সন্ধির প্রস্তাবটা গ্রানাডাবাসীর কাছ থেকে চেপে রাখার জন্য মন্ত্রী রাতের অন্ধকারে ফার্দিনান্দের দরবারে যায়। রাতের অন্ধকারেই সেই কালো সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং রাতের আঁধারেই তা আবার গ্রানাডায় পৌঁছে।

আবু আবদিল্লাহ এবং তার সঙ্গীরা মনে করছিল তারা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ সন্ধি করে নিয়েছে। এর মধ্যে লাভ কেবল তাদেরই। কিন্তু খ্রিষ্টানদের চিনতে তাদের তখনো অনেক বাকি ছিল। গ্রানাডার কর্তৃত্ব হাতে পাবার পর তারা সন্ধির একটা শর্তও পালন করেনি। হতভাগা আবু আবদিল্লাহরা বুঝতে পারেনি প্রাণের শত্রুর কাছ থেকে দয়া ও অনুকম্পার আশা করা কতটা বোকামি।

১ রবিউল আউয়াল ৮৯৭ হিজরি মোতাবেক ২ জানুয়ারি ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সবকিছু কার্যকর করতে ৬০ দিন সময় রাখা হয়। কিন্তু কয়েক দিন যেতে না যেতেই ১২ রবিউল আউয়াল ৮৯৭ হিজরি শহরটি খ্রিষ্টানদের হাতে বুঝিয়ে দিতে হয়। ঘটনা হচ্ছে—শত চেষ্টার পরও গ্রানাডার গলায় গোলামির জিঞ্জির পরানো এ চুক্তির কথা গোপন থাকেনি। জনগণ এবং সেনাবাহিনী চুক্তির কথা শুনে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। তাদেরকে না জানিয়ে এবং শক্তি পরীক্ষায় না গিয়ে কাপুরুষের মতো গোপনে এই সন্ধি করে নেওয়ার দরুন তারা আবু আবদিল্লাহর উপর ক্ষেপে ওঠে। ক্ষোভ যখন বিক্ষোভে রূপান্তরিত হতে চলছিল তখন আবু আবদিল্লাহর আশঙ্কা জাগে—উত্তেজিত জনতা তার তৈরি প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে। হতভাগাটি তখন জনতার এই উত্তেজনাকে কাজে লাগাবার পরিবর্তে তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে না দিয়ে সময়ের আগেই গ্রানাডাসহ আল হামরার চাবি ফার্দিনান্দের হাতে তুলে দেয়।

এই ছিল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক দিন, যেদিন গ্রানাডা অধিপতি তার বাপ-দাদাসহ পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য তথা যুদ্ধ করে জয় করা কিংবা সম্মানের মৃত্যুর বাইরে গিয়ে কলঙ্কের জীবন ও লাঞ্ছনার মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দেয়।

গ্রানাডার শেষ বীর মুসা বিন আবি গাস্‌সানের পক্ষে এ লাঞ্ছনার জীবন সহ্য হয়নি। শহরের চাবি প্রত্যর্পণের একরাত পূর্বে তিনি অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ একা শত্রুবাহিনীর বেষ্টনি বেধ করে শানিল নদীর দিকে এগিয়ে যান। দুনিয়া আজও গ্রানাডার সেই শেষ বীর শহিদের নাম উচ্চারিত হলে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়। তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে সালাম জানায়; কিন্তু যারা সন্ধির মাধ্যমে প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাদের নাম উচ্চারিত হবার সাথে ঘৃণায় কপাল কুঞ্চিত করে। হৃদয়ের কোণে জমা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে নিজেকে শান্ত করতে চায়।

পরদিন জুহরের নামাজান্তে আবু আবদিল্লাহ ৫০ জন সাথিসহ আল হামরার বাবুল জাদুর দিয়ে বের হয়ে সেই মসজিদের পাশে গিয়ে উপনীত হয়, যাকে আজ 'সান সাবাস্তিন' নামে ডাকা হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে সেখানে ফার্দিনান্দ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানে পৌঁছেই সে ফার্দিনান্দের হাতে চাবি তুলে দেয়। ফার্দিনান্দ চাবিটা হাতে নিয়ে তা তার স্ত্রী ইসাবেলার হাতে তোলে দেয় আর ইসাবেলা সেই চাবির গোছা হাতে নিয়ে যুবরাজের দিকে ছুঁড়ে মারে। যুবরাজও চাবিটা নিজের কাছে না রেখে তাদের সেনাপতি মাউন্ট টিউডোলার কাছে হস্তান্তর করে। এরপর আন্দালুসিয়ার সবচে বড় পাদরিকে নির্দেশ প্রদান করা হয়, সে যেন সর্বাগ্রে আল

হামরা কেল্লায় প্রবেশ করে এবং আল হামরার সবচে বড় গুম্বুজে উঠে সেখানে ৮০৬ বছর ধরে পতপত করে ওড়া ইসলামের পতাকা নামিয়ে ক্রসের প্রতীক ঝুলিয়ে দেয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইসলামের পতাকার জায়গায় ক্রসের প্রতীক টানানো-মাত্রই গ্রানাডার প্রতিটি ঘর থেকে যে হাহাকার এবং হৃদয়বিদারক কান্নার আওয়াজ উচ্চকিত হয়, সে কান্নায় আহত অন্তরগুলো থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। পাদরি আল হামরা অভিমুখে এগিয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সে বুরজুল হারাসা নামক টাওয়ারে গিয়ে উঠে। মুসলমানদের চাঁদ-তারা খচিত পতাকার স্থলে ক্রসের প্রতীক টানানো-মাত্র ফার্দিনান্দসহ তার পুরো বাহিনী প্রার্থনায় লুটিয়ে পড়ে এবং মা মরিয়মের প্রশংসাগাঁথা গাওয়া শুরু করে।

গ্রানাডার প্রতিটি ঘরের দরজা ছিল বন্ধ। প্রতিটি ঘরে মুসলমানরা ছিল শোকে মুহ্যমান। শহরের অবস্থা ছিল এতটা ভয়ানক ও বেদনাদায়ক, যার অনুভব আজও মুসলিম হৃদয়গুলোকে গলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো, সে অন্তরগুলোতে থাকতে হবে তাজা ইমান।

মুরের অন্তিম ফরিয়াদ

আবু আবদিল্লাহ ধ্বংসের বারোটা বাজিয়ে আন্দালুসিয়ার সুন্দরতম পহাড়শ্রেণি আল বাশারাতের ALPUXARRAS দিকে বিদায় হয়ে যায়। ততক্ষণে কাসরুল হামরার সুউচ্চ গুম্বুজে রৌপ্য নির্মিত ক্রস রৌদ্রালোকে তার দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। খ্রিষ্টান রাজা বিজয়ীর বেশে আল হামরায় প্রবেশ করছিল। মুসলমানদের অসহায়ত্ব ও ব্যথা-বেদনার পাশাপাশি খ্রিষ্টানদের আনন্দ-উল্লাস চলছিল। এক অপদার্থ, অদূরদর্শী ও অযোগ্য ব্যক্তি শতাব্দী-প্রাচীন উত্তরাধিকার খ্রিষ্টানদের কথায় বিশ্বাসী হয়ে তাদের হাতে তুলে দেয়। যাদের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের ব্যাপারে সে নিজে ছিল একাধিকবার প্রত্যক্ষদর্শী। 'আল্লাহ মানুষের উপর মোটেও জুলুম করেন না; বরং মানুষই নিজেদের উপর জুলুম করে থাকে।'[৪৭]

গ্রানাডার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হতভাগা আবু আবদিল্লাহ ফেলে আসা সে জান্নাতের দিকে থাকায়, যা নিজ অযোগ্যতায় সে কাফেরদের হাওয়ালা করে এসেছে। সে তখন নিজেকে সংবরণ করে রাখতে পারেনি। অনিচ্ছাবশত তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। রাজমাতা আয়েশা তখন তার চোখে অশ্রুপাত

[৪৭] সুরা ইউনুস : ৪৪।

দেখে ক্ষোভে এবং ঘৃণায় বলে উঠেন—'যা পুরুষের মতো বীরত্ব দিয়ে হেফাজত করতে পারোনি, তার জন্যে নারীর মতো কান্না কেন'?

যেখানে দাঁড়িয়ে আবু আবদিল্লাহ ঠান্ডা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল হতাশা আর অসহায়ত্বের নিদর্শনস্বরূপ, আজ সেই জায়গাটিকে 'মুরের আর্তনাদ' নামে ডাকা হয়। স্পেনে মুর শব্দ দিয়ে সাধারণত সকল মুসলমানকেই বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এটা সঠিক নয়। মুরের সঠিক অর্থ হচ্ছে উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত মুসলমান। আর আরব থেকে আগত মুসলমানদের বলা হতো সারাসিন Saracens। এটা মূলত আরবি শব্দ শিরকিয়্যিন এর অপভ্রংশ। এ হিসেবে মুসা বিন নুসাইর ছিলেন সারাসিন এবং তারিক বিন জিয়াদ ছিলেন মুর। (আল্লাহ অধিক জ্ঞাত)।

আল্লামা মাকরিজি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণনা করেন—

> 'যখন[৪৮] আমি ফেজ[৪৯] শহরে বসে এই বেদনাদায়ক উপাখ্যান লিখছি আবু আবদিল্লাহর উত্তরসূরিরা তখন মানুষের অনুগ্রহের উপর জীবন যাপছিল। সকল দুর্বলচেতা, চক্রান্তপ্রিয় নেতৃত্বের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। হতভাগা এই লোকটি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। চাচার পিঠে ছুরি চালিয়েছিল। অতঃপর যে খ্রিষ্টানরা কাজ সমাপ্তির পর তাকে চূড়ান্ত ধোঁকা দিয়েছিল, গ্রানাডার শেষ বীর এবং জনতার শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে তাদের মোকাবিলায় না বেরিয়ে তাদেরই হাতে রাজ্য সমর্পণ করে দেয় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ মসনদ আকড়ে থাকে, যাবৎ না গ্রানাডার পতন নিশ্চিত হয়। লোকটি যদি ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো নষ্ট না করতো, তার পিতাকে নিশ্চিন্তভাবে ফার্দিনান্দের মোকাবিলার সুযোগ দিত; তাহলে আজ হয়তো আন্দালুসিয়ার আকাশ আজানের শব্দ শোনার জন্য হাহাকার করতো না। সেখানে আজও এমনসব মানুষের শাসন অব্যাহত থাকত, যারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় হতো বিশ্বসেরা। যারা হতো ইউরোপের শিক্ষাগুরু এবং পথিকৃৎ। তারা কলম্বাসের পূর্বেই আমেরিকার অবস্থান জানত। কিন্তু তাদের পরাজয়ের পর ইসাবেলা কলম্বাসের মাধ্যমে সেই বছরই আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব নেয়।'

পশ্চিমা ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিকরা একথা জোর দিয়ে প্রচার করে থাকে যে, কলম্বাস আমেরিকা এবং ভাস্কো দা-গামা হিন্দুস্থান আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ দাবির স্বপক্ষে যথাযোগ্য কোনো প্রমাণ উপস্থান করতে পারে না। তারা এ কথার

[৪৮] এটা ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দের কথা।
[৪৯] বর্তমানে মরক্কোর একটি শহর।

জবাব দিতে পারে না—কলম্বাস যদি আগেই আমেরিকার ব্যাপারে অবগত হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম সফরেই আরব কাপ্তান, আরব মাল্লা এবং আরব দোভাষী সাথে নিয়েছিল কেন? কেন কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছে প্রথমে আরব মুদ্রার লেনদেন করল? কেন সেখানে আরবিভাষী মানুষ পাওয়া যেত? এ বিষয়গুলো কি এটা প্রমাণ করে না যে, কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের আগেই আরবরা সেখানে বসতি গড়ে নিয়েছিল?

মোটকথা, ইসাবেলার পয়সায় কলম্বাসের আমেরিকা সফর এমন একটা উপাখ্যান; যা ইউরোপবাসীর সাম্প্রদায়িকতা এবং অন্যের কৃতিত্ব ছিনতাইয়ের জঘন্য উদাহরণ। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইদরিস, যিনি আলাবি বংশধারার হওয়ার কারণে শরিফ ইদরিসি নামে খ্যাত ছিলেন। যিনি ছিলেন বিশ্বখ্যাত এবং সর্বজনমান্য চার ভূগোলবিদদের একজন; তার লিখিত গ্রন্থ *নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক*[৫০] কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে লেখা হয়েছিল। ইদরিসির মৃত্যু হয় ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। অথচ আমেরিকা আবিষ্কারের প্রচারণা চলে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে। ইদরিসি তার গ্রন্থে যে আট চাচাতো ভাইয়ের দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের বিবরণ লিখেছেন, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় স্পেনের দুঃসাহসি নৌ-অভিযাত্রীরা আটলান্টিকের ওপারে কী রহস্য রয়েছে; তা ভেদ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সেই অভিযাত্রীদের একটি দল সমুদ্রের এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিলেন বলে প্রমাণ বিদ্যমান, যেখানকার মানুষ ছিল 'আশকার' তথা লাল বর্ণের। কলম্বাস যেহেতু তার ধারণায় হিন্দুস্থান পৌঁছেছিল, তাই এদের দেখেই নাম দিয়েছিল রেড ইন্ডিয়ান বা 'আল হানুদুল আহমার'। বাস্তবতা হচ্ছে, স্পেনীয় মুসলমানরা শুধু আটলান্টিকের দিক থেকেই আমেরিকা আবিষ্কার করেননি; বরং আলাসকার দিক থেকেও আবিষ্কার করেছিলেন। সেখানকার লোকগুলো ছিল মূলত এশীয় মুসলিম; যারা রুশ সীমান্তে অবস্থিত 'বায়রঙ্গ' নামক চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। তাদের এই অনুপ্রবেশ যেহেতু পর্যটক এবং বণিক হিসেবে ছিল, বিজয়ীর অনুপ্রবেশ ছিল না; তাই সেটা প্রচার করা হয়নি। কিন্তু মুসলমানদের কাছ থেকে স্পেন ছিনিয়ে নেওয়ার পর খ্রিষ্টানরা তাতে নিজেদের নামের ট্যাগ লাগিয়ে দেয়।

আন্দালুসীয় মুসলমানরা সেই ঐতিহাসিক সময়ে নিজেদের কৃতিত্বের কথা গোপন না রাখলে বাহ্যিক সম্ভাব্যতার আলোকে বলা যায়, আজ এশিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কেবল এক আল্লাহর নামধারীরাই থাকত। আর এ বিশাল শক্তি থাকা অবস্থায় মুসলমানরা আজ এত হীন হতো না। নিজেদের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ জ্ঞানকারী

[৫০] ভূগোলশাস্ত্রে মধ্যযুগের প্রামাণ্য কিতাবের একটি।

সেই অদূরদর্শী শাসকশ্রেণির কারণে আজকের এ অবস্থা। তাদের নির্লিপ্ততার দরুনই আজ স্পেনীয় মুসলমানদের আবিষ্কৃত ভূখণ্ডকে নিজেদের আবিষ্কার বলার পাশাপাশি সেখানে তাদের ধর্ম ছাড়া কোনো ধর্মের অস্তিত্ব নেই। আজ তারা সামরিক শক্তিতে যে পরিমাণ বলীয়ান, তাতে মনে হচ্ছে হজরত মাসিহ কিংবা হজরত মাহদির আগে আর সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানরা যে জুলুম ও বর্বরতার শিকার, এটা তৎকালীন মুসলিম শাসকশ্রেণির অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের পরিণতি। তারা সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে সময়ের ডাকে লাব্বাইক বলার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থচিন্তা আর ভোগবিলাসে মত্ত থেকে উম্মাহর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে গেছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। সাহস ও দৃঢ়তা পাথরের মতো জমে গিয়েছিল। ফলে কুদরতও তাদের জন্য জমিন সংকীর্ণ করে দেন।

ইতিহাস অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের মৌলিক কারণ অধ্যয়ন করা। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কুরআনে হাকিমে উল্লেখিত ঘটনাবলিসহ সমাজের আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঐতিহাসিক বাস্তবতা মানুষকে প্রায় চিৎকার করে এই সৃষ্টিজগতের মৌলিক শৃঙ্খলা সম্পর্কে অবহিত করছে। কিন্তু প্রজ্ঞাবানরা ব্যতীত কেউ সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না।

আন্দালুসিয়া থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন মনুষ্য ইতিহাসের নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবে ঘটনাটির পরতে পরতে রয়েছে শিক্ষাগ্রহণের আদিগন্ত বিস্তৃত সাহারা। স্বেচ্ছাচার এবং গৃহযুদ্ধের ফলে আন্দালুসিয়ার যে বিশাল উত্তরাধিকার মুসলমানদের হাতছাড়া হয়েছে, তা যেন সময়ের কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বলছে—হে মানুষ! শিক্ষাগ্রহণের দৃষ্টিতে আমার প্রতি থাকাও। আমার ধ্বংস থেকে শিক্ষা নাও। মানুষের মধ্যে যারা ইমান, সৎকর্ম, নিয়মনীতি, মেহনত এবং দীনদারি ও জিহাদি জজবায় সমৃদ্ধ হয়, পৃথিবীকে তাদের দাস বানিয়ে দেওয়া হয়। আর যারা এসব গুণাবলি থেকে বঞ্চিত থাকে, সময় তাদেরকে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তারা এমনভাবে হারিয়ে যায়, যেন কোনো কালে তারা সেখানে ছিলই না।

দন্তখোলা জাহান্নাম

মূল ইয়ারুশালেমের (জেরুসালেম) আগে

[আমেরিকায় ইহুদি প্রভাবের পটভূমি ও এর কারণ]

আমেরিকার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির উপর ইহুদিদের প্রভাব ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে বিরাট একটা প্রশ্ন। আজ থেকে প্রায় ৫১৫ বছর পূর্বে যখন আমেরিকা আবিষ্কার হয়নি; পরিচিত বিশ্ব কেবল তিনটি মহাদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল, তখন ইহুদি সম্প্রদায় এক মহাদেশ (এশিয়া) থেকে বহিস্কৃত হয়ে অন্য একটি মহাদেশে (ইউরোপে) গিয়ে বসতি গড়ে নেয়। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে, কালপরিক্রমার একপর্যায়ে তারা একটি নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশে চলে গেল এবং সেখানে তারা অতি অল্পসংখ্যক হওয়ার পরও সংখ্যাগরিষ্ঠদের ব্যবহার করার, তাদের উপর ছড়ি ঘোরানোর মতো শক্তি হয়ে গেল? এই প্রশ্নের গাঠুরি নাড়াচাড়া করলে অনেক রহস্যসহ অজানা এমনসব তথ্য সামনে চলে আসবে, যেগুলো আজকের শিক্ষার্থীদের জন্য জেনে রাখা খুবই জরুরি। এগুলো না জানলে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে আমেরিকার আচরণ এমন কেন, তা-সহ ফিলিস্তিন সমস্যার মূল কারণ অজানা থেকে যাবে।

ইহুদিরা যখন তাদের জঘন্য আচরণের প্রেক্ষিতে জেরুসালেম থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বহিস্কৃত হয়, তখন তাদের বিভিন্ন গোত্র যেখানে পারে সেখানেই আত্মরক্ষার খাতিরে চলে যায়। পুরো বিশ্বে কোথাও তারা নিরাপত্তা পাচ্ছিল না। সংকীর্ণমনা ও উগ্র সাম্প্রদায়িক খ্রিষ্টানরা আগে থেকেই তাদেরকে শত্রু মনে করতো। তবে মুসলমানরা আহলে কিতাবি হিসেবে ইহুদিদের কিছুটা উদারচিত্তে দেখতেন। উত্তর আফ্রিকার একটির পর একটি রাজ্য জয় করে মুসলমানরা যখন মাগরিবুল আকসা তথা বর্তমান মরক্কোতে এসে উপনীত হন,[৫১] তখন মনে করা হয় তারা পৃথিবীর এক প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছেন।

[৫১] মরক্কোকে তৎকালীন সময় বিশ্বের প্রান্তসীমা মনে করা হতো।

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের [জুলকারনাইন][৫২] পশ্চিমদিকের প্রথম অভিযাত্রা এখানে এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সূর্যকে আটলান্টিক সাগরে হারিয়ে যেতে দেখেন। এটা ছিল পশ্চিমদিকে স্থলভাগের শেষ প্রান্ত। এরপরই আটলান্টিকের শুরু। যাকে তখনকার সময় অন্ধকার সাগরও বলা হতো। তখন কেউ জানত না এই মহাসমুদ্রের ওপারে কী আছে। তৎকালে এ নিয়ে সমাজে অনেক মিথ চালু ছিল। তা ছাড়া সামুদ্রিক সফরের জন্য এমন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়নি যা এত দীর্ঘ সফরের সামর্থ্য রাখে। যার কোনো প্রান্তসীমা জানা নেই, এত দীর্ঘ সফরে বের হয়ে কেউ জীবন্ত ফিরে আসবে সে কল্পনা ছিল তখন অসম্ভবের পর্যায়ে।

প্রখ্যাত মুসলিম বিজেতা উকবা বিন নাফে আফ্রিকা জয়ের মিশন পূর্ণ করার পর তার ঘোড়া সমুদ্রের উপকূলে নামিয়ে যে ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, তা আজও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। উকবার পর বিজেতারা তাদের অভিযাত্রা দক্ষিণদিকে নিবদ্ধ করেন এবং 'জাবালুত তারিক' [জিব্রালটা] প্রণালী অতিক্রম করে ইউরোপে প্রবেশ করেন। এ পথেই স্পেনে মুসলমানদের ঐতিহাসিক শাসনকাল শুরু হয়েছিল। তাদের আগমনের সাথে সাথে এখানকার ইহুদিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মুসলিম স্পেনের পতন হলে পুনরায় তারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। কুরআনে কারিমের অমোঘ বাণী হচ্ছে—'যুগে যুগে ইহুদিরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং এরা কারও সহায়তা ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। যখনই তারা নিজ পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে, দাঁড়াবার পূর্বেই তাদের গোঁড়ালি পেটের সাথে লেগে যাবে।'[৫৩]

স্পেনের মুসলিম সরকার ইহুদিদের সাথে উদার আচরণ করে আসছিল। তাদের প্রশাসনে ইহুদিদের অনেকেই উচ্চপদে সমাসীন ছিল। মুসলমানদের পতনকাল শুরু হলে ইহুদিরা অনুমান করে নেয়—এবার মুসলমানরা এখান থেকে উচ্ছেদ হতে যাচ্ছে এবং চরম সাম্প্রদায়িক খ্রিষ্টানরা ক্ষমতায় এলে তাদেরকে খ্রিষ্টান হয়েই এখানে বসবাস করতে হবে। অন্যথায় মুসলমানদের মতো তাদেরকেও স্পেন ছাড়তে হবে। সময়টা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষা ইহুদিদের জন্য খুবই শঙ্কাজনক। তারা তখন বুঝে উঠতে পারছিল না—এ দুঃসময়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। ঠিক

---

[৫২] কুরআনে উল্লেখিত একজন প্রভাবশালী বাদশাহ। কারও কারও মতে তিনি ছিলেন নবি। অধিকাংশ পণ্ডিতদের বক্তব্য হলো—জুলকারনাইন হলেন প্রতাপশালী সম্রাট আলেকজান্ডার। জুল কারনাইনের অর্থ দুই শিং-ধারী। বলা হয়, যেহেতু তিনি ছিলেন পূর্ব থেকে পাশ্চাত্যের বিশাল ভূ-ভাগের অধিকর্তা, তাই তাকে জুলকারনাইন নামে অভিহিত করা হয়। সুরা বাকারা : ৬১।

[৫৩] এ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে তাদের উপর লাঞ্ছনা এবং আল্লাহর রোষানলে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

সেই ক্রান্তিকালে ইতালির ইহুদি বংশোদ্ভুত কাপ্তান কলম্বাস আশীর্বাদ হয়ে সামনে আসে এবং তারা সোনালি দিগন্তের আশায় আশাবাদী হয়ে ওঠে।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির জেনোয়া শহরে প্রখ্যাত তন্তুবায় ডেমিনিকো কলম্বাসের ঔরষে জন্মগ্রহণ করে। অত্যন্ত মেধাবী ক্রিস্টোফার অতি অল্পদিনেই লেখাপড়া শিখে পিতার ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সমুদ্র ও ভূগোলের প্রতি তার আন্তরিক টান দিন দিন জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। কৈশোরেই কলম্বাস সামুদ্রিক মানচিত্র সংগ্রহ ও নিজে মানচিত্র তৈরি করার নেশায় ঝুঁকে পড়ে। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই সে মাল্লা পদে চাকুরি জুটিয়ে নেয়। ২১ বছর বয়সে একজন সফল নৌকমান্ডার হিসেবে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাগরে ইতালি অপেক্ষা পর্তুগালের আধিপত্য বেড়ে গেলে উচ্চাভিলাষী কলম্বাস ১৪৭৭ সালে ইতালি ছেড়ে পর্তুগালে স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলে। ১৪৭৮ সালে কলম্বাস পোর্টারসান্টোর গভর্নর বার্তালোমোর কন্যা ফেলিপা মোয়েস দা পেরেস্ত্রল্লোর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

কলম্বাসের এতোদিন সাগরের সাথে সম্পর্কের একমাত্র ইচ্ছে ছিল একজন সফল নাবিক হিসেবে নাম কামাবে। কিন্তু বিয়ের পর তার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন চলে আসে। তখন তার ইচ্ছে জাগে নৌ-অভিযানের মাধ্যমে নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করে প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন করবে। সৌভাগ্যক্রমে তার শ্বশুর বার্তালোমোও ছিলেন একজন ঝানু সাগর-বিশারদ। সাগর সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল সাগরতুল্য। তিনি তার সম্ভাবনাময়ী, পরিশ্রমী ও অধ্যাবসায়ী জামাতার জন্য দিকপাল হয়ে ওঠেন। বার্তালোমোর মৃত্যুর পর তার সংগ্রহে থাকা সাগর-সংক্রান্ত প্রচুর মূল্যবান দলিল ও মানচিত্র কলম্বাসের হাতে চলে আসে। এসব মানচিত্র ও কাগজপত্রের মাধ্যমে সাগরের কোন অঞ্চলে কোন মৌসুমে আবহাওয়া কেমন থাকে, কোন সময় সাগরে কেমন স্রোত থাকে, কখন সমুদ্র অশান্ত হয়, কখন প্রশান্ত থাকে; সাধারণত নাবিককুলকে সাগরে কোন ধরনের বিপদাপদের মোকাবিলা করতে হয়, সাগরে দীর্ঘস্থায়ী অভিযানের জন্য কী ধরনের জাহাজ উপযোগী; এসব তথ্যের পাশাপাশি অতীতের অনেক সফল কাপ্তানদের সাক্ষাৎকারও তার হস্তগত হয়। এসব তথ্য কলম্বাসের এ বিশ্বাসকে দৃঢ় আস্থার উপর দাঁড় করিয়ে দেয় যে, পশ্চিম থেকে জাহাজ চালিয়ে প্রাচ্যের স্বর্ণগোদাম ইন্ডিয়ায় পৌঁছা সম্ভব। কলম্বাস এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যায় যে, একমাত্র জলপথেই দূরপ্রাচ্যে পৌঁছা সম্ভব।

সম্ভবত কলম্বাসের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল মার্কোপোলোর ওই সিদ্ধান্তের উপর; যেখানে মার্কোপোলো কুবলাই খানের যুগে চীনের বিপরীতে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জকে

নির্ধারণ করেছিলেন। কলম্বাসের ধারণা ছিল, যদি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকে সাগরযাত্রা শুরু করা হয়, তাহলে একসময় প্রাচ্যে পৌঁছা সম্ভব। এ ছাড়া পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবী গোলাকারের পরিবর্তে ডিম্বাকৃতির ধারণা এবং সমুদ্রগুলো একটি অপরটির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার ধারণা কলম্বাসকে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকার প্রতি উৎসাহ যোগায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অভিযাত্রীদের দুর্বলতা অনুসারে কলম্বাসের জন্য এমন একজন ক্ষমতাবান পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন ছিল, যিনি তার আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে আইনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা যোগাবেন; যাতে সেখানে আইনানুগভাবে বসতি স্থাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ড যেন ওই ক্ষমতাবান শাসকের অধীনে পরিচালিত হয়। সেখানে তার কর্তৃত্ব মান্য করা হয়। পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে কলম্বাস প্রথমে ১৪৮১ সালে পর্তুগিজ বাদশাহ দ্বিতীয় জন-এর দরবারে তার সামুদ্রিক অভিযাত্রার খরচ বহন এবং পৃষ্ঠপোষকতার আবেদন করে। কিন্তু পর্তুগিজ ভৌগোলিক কাউন্সিল এ অভিযাত্রাকে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক সাব্যস্ত করে ফিরিয়ে দেয়। কলম্বাস তবুও দমবার পাত্র ছিল না। সে ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের রাজার কাছে এবং ১৪৮৪ সালে ফ্রান্সের বাদশাহর কাছে একই আবেদন জানায়। কিন্তু তারাও তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেন। সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে কলম্বাস ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে মুসলিম সুলতানের দরবারে এসে উপনীত হয় এবং কর্ডোভায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সে তখন কর্ডোভা, গ্রানাডা এবং সারাগোসার আমির এবং হাকিমদের তার অভিযানের ব্যাপারে সম্মত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু কোনো মুসলিম আমিরই তার কথায় কান দেয়নি। যার ফলাফল আজ পর্যন্ত উম্মাহ ভোগ করে চলছে।

স্পেনের শেষ মুসলিম শাসক কেবল যে স্পেন হাতছাড়া করার দায়ে দায়ী তা-ই নয়; বরং আমেরিকা আবিষ্কার এবং সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে উম্মাহকে বঞ্চিত রাখার অপরাধেও অপরাধী। তখন মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে যুদ্ধ সিদ্ধান্তকর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আর স্পেনের ভবিষ্যতের উপর এ বিষয়টি নির্ভরশীল ছিল যে, আমেরিকার শাসক হবেন কারা? তিন মহাদেশজুড়ে রাজ্য পরিচালনাকারী মুসলিম শক্তি? নাকি ইউরোপকে মুসলিমদের দখল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টারত খ্রিষ্টানরা? মুসলমানদের দুর্ভাগ্য—ভাগ্য লটারিতে নাম আসে খ্রিষ্টানদের।

৬ জানুয়ারি ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা তার সেনাবাহিনী নিয়ে বাবুল আদল দিয়ে আল হামরা রাজপ্রাসাদে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে আনন্দ উদযাপন শুরু করে দেয়। তখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস কিছুটা দূরে মলিন চেহারায় চিন্তিতভাবে বসা

ছিল। কলম্বাসের এ মানসিকতার পেছনে কারণ ছিল—মাত্র এর আগের দিন ইসাবেলা এবং ফর্দিনান্দের ভৌগোলিক কাউন্সিল কলম্বাসের পেশকৃত আবেদনকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল যে, এ আবেদন অপরিপক্ক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। এ অভিযানে লাভের চেয়ে লোকসানের খাত হবে অনেক বড়। কলম্বাস গ্রানাডা, আলমির, মালাগা এবং কর্ডোভার প্রত্যেক মুসলিম আমিরের দরবারে ধর্ণা দেওয়ার পর নিরাশ হয়ে খ্রিষ্টানদের পেছনেও চেষ্টা করেছিল। এবার শেষ সিদ্ধান্ত শোনার পর সে ভগ্নহৃদয়ে আবার পর্তুগালে ফিরে যাবার ইচ্ছা করে। সে গ্রানাডা থেকে বের হয়ে পর্তুগালের দিকে যাত্রা করবে; ঠিক সে-সময় ইহুদি বিত্তশালীরা এগিয়ে আসে। তারা সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। স্পেনের ধনী ইহুদিরা কলম্বাসকে তার অভিযানে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেয়। ইহুদিদের চোখে তখন নতুন স্বপ্ন। স্পেনে বিপদে পড়লে তারা নতুন দুনিয়ায় পাড়ি দিয়ে জীবনের আশ্বাস খুঁজবে।

১৪৯২-এর ৬ জানুয়ারি কলম্বাস যখন স্পেন বিজয়ের উৎসব উদযাপন না করে পর্তুগাল ফিরে যাচ্ছিল, তখন লুইস সেন্টাজল নামক ইসাবেলার জনৈক প্রভাবশালী ইহুদি আমলা তাৎক্ষণিকভাবে ইসাবেলার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সরাসরি কলম্বাসের সাথে বসে আন্তরিকভাবে তার কথা শোনার এবং এ ব্যাপারে আরেকটু চিন্তাভাবনা করার উপর রাজি করিয়ে নেয়। রাজদরবারে যখন কলম্বাসের অভিযান বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের কথা আলোচনায় আসে, তখন লুইস সেন্টাজল এ অভিযান ফলপ্রসু করার ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে বড় আকারের অর্থ প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য ইহুদি বিত্তবানদেরও এই সামুদ্রিক অভিযানে অর্থ বিনিয়োগের উপর রাজি করিয়ে নেয়। আর লুইসের নেতৃত্বে ইতঃপূর্বে ইহুদি কমিউনিটিতে এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সরকার যদি এ অভিযানে অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তারা যেকোনো মূল্যে কলম্বাসের এ অভিযান সফল করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

হায়, স্পেন থেকে পিছু হটা মুসলমানরা যদি আগেই এই অভিযানে অর্থ বিনিয়োগে রাজি হতেন। কিন্তু... এই কিন্তুর পর আরও অসংখ্য আফসোস থেকে যায়। জানি না কবে আমাদের অন্তরের এ হতাশাগুলো দূর হবে।

কোনো এক রহস্যজনক ও অদৃশ্য উৎসাহের ভিত্তিতে কলম্বাসের সহায়তাকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছিল। মনে হচ্ছিল এক অদৃশ্য শক্তি যেন সেইসব ইহুদি নেতৃবর্গকে লাইনে আনার চেষ্টা করছিল, ইসাবেলার দরবারে যাদের প্রভাব ছিল। তাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণ এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন যে,

অবশেষে ইহুদি বিত্তবানরা কেন কলম্বাসের প্রায়-অসম্ভব অভিযানে অর্থ বিনিয়োগে রাজি হয়ে গেল। অথচ এটা ছিল ইহুদিদের বাণিজ্যনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, ইহুদিরা যে প্রজেক্টে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে, সে প্রজেক্টে ভুলেও বিনিয়োগ করে না। তারা সে খাতেই বিনিয়োগ করে, যে খাতে লাভের সম্ভাবনা থাকে প্রায় নিশ্চিত। আসল কথা হলো—আন্দালুসিয়ার তৎকালীন ইহুদিদের কাছে কলম্বাসের পরিকল্পনা গ্রহণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না। আন্দালুসিয়ার ইহুদিরা ভাগ্যলিপির এ লেখাগুলো পড়তে কোনোই ভুল করেনি যে, গ্রানাডা পতনের সাথে সাথে তাদের ভাগ্যসূর্যও ডুবতে যাচ্ছে। মুসলিম সুলতানদের আনুকূল্যে তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্পদের পাহাড়, বিপুল মালপত্রসহ বিশাল অট্টালিকাগুলো খ্রিষ্টানরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—এ সন্দেহ ছিল নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে। অতএব, তাদের পক্ষে খ্রিষ্টানদের হাতে কষ্টের সম্পদ তুলে দেওয়া অপেক্ষা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও আপন স্বজাতির এক সদস্যের প্রয়াসে শরিক হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার মধ্যে অর্থ ব্যয় অযৌক্তিক ছিল না।

কলম্বাসও তার ইহুদি অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহের কথা ভুলেনি। আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলম্বাস প্রথম পত্রটা কিন্তু লুইস সেন্টাজলের বরাবরেই প্রেরণ করে। আর লুইস সেন্টাজলই ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলাকে আমেরিকা আবিষ্কারের সুসংবাদ শোনায়। মোটকথা, কলম্বাসের পেছনে পেছনে তারা কেবল আশ্রয়ের খোঁজই পায়নি; বরং ওই ভূখণ্ডকে তারা জেরুসালেম অর্জনের প্রথম ধাপ মনে করে। ইহুদি নেতাদের দৃষ্টিতে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় চলে যাওয়া ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্তি পেয়ে কেনান (ফিলিস্তিন) পৌঁছার মতোই ঘটনা। এ কারণেই দেখা যায় ইউরোপের ঔপনিবেশিক খ্রিষ্টানরা নতুন জনপদগুলোর নাম ইউরোপের বিভিন্ন শহরের নামে রাখলেও ইহুদিরা তাদের নতুন একটি জনপদের নাম রেখেছিল 'ক্যানেকটি কাট'; মানে নতুন কেনান। বর্তমান আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট মিস্টার ওয়াশিংটন শুধু একজন ফ্রি মিশনারিই ছিলেন না; বরং তাদের একজন আধ্যাত্মিক গুরুও ছিলেন। আমেরিকার সর্বকালের গোঁড়া প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান—যিনি এক ভয়ানক ব্যাধির শিকার হয়ে মারা গেছেন; আমেরিকাকে নতুন জেরুসালেম সাব্যস্ত করতেন। তিনি বলতেন—'আমেরিকার অস্তিত্ব কেবল জেরুসালেম দখল করার জন্য।'

আমেরিকার অস্তিত্ব, ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তাদের একটি অর্ধস্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সফল মঞ্চায়ন। যেহেতু আমেরিকা খ্রিষ্টান রাষ্ট্র নয়; বরং ইহুদি রাষ্ট্র, তাই আমেরিকার সবচে বড় সরকারি উৎসব ক্রিসমাস নয়; বরং Thanksgiving হচ্ছে সবচে বড় উৎসব। যা আসলে Jewish Festival

of vest of Succoth-এর অন্য নাম। যুক্তরাজ্যের সরকারি মুদ্রা এবং পতাকা The Great Seal of the United States বিখ্যাত ফ্রি মিশনের মুদ্রা এবং প্রতীক।

যেহেতু আমেরিকা কেবল একটি রাজনৈতিক অস্তিত্বের নাম নয়; বরং ইহুদিদের আধ্যাত্মিক সফরের একটা ভূখণ্ড, এ জন্যে এর পবিত্রতা সর্বত্র প্রতিষ্ঠার যথাযোগ্য প্রয়াস বিদ্যমান। 'হোয়াইট হাউস' ফ্রি মিশন এবং ইহুদিদের আধ্যাত্মিকতার একটা কেন্দ্রীয় জায়গার নাম। যা বহির্বিশ্বে হায়কলে সুলায়মানির একটা অস্তিত্ব। এটা সেই জায়গা, যাকে ইহুদিদের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে Casa Blanca (হোয়াইট হাউস) বলা হয়। আমেরিকার সেনা-সদর-দপ্তর এবং সুপ্রিম কমান্ডের হেডকোয়ার্টারকে বলা হয় Pentagon। এটা ফ্রি মিশনারিদের বিশ্বাসমতে হজরত সুলায়মান আ.-এর ঢালের নাম। Pentagon বা পাঁচ কোণা মূলত এরই প্রকাশ।

আফসোস! আরবলিগের সদস্য মুসলিম শাসকশ্রেণিকে যদি কেউ এ অনুক্লেখ দিকগুলো স্মরণ করিয়ে দিত, তাহলে কমপক্ষে বায়তুল মাকদিসের ব্যাপারটি আরবদের নিজস্ব ব্যাপার সাব্যস্ত করার পরিবর্তে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপার এ কথাটা বুঝতে তাদের জন্য সহায়ক হতো।

কাহিলার কাহিনি

নতুন জেরুসালেমের দিকে

আমেরিকায় ইহুদিদের ইতিহাসের শুরু ক্রিস্টোফার কলম্বাস থেকে। গ্রানাডা পতনের গন্ধ পাবার সাথে সাথে ইহুদিরা তাদের জাতিসত্তার উপর নতুন বিপদের গন্ধও পেয়ে যায়। তাদের ধারণা জন্মে যায়—মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতার ছায়া মাথা থেকে চলে যাবার পর স্পেনের মাটি তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে ওঠবে। খ্রিষ্টানরা তাদেরকে সেখান থেকে সমূলে উচ্ছেদ না করে ছাড়বে না।

প্রখ্যাত আমেরিকান শিল্পী ও লেখক হেনরি ফোর্ড তার *The International Jew* গ্রন্থে লেখেন—

> *'কলম্বাসের ইচ্ছের খোঁজ পেয়ে ইহুদিরা স্বপ্রণোদিত হয়েই তার সাথে সম্পর্ক গভীর করতে থাকে। কলম্বাসের সাথের অভিযাত্রীদের মধ্যে ইহুদিদের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। ইহুদি বিজ্ঞানী ও কবি ইয়াহুদা হালইয়াবি Judah Halevi অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে ইহুদি জাতিকে পার্থিব বিপদ থেকে বাঁচার স্বার্থে এবং ধর্ম রক্ষার খাতিরে ধর্মীয় বিধান গোপন করা এমনকি সত্য পরিবর্তনেরও অনুমতি প্রদান করে। এ অনুমতি প্রাপ্তির পর তাদের পক্ষে নিকৃষ্টতম শত্রুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনেও আর কোনো বাধা থাকেনি। এরা তখন যেকোনো ধর্মানুসারীদের চেয়েও অধিক ধর্মপালনকারী হয়ে তাদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকে নিত। সে হিসেবে খুব দ্রুত কলম্বাসের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে নেয়। তাদের কাছে তখন এ বিশাল বিশ্বে যদি কোনো নিরাপদ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে সেটা ছিল আটলান্টিকের ওপারে নতুন দুনিয়া তথা আমেরিকা। নিজেদের কর্মের ফলাফলের ভিত্তিতেই তারা বিশাল বিশ্ব থেকে লাথি খেতে খেতে আটলান্টিকের ওপারে চলে আসে।'*

ইতিহাসে এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান যে, গ্রানাডা পতনের পর কলম্বাস কর্তৃক মুসলমানদের সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা নিয়ে সমুদ্র অভিযানের যে চেষ্টা চালানো হয়েছিল, সে চেষ্টার সাথে ইহুদিদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। এ জন্যই দেখা যায় যে, এই সামুদ্রিক অভিযানের ব্যয়ের বড় অংশ ইহুদি বিত্তবানরাই বহন করেছিল। ইসাবেলা কর্তৃক তার অলংকার বিক্রি করে অভিযানে অর্থ সরবরাহের যে কাহিনি ইতিহাসে চাউর রয়েছে, তা বানানো গল্প বৈ কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের পর কলম্বাস সর্বপ্রথম যে পত্র লেখেছিল, তা একজন ইহুদি বিত্তশালীর নামে। যে ব্যক্তি তার সফরের পেছনে কয়েক হাজার পাউন্ড সরবরাহ করেছিল।

তৃতীয়ত লিউ টুইডোর্স নামক যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জাহাজ থেকে উপকূলে নেমেছিল, সে ছিল একজন ইহুদি। সেই লোকটিই সর্বপ্রথম তামাক আবিষ্কার করেছিল। আজ তামাককে বিশ্ববাণিজ্যিক পণ্যের 'বাপ' বলা হয়। এ কারণেই আজও বিশ্বের তামাকবাজার ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে।

ইহুদিরা সর্বপ্রথম ব্রাজিল এবং কিউবায় বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু তাদের চারিত্রিক অসাধুতার জন্যে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে তারা নিউ ইয়র্ক-মুখে যাত্রা শুরু করে। কেননা, নিউ ইয়র্ককে উত্তর আমেরিকার বাণিজ্যিক দরজা বলা হতো। নিউ ইয়র্ক ছিল তখন ডাচ কলোনির অন্তর্ভুক্ত। যদিও নিউ ইয়র্কের সাধারণ মানুষ ইহুদিদের আগমন ভালো চোখে দেখেনি; তথাপি ডাচ গভর্নর পিটার স্টাই ভিসেন্ট ইহুদিদেরকে কিছু শর্তসাপেক্ষে সেখানে বসবাসের অনুমতি দিয়ে দেয়। ইহুদিদের উপর আরোপিত শর্তের একটি ছিল—তারা কোনো সরকারি চাকরিতে অংশ নিতে পারবে না। কিন্তু তাদের ধারণায়ও ছিল না আজ তারা যাদেরকে সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের অনুমতি দিচ্ছে না, কাল তারা চক্রান্তের মাধ্যমে কেবল শহরের যাবতীয় বাণিজ্য নিজেদের হাতে কুক্ষিগতই করবে না; বরং পুরো শহরের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবে।

মোটকথা, এরা আমেরিকাকে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি এবং নিউ ইয়র্ককে নতুন জেরুসালেম আখ্যা দিয়ে বিশ্বের ইহুদি জাতিকে সেখানে এসে বসতি গড়ার জন্য উৎসাহ দিতে থাকে। এভাবেই নিউ ইয়র্ক পৃথিবীর বুকে ইহুদিদের বড় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। তারা এখানে আসার পর ভূমি ক্রয় শুরু করে। এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য নিজেদের হাতে নেওয়া শুরু করে দেয় এবং এ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য 'কাহিলা' নামক একটি সংগঠন গড়ে তুলে।

রঙিন আশার কিনারে

কাহিনির কাহিনি শুরু করার আগে একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ অধ্যয়ন করা জরুরি মনে করি। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের ব্যাপারটি নিজ নামে প্রচার করে। কিন্তু সে এই মহাদেশকে 'কলম্বাস' কিংবা 'ইউনাইটেড স্টেট অব কলম্বাস' হিসেবে পরিচিত করেনি। মুসলমানদের কৃতিত্ব নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার পরও এটা করতে সমর্থ হয়নি। কারণ, স্পেনের পতনের পর স্পেনের লোভী শাসকরা ভারত উপমহাদেশের সামুদ্রিক রুট আবিষ্কারের জন্য দুটি টিম গঠন করে। একটি ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে। ওই অভিযাত্রীরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার স্থলভাগের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে, তখন সাগরকে বাঁক খেতে দেখে। এটা দেখে তাদের আশা জাগে এই বাঁক-খাওয়া পথ তাদেরকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সুতরাং তারা এর নাম দেয় 'ক্যাপ অব গুড হোপ'। আরবিতে 'রাসুর রাজাইস সালেহ'। সরল বাংলায় বলা যেতে পারে 'রঙিন আশার প্রান্তে'।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রান্তই এদিকে স্থলভাগের শেষ প্রান্ত। এর দক্ষিণ দিকে ছিল শুধু পানি আর পানি। এখানে এসে আটলান্টিক এবং ভারত-সাগর একত্র হওয়ায় পানি থাকত সবসময় উর্মিমুখর। ইতঃপূর্বে স্পেনীয় নাবিকরা আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাষ্ট্র সেনেগাল, গিনি, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন ইত্যাদি দেশে আসলেও এর সামনে যেতে পারেনি। এবারই তারা প্রথমবার এ প্রান্তে আসে। সমুদ্রের অবস্থা শঙ্কাজনক দেখে মাল্লারা ভাস্কো দা গামাকে ফিরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এমনকি একপর্যায়ে তাকে হত্যার হুমকিও প্রদান করে। ভাস্কো দা গামা ছিল অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির। সে তাদের সামনে সমুদ্রপথের মানচিত্র ছিঁড়ে ফেলে বলে—'এবার ফিরে যাবার রাস্তা কেবল আমার মস্তিস্কেই বিদ্যমান। অতএব, আমাকে মারলে তোমাদেরও মরতে হবে। আমি ছাড়া তোমরা কেউ ফিরে যেতে পারবে না।' অথচ এটা ছিল ভাস্কো দা গামার অতিশয়োক্তি। কেননা, তার সাথে সফরে অংশ নেওয়া মুসলিম মাল্লারা আগে থেকেই এ পথের খোঁজ জানতেন।

মোটকথা, সে পৃথিবীর এই দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম করে মোজাম্বিক চ্যানেল পাড়ি দিয়ে মোজাম্বিকে গিয়ে পৌঁছায়। সেখান থেকে তারা পাথেয় সংগ্রহ করে। এরপর জাহাজ মেরামত করে তারা ভারত-সাগর পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্তানের কলিকট বন্দরে উপনীত হয়। এটাই ছিল হিন্দুস্তানে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রথম অনুপ্রবেশ। এরপর ওলন্দাজি, পর্তুগিজি, ফরাসি এবং সর্বশেষ ব্রিটিশরা এদেশে পা রাখে। এদের আগমনের ফলে সোনার উপমহাদেশের কী অবস্থা হয়েছিল সে বেদনাদায়ক ইতিহাস কমবেশ সবারই জানা।

আমেরিগো থেকে আমেরিকা

ইতঃপূর্বে আপনারা কলম্বাসের সামুদ্রিক অভিযাত্রার কথা শুনেছেন। কলম্বাসও কিন্তু ইন্ডিয়ার খুঁজে বের হয়েছিল। এ জন্যেই সে বাহামা এবং সান সালভাদর দ্বীপ দেখামাত্রই এগুলোকে পশ্চিম হিন্দুস্তানি দ্বীপ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বলে আখ্যা দেয়। তার বিশ্বাস ছিল এ দ্বীপগুলোর পরেই দেখা যাবে বিশাল ভারত উপমহাদেশ। তার এই ভুল থেকেই দ্বীপগুলোর নাম হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সে ঐতিহাসিক ভুল আজও কথিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমেরিকা নামটা পড়ল কোত্থেকে? এ দ্বীপগুলো থেকে ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়াকে আলাদা করার জন্য ওইগুলোকে বলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং এইগুলোকে বলা হয় ইস্ট ইন্ডিজ।

কলম্বাসের পাঁচ বছর পর আমেরিগো ওয়াসপিউশি নামক এক বিখ্যাত সমুদ্রজয়ী ১৪৯৭ সালে আটলান্টিক পাড়ি দিতে সমর্থ হয়। এই লোকটি একজন বড়মাপের লেখকও ছিল। সে দেশে ফিরে তার সমুদ্র অভিযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ, নয়া দুনিয়ার অবস্থানসহ সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখে প্রকাশ করে। তার এ প্রকাশনা ইউরোপে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। এরপর ১৫০৭ সালে বিখ্যাত জার্মান ভূগোলবিদ প্রফেসর মার্টিন অ্যালড সিমুলার তার বিখ্যাত গ্রন্থ *Cosmographia Introduction*-এ আমেরিগোকে 'আমেরিক্স' নামে পরিচিত করিয়ে এ ধারণা পেশ করেন যে, যেহেতু তিনিই নয়া দুনিয়া আবিষ্কার করেছেন, অতএব তার নামেই নয়া দুনিয়ার নামকরণ হওয়া উচিৎ। এরপর তিনি ইউরোপ এবং এশিয়ার নারীসুলভ নামের পরিবর্তে আমেরিক্সের পরিবর্তে আমেরিকা প্রস্তাব করেন।

প্রফেসর মার্টিনের এ প্রস্তাব মানুষের কাছে গৃহীত হয়। আর এভাবেই কলম্বাসের পরিবর্তে আমেরিকা নামেই নয়া দুনিয়া পরিচিতি পায়।

কলম্বাস মুসলিম মাল্লা ও কাপ্তানদের পরিশ্রমের ফসল ছিনতাই করে নয়া দুনিয়ার আবিষ্কারক হিসেবে নিজের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু নয়া দুনিয়াকে তার নামে নামকরণ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তার কয়েক বছর পরে আবিষ্কারকারী ইতালি কাপ্তান সেটা কেড়ে নেয়। আল্লাহ বুঝি এভাবেই অনাচারের বদলা নিয়ে থাকেন। যাক, এবার আমরা কাহিলার কাহিনির দিকে ফিরছি।

পৃথিবীর ১২ অংশ

কাহিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে গভর্নমেন্ট। এটা ইহুদিদের আন্ডারগ্রাউন্ড একটি সংগঠন। এটা যতটুকু গোপন ততটুকু শক্তিশালী। নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক

জীবনে এর প্রভাব এত বেশি যে, আপনি বলতে পারেন নিউ ইয়র্কের বাসিন্দারা নিজেদের অজান্তে এ সংগঠনের প্রোগ্রাম অনুসারে জীবন যাপন করে।

সংগঠনটির প্রোগ্রাম কী? সংক্ষেপে ইহুদি, ইহুদিবাদ এবং ইহুদি স্বার্থ। এটি কেবল একটা গোপন সংগঠনই নয়; বলতে গেলে একটি গোপন সরকার। এমন গোপন সরকার, যার প্রতিটি উচ্চারণ অলঙ্ঘনীয় আইন। যার প্রতিটি কাজ ইহুদি স্বার্থরক্ষা, ইহুদিদের পৃষ্ঠপোষকতা, ইহুদি তোষণ, ইহুদি লালন। এই সংগঠন আমেরিকার সবচে বড় রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বসে আমেরিকার মানসিকতা এবং পলিসি নির্ধারণের কাজ করে থাকে। এ কাজটা তারা এমন আঙ্গিকে করে থাকে, যা জানলে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। তারা আমেরিকার সমাজনীতি, আমেরিকানদের চিন্তাচেতনা আমেরিকার রাজনীতি এমনভাবে কুক্ষিগত করে নিয়েছে যে, আজ আমেরিকাবাসীকে বাহ্যত খ্রিষ্টান দেখালেও মূলত এরা ইহুদি এবং ইহুদিদের স্বার্থরক্ষায়ই নিবেদিত।

আমেরিকান সমাজে তাদের নিজস্বতা বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। ইহুদিদের বড়রা নিউ ইয়র্ককে ছোট ছোট ১২ অংশে ভাগ করে নিয়েছে। প্রতি অংশের মালিক একজন প্রভাবশালী ইহুদি। আমেরিকার উপর প্রভাব বিস্তার সেরে নেওয়ার পর তারা পুরো বিশ্বকে ১২জন প্রভাবশালী ইহুদির নেতৃত্বে ১২ ভাগে ভাগ করে নেয়। তারা নিউ ইয়র্ককে পুরো বিশ্বের কেন্দ্র বিবেচনা করে একে ইহুদিদের রাজধানী আখ্যা দিয়ে রেখেছে। আজকের অনেক আমেরিকানও এ তথ্যটা জানে না। তারা জানে তাদের রাজধানী হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিস্ট্রিক অব কলম্বিয়া (ওয়াশিংটন ডিসি)। অথচ তাদেরই দেশে এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করে, যারা তাদের রাজধানী হিসেবে নিউ ইয়র্ককে গন্য করে থাকে। আর বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা এই জাতির সদস্যরা নিউ ইয়র্ককে[৫৪] এমনভাবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়, যেভাবে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা ভ্যাটিকেন সিটিকে এবং মুসলমানরা মক্কাকে দিয়ে থাকে। 'দেশের ভেতরে দেশ'; এটা একটা রাজনৈতিক পরিভাষা হলেও এর বাস্তবতা দেখতে হলে আপনাকে নিউ ইয়র্কের প্রতি তাকিয়ে দেখতে হবে।

'কাহিলা' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে গভর্নমেন্ট। ইহুদিরা গোপন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে শব্দটির অর্থ বাস্তবে রূপায়িত করে ছেড়েছে। ইহুদিদের এই গোপন সংগঠন ভূগর্ভস্থ নদী তথা Underground River -এর মতো আর ইহুদিবাদের উপর গবেষণাকারী অভিজ্ঞজন একে ইহুদিদের সর্বোচ্চ সংগঠন Zinjry-এর শক্তিশালী অংশ মনে করে থাকেন। Zinjry শব্দটি মূলত আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদ Zionist

[৫৪] যা ফিলিস্তিনে অবস্থিত মূল জেরুসালেম পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে ঘোষিত নতুন জেরুসালেম।

International Jewry-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা ইহুদিবাদী বড় বড় মস্তিষ্কের আড্ডাখানা। বিশ্বের সর্বত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ইহুদি সংগঠন এরই অধীনে পরিচালিত হয়।

ইহুদি নারীদের স্বামী

এখানে প্রশ্ন হতে পারে; লাঞ্ছনার চূড়ান্ত আঘাত খাওয়া এই অসহায় জাতি কীভাবে এত প্রভাবশালী হয়ে উঠল যে, তারা আজ সুপার পাওয়ারের নাকে দড়ি লাগিয়ে কখনো সামনে বাড়াচ্ছে, কখনো পেছনে টেনে ধরছে? এর জবাবের জন্য আমাদেরকে কুরআনুল কারিমের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারণ, এ কিতাবই আমাদের এবং ভূমণ্ডলের স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের প্রথম সেতুবন্ধন। এটাই জগতের জটিল বাস্তবতার গিঁট্টু খুলতে সক্ষম। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ইহুদিদের লাঞ্ছনার যে কারণ বর্ণনা করেছেন, মনে হচ্ছে কালের আঘাত খেয়ে তারা এর কিছুটা তদারক করতে শুরু করেছে। কিন্তু আফসোস মুসলমানদের উপর, তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী এই জঘন্য বৃত্তি থেকে আলাদা থাকার পরও এখন পরিপূর্ণভাবে তা গ্রহণ করে নিচ্ছে। তাই জগতের বুকে ফলাফলও উল্টো প্রকাশ পেতে শুরু করছে। যেমন ইহুদিদের একটি জঘন্য গুণ ছিল তাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব। কিন্তু এখন ইহুদিদের অবস্থা হচ্ছে—ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যত বিবাদ আর রেষারেষি থাক না কেন; জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তারা এক দেহ ভিন্ন আত্মাতুল্য। যদিও সময় সময় তাদের ব্যক্তিগত এবং সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়; কিন্তু অইহুদিদের মোকাবিলায় তারা সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ। এ ছাড়া তাদের উচ্চতর সংগঠন এবং সংগঠন পরিচালকদের নিয়ম হচ্ছে; ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান তারাই ঘটাবে; কোনো অবস্থায় তাদের পরস্পরকে একে অনের মোকাবিলায় আসতে দেবে না। আক্ষেপ, মুসলিম জাতির মধ্যেও যদি এমন কোনো সংগঠন থাকত।

কুরআনে কারিম ইহুদি জাতির বেলায় বলেছে—'তোমরা ওদেরকে পরস্পর এক দেখতে পাবে; কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে অনৈক্য বিদ্যমান।' এ আয়াতের মর্মার্থ আজ ইহুদি জাতি অপেক্ষা আমাদের উপরই বেশি বর্তায়। যদি কোনো ব্যাপার এতই জটিল হয় যে, তার সমাধানের জন্য উল্লিখিত সংগঠনগুলোর ভূমিকা যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে তারা উভয় দল একবাক্যে কোনো একজন পণ্ডিততুল্য ইহুদি সত্তাকে সালিস মেনে নেয়। যেমন মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের

ইহুদি স্ত্রীর প্রসঙ্গে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন ইহুদিদের দুটি সংগঠন একবাক্যে সাদাতকে এর সালিস সাব্যস্ত করে।[৫৫]

তুর উপত্যকায় আর্তনাদ

কুরআন মজিদে তাদের অধঃপতন এবং লাঞ্ছনার আরেক কারণস্বরূপ কৃপণতার কথাও বলা হয়েছে। আজকের ইহুদি-সম্প্রদায় জাতীয় স্বার্থে ব্যয় করতে পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমূহ থেকে অনেক অনেক এগিয়ে। এ ব্যাপারে ইহুদি সংগঠনগুলোর পুঁজিস্বল্পতা কোনো অজুহাত হয়ে দাঁড়ায় না। বর্তমান বিশ্বে এ ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে থাকলে তারা হচ্ছে মুসলিম জাতি। আজ মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা।

ইহুদিরা অধঃপতনের ক্ষেত্রে উদাহরণীয় হবার অন্যতম বড় কারণ ছিল, তাদের ভীরু ও কাপুরুষে স্বভাব। আজও তারা ভীরুতা এড়াতে পারেনি ঠিক, তবে তাদের মানসিক দৃঢ়তা দেখুন, কুদরতি শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর আরোপিত জাতির হাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিগৃহীত হবার পর পুনরায় তারা নিজেদের পথে চলা শুরু করেছে। অপমানের দীর্ঘকাল অতিক্রমের পরও তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়নি। তারা তাদের উদ্দেশ্য এমন সুনির্দষ্ট এবং মস্তিষ্ক এতটা পরিচ্ছন্ন রেখেছে যে, প্রতি বিপর্যয়ের পর যেন ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠছে। হে আমার জাতি! তোমার দ্বারা কি এমনটা সম্ভব ছিল না? আমরা কি ইহুদিদের দেখেও শিক্ষা নিতে পারি না?

আরেকটা কারণ ছিল, তারা ছিল আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলদের ব্যাপারে ধৃষ্ট সাংঘাতিকরকম বেআদব। তারপরও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়ভাজন মনে করতো। কুরআনে কারিমে তাদের উপর লাগানো লাঞ্ছনার মোহর থেকে বের হবার একটা রাস্তা বলে দেওয়া ছিল, সেটি হচ্ছে—'যে-কোনোভাবে আল্লাহর সাথে একধরনের সম্পর্ক রাখা।'[৫৬] লজ্জা আর অনুতপ্ততার চেয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যম কী হতে পারে। আজ বোরাক প্রাচীর এবং সিনাইয়ের তুর উপত্যকায় ইহুদিদের ধর্মীয় সম্মেলনে যেভাবে তারা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি

[৫৫] ইহুদি স্ত্রীধারী মুসলিম এবং অমুসলিম নেতৃবর্গ যেমন ইয়াসির আরাফাত, শাহ হুসাইন, রাজিব গান্ধি প্রভৃতির স্ত্রীদের কার্যকলাপ আলাদা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের দাবি রাখে। আমাদের গবেষক-শ্রেণি যদি এদিকে মনোযোগ দিতেন, তাহলে বিস্ময়কর কিছু তথ্য বেরিয়ে আসত।

[৫৬] উক্ত আয়াতের মর্মার্থে খেয়াল করলে মস্তিষ্ক কেবল ওই দিকেই ধাবিত হয়। জিজিয়া গ্রহণের দিকে মস্তিষ্ক এ জন্যে যেতে চায় না যে, ওটা তো আরও নিকৃষ্টতর লাঞ্ছনা। এ ব্যাপারে আহলে ইলম যদি পথপ্রদর্শন করেন, তাহলে তাদের খেদমতে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

করে, এটা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। বিপরীতে শবে কদরে মুসলমানদের উদাসীনতা এবং পার্থিব ব্যাপারে প্রচণ্ডরকম জড়িত থাকা দেখলে বুক ফেটে কান্না আসতে চায়।

চিরন্তন টানাপোড়েন

খুব সম্ভব পাঠকমনে প্রশ্ন আসতে পারে—ইহুদিদের নিয়ে এত পর্যালোচনা কেন? এ প্রশ্নের জবাবও আমরা কুরআনে পেয়ে থাকি। কুরআন বলেছে—'দুটি সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের চিরন্তন শত্রুতা বিদ্যমান থাকবে।'[৫৭] সম্প্রদায় দুটির একটি হচ্ছে ইহুদি, অপরটি হচ্ছে পৌত্তলিক। এদের সাথে মুসলমানদের বিশাল যুদ্ধের ব্যাপারটি তাকদিরের অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার। যাকে আপনারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ইচ্ছা করলে যেকোনো নাম দিতে পারেন। এ দুটি সম্প্রদায়ের সাথে লড়াইকারীদের ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদিসে বিশাল সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে। তাই মুসলমানদের জন্য কখনো এদের মানসিক পরিবর্তন, সময় সময় গৃহীত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন থাকার উপায় নেই। সর্বক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আফসোস, ইহুদিরা কালের আঘাত খেয়েও নিজেদেরকে সামলে নিয়ে আজ তারা বিশ্বে স্বীকৃত শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারছে; অথচ মুসলমানদের অবস্থা 'না বলাই শ্রেয়' পর্যায়ের।

ইহুদিরা তো মিথ্যেবাদী দাজ্জালের আবির্ভাবের সমূহ শর্ত বাস্তবায়ন করে এখন কেবল তার আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়। অথচ মুসলিম উম্মাহকে সত্য মাসিহের[৫৮] সঙ্গী হবার জন্য নিজেদের কার্যকলাপে পরিবর্তন আনতে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে নির্লিপ্ত দেখা যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের ন্যায় মুসলমানদের মাধ্যমে এ বিশাল খেদমত নেবেন না। হয়তো আমাদের পরিবর্তে নতুন একদল মুসলমান তৈরি করে তাঁদের মাধ্যমে ওই কাজটা আদায় করবেন। আমরা অপদার্থ হিসেবেই থেকে যাব।

> 'যদি তোমরা কৃত অঙ্গীকার থেকে ফিরে যাও, তাহলে তোমাদের পরিবর্তে আরেক জাতি নিয়ে আসব, যারা তোমাদের মতো হবে না।'[৫৯]

---

[৫৭] সূরা মায়েদা : ৮২।

[৫৮] যাঁর হাতে সকল খ্রিষ্টান মুসলমান হয়ে যাবে; বরং সেই ইহুদিরাও যারা দাজ্জালের বাহিনী থেকে বেরিয়ে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।

[৫৯] সূরা মুহাম্মাদ : ৩৮।

গ্রানাডা পতনের পরে

খ্রিষ্টান ইতিহাসের কালো অধ্যায়

গ্রানাডা পতনোত্তরকালে খ্রিষ্টান বিজেতারা যে ধরনের ওয়াদা লঙ্ঘন এবং অনাচার শুরু করেছিল, তা খ্রিষ্টান ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোনোভাবেই এ গভীর কালো দাগ মুছে ফেলতে পারবে না। কোথায় মুসলমানদের উন্নত মানবতা এবং অন্তরের বিশালতা, আর কোথায় খ্রিষ্টানদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ও সংকীর্ণচিত্ততা! তারা খ্রিষ্টবাদের কোনো মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি দেয়নি এবং মরিয়মের মর্যাদারও কোনো মূল্য রাখেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যাচারের এমন দুটি ঘটনা রয়েছে, যার থেকে নিকৃষ্টতম ঘটনা মানবেতিহাসে পাওয়া যায় না। ঘটনা দুটির সম্পর্ক স্পেনের গোঁড়া খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমটি পরিপূর্ণভাবে এবং দ্বিতীয়টি একটি সীমারেখার মধ্যে। অর্থাৎ, গ্রানাডা পতনের পর মুসলমানদের এবং আমেরিকা আবিষ্কারের পর রেড ইন্ডিয়ানদের উপর জাতি-নির্মূল অভিযান পরিচালনা। ওই অভিযান দুটির প্রতিপক্ষকে পাইকারিহারে হত্যা করা হয়। তাদের নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হয়নি। তাদেরকে তাদের পৈতৃক ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তাদের ভাষা, সভ্যতা, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত করার প্রয়াস চালানো হয়। সবচে বড় জুলুম হচ্ছে, মুসলমানদের মসজিদগুলোকে গির্জাতে পরিণত করা হয়। তাদেরকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানো হয়।

খ্রিষ্টানরা তাদের প্রথম উদ্দেশ্যে সফল হয়ে গেছে। তাই আজ স্পেনের শহরগুলোতে যে কেন্দ্রীয় গির্জাসমূহ রয়েছে, তা একদিন মুসলমানদের জৌলুশপূর্ণ জামে মসজিদ ছিল। এ ছাড়া শহরের বাইরে পাহাড়ি এবং উপত্যকা অঞ্চলে কিবলামুখি যেসব প্রাসাদ দেখা যায়[৬০] যেগুলোর প্রতি লক্ষ করলে এবং কাছে গিয়ে কান পাতলে প্রাসাদগুলোর প্রতিটি ইট থেকে আওয়াজ আসবে—'আমরা পাঁচ শতাব্দী ধরে আহত অন্তরে মুসলমানদের সেজদার বোঝা বহন করে চলছি। এখনো আমরা বীর মুসলিমদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছি।' গ্রানাডার যে গির্জায় ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলার কবর অবস্থিত, তাও এককালে মুসলমানদের জামে মসজিদ ছিল।

[৬০] স্পেনের অধিকাংশ শহরের কিবলা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব দিক।

কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে তারা পরিপূর্ণরূপেই ব্যর্থ থেকে গেছে। তাদের অন্তহীন জুলুম ও বর্বরতা; এমনকি জীবন্ত দাহ করার পরও মুসলমানরা ইসলাম ছাড়তে রাজি না হয়ে দেশ ছাড়তে রাজি হয়েছে। কিছুসংখ্যক মুসলমান; যাদেরকে মরিস্কো নামে স্মরণ করা হয়, তাদের ব্যাপার ভিন্ন। এদের অধিকাংশই ছিল নওমুসলিম। এরা ছিল স্পেনের বাসিন্দা। কিন্তু বাস্তবে তারাও ইমান ত্যাগ করেনি। যদিও তাদেরকে প্রচণ্ড অত্যাচার-অনাচারের শিকার হতে হয়েছে।

এটাই ইসলামের সৌন্দর্য। ইসলাম যখন অন্তরে স্থান করে নেয়, তখন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ হয়ে যায়। যে রবের কালেমা পড়া হয়েছে, তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকারে গাদ্দারির কল্পনাও করা যায় না। আজকের এই অধঃপতিত যুগেও সময়ে সময়ে ইসলামের এই মুজিজা প্রত্যক্ষ করা যায়। এ জন্যেই বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টান মিশনারিদের ব্যয় এবং মুসলমানদের অমুসলিম বানানোর মধ্যে যদি তুলনা করা হয়, তাহলে যে বাস্তবতা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, মুসলমানরা যদিও এদের ফাঁদে পড়ে গুনাহে লিপ্ত হয়, তথাপি তাদেরকে খ্রিষ্টান বানানো যায় না। মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানানোর হার একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। তাই বর্তমানকালের মিশনারিরা ধর্মান্তরকরণের পরিবর্তে এদেরকে মুসলিমরূপী খ্রিষ্টান বানানোর লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে বেশি।

নয়া দুনিয়া

স্পেনে বসবাসরত একটি জাতি ছিল যারা মুসলমানদের মতো সাদা অন্তরের এবং স্পষ্টভাষী হবার পরিবর্তে চরিত্রে ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং কথাবার্তায় ছিল অবিশ্বাস্য। এদের পক্ষে ধর্মত্যাগ কোনো ব্যাপারই ছিল না। এদের নাম ছিল ইহুদি। এদের কাছে মিথ্যা এবং ধোঁকা কোনো প্রকার দোষ হিসেবে গণ্য ছিল না; বরং এগুলোকে তারা বিশেষ যোগ্যতা মনে করতো। এমনকি তারা নিজেদের বাচ্চাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের সময়ও এগুলোর শিক্ষাদানে লজ্জা অনুভব করতো না। মিথ্যার মাধ্যমে নিজেদের সন্তানদের অন্তরে প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফেরার আকাঙ্ক্ষা সর্বক্ষণ তাজা রাখার চেষ্টা করতো। বাচ্চাদেরকে বলা হতো—'আমি যদি জেরুসালেমকে ভুলে যাই, তাহলে আমার বাম হাত ধোঁকা দেওয়া ভুলে যাবে।' অর্থাৎ, মাকদিস শহর ফিরে পাবার প্রচেষ্টায় ধোঁকা প্রদান যেন কোনো অপরাধ বা ঘৃণ্য বৃত্তি নয়। স্পেন বিজয়ী খ্রিষ্টানরা মুসলমান অপেক্ষা ইহুদিদের উপর ছিল বেশি ক্ষিপ্ত। তাই গ্রানাডা বিপর্যয়ের সাথে সাথে মুসলমান অপেক্ষা ইহুদিরাই বেশি অস্তিত্ব-সংকটে পড়ে যায়।

ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলা গ্রানাডা পতনের সময় কৃত অঙ্গীকারের মাত্র তিন মাস পরই ইহুদিদেরকে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ অথবা স্পেন ছাড়ার নির্দেশ দেয়। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে যদি চক্রান্তপ্রিয় এই জাতিকে নির্মূল করা সম্ভব হয়, তাহলে জাতি একতাবদ্ধ থাকবে; নতুবা এদের চক্রান্তপ্রিয় স্বভাব নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে। তখন যেসব ইহুদি উসমানি সাম্রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা তো নিজেদের ধনসম্পদ নিয়ে যেতে পেরেছিল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পেরেছিল। কেননা, মুসলমানগণ শুরু থেকেই বন্দি এবং জিম্মিদের[৬১] সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করতেন। বাস্তবতা এটাই যে, এ ক্ষেত্রে কোনো জাতিই ইসলামের সমকক্ষতার দাবি করতে পারবে না। ইহুদিদের আরেকটি দল ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছেছিল। ইহুদিদের তৃতীয় দলটি আটলান্টিকের ওপারে আবিষ্কৃত নতুন দুনিয়া খ্যাত আমেরিকায় চলে গিয়েছিল। গ্রানাডার পতন ঘটেছিল ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি। কলম্বাসের সমুদ্র অভিযান শুরু হয়েছিল ১৪৯২ সালের এপ্রিল মাসে এবং আরব মাল্লাদের দেখানো পথ অনুসরণ করে কলম্বাস নয়া দুনিয়া পৌঁছেছিল ১২ অক্টোবর ১৪৯২ সালে।

সামেরীয় জাদু

ব্রিষ্টান স্পেনে ইহুদিদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে আসলে আমেরিকা আবিষ্কারের সাথে সাথে তারা তাদের বিপুল পুঁজি এবং সুদের লভ্যাংশ সাথে নিয়ে দলে দলে নতুন মহাদেশে পৌঁছে যায়। তাদের ধারণা ছিল—সম্ভবত দাজ্জাল সেখানকার কোনো দ্বীপে বন্দি অবস্থায় থাকবে। তার সহায়তায় তারা তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। যারা সেখানে যেতে পারেনি তারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়। এরা ৩০০ বছর পর্যন্ত স্পেনে ইহুদি হয়েই বসবাস করে। এরপর যখন স্পেনের শাসকদের মাথা থেকে খ্রিষ্টাবাদের ভূত নেমে যায়, অমনি তারা সামেরির গোবৎসের ন্যায় তাদের উপর থেকে খ্রিষ্টবাদের চাদর সরিয়ে স্বরূপে আবির্ভূত হয়। তারা যখন দলে দলে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করছিল তখনকার একটা বিখ্যাত ঘটনা থেকে তাদের প্রতারণাপূর্ণ মানসিকতার কিছুটা অনুমান পাওয়া যায়।

গ্রানাডার একটি গির্জায় যখন তাদেরকে ব্যাপ্টিস্টকরণের জন্য সমবেত করা হয় তখন ছিল সন্ধ্যালগ্ন। খ্রিষ্টান পাদরি যারা ব্যাপ্টিস্টকরণের আনন্দে ছিল অত্যন্ত মাতোয়ারা, তাদের উপস্থিত হতে কিছুটা দেরি হয়ে যায়। এতে সেখানে উপস্থিত ইহুদিরা বিরক্ত হয়ে পাদরিদের গালমন্দ শুরু করে। এরপর যখন তাদের এই

[৬১] দারুল ইসলামে বসবাসরত অমুসলিম সম্প্রদায়।

বিরক্তির কারণ খুঁজে দেখা হয় তখন জানা যায়; ইহুদি ধর্মমতে তাদের সন্ধ্যার প্রার্থনার শেষ হয়ে যাচ্ছিল; বিধায় তাদের বিরক্তির অন্ত ছিল না। তারা বাহ্যত খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে দ্রুত বাসায় পৌঁছে তাদের ধর্মীয় ইবাদত আদায় করতে চাইছিল।

অনুগ্রাহী ধ্বংস করা জাতি

উসমানি সাম্রাজ্য এবং আমেরিকায় পৌঁছা ইহুদিরা তাদের অনুগ্রহকারীদের সাথে যে আচরণ করেছে তা তাদের স্বভাবের চিরন্তন অনুসঙ্গ। উসমানি সুলতানরা তাদেরকে তখন আশ্রয় দিয়েছিলেন, যখন তারা স্পেনে খ্রিষ্টান কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়ে সর্বহারারূপে প্রবেশ করেছিল। বিশাল পৃথিবীতে কোথাও তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই মূলত খেলাফতে উসমানিয়ার পতন ঘটিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তাদের একটি প্রতিনিধিদল সুলতান আবদুল মজিদ খানের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের একখণ্ড ভূমি প্রদানের আবেদন জানায়। এর বিনিময়ে সাম্রাজ্যের সমুদয় ঋণ[৬২] আদায় করে দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করে। সুলতান দেনার দায়ে দায়গ্রস্ত হলেও তাঁর শিরায় বইছিল বাপ-দাদার ইমানি রক্ত। ইহুদিরা খুব পীড়াপীড়ি শুরু করলে সুলতান তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল দ্বারা কিছুটা মাটি খুড়ে ইহুদি প্রতিনিধিদলকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> 'ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড আমার ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার নয়। এ জায়গাটা আমার পিতৃপুরুষ জিহাদ করে শত্রুপক্ষের নিকট থেকে অর্জন করেছেন। তোমরা যদি তোমাদের বিপুল বিত্তের সবটুকু দিয়ে ফিলিস্তিনের এই পরিমাণ মাটি আমার কাছে পেতে চাও, তাহলেও তা পাবে না।'

ইহুদিরা হতাশাজনক এ উত্তর শুনে যৌথবাহিনীর সাথে চক্রান্ত শুরু করে দেয় এবং লড়াইয়ে ব্রিটেনকে অর্থসাহায্য দিয়ে যুদ্ধপরবর্তীকালে ফিলিস্তিনকে নিজেদের নামে লিখিয়ে নেয়। ইহুদিদের সাথে ব্রিটেনের কৃত এ অঙ্গীকারকে 'বালফোর ঘোষণা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তী ইতিহাস তো সবার জানা।

কুররাহ সুহ আফিন্দি নামক যে তুর্কি ইহুদি বৃটিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে খেলাফত পতনের পরোয়ানা নিয়ে সুলতান সমীপে উপস্থিত হয়েছিল, সে ছিল সেই ইহুদি; যে সুলতানকে অর্থের লোভ দেখিয়ে ফিলিস্তিন নামক ভূখণ্ডটা নিতে চাইছিল। সে-ই তুর্কি থেকে ইসলামি খেলাফত ও ইসলামের নাম-নিশানা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টাকারী

[৬২] সালতানাতে উসমানিয়া তখন যুদ্ধব্যয়সহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের খরচের কারণে বিপুল পরিমাণ দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

মোস্তফা কামাল পাশাকে তুর্কিদের জাতির পিতা ঘোষণা দিয়েছিল। সে ছিল ইহুদিদের গোপন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত।

ইহুদিদের এবংবিধ আচরণে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্ময় জাগে মুসলিম জাতির উপর—তারা কীভাবে এত তাড়াতাড়ি ইংরেজদের অত্যাচারের কথা ভুলে গেল!

জিহাদ এবং প্রচেষ্টা

বর্তমান কাশ্মির এবং ফিলিস্তিনের বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের দুটি গভীর ক্ষতসদৃশ্য। এ ক্ষত দুটির জন্মদাতা ব্রিটিশ। স্পেন থেকে মুসলিম জাতির উচ্ছেদের পর আজ সেখানে আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো কোনো মুসলমানের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ইংরেজরা যেখান থেকে চলে গেছে, আজও সেখানে তার উত্তরাধিকাররা রাজত্ব চালাচ্ছে। এ তফাৎটা এ জন্যে যে, স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন হয়েছে তলোয়ারের মাধ্যমে। কিন্তু ইংরেজরা কোথাও অস্ত্রের মাধ্যমে নয়; বরং তারা বিদায় নিয়েছে অধিবাসীদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা তলোয়ার ব্যতীত এমন কোনো জিনিস তৈরি করেননি, যা পরিপূর্ণভাবে পরিস্কার করতে সক্ষম। তাই আমরা দেখতে পাই, স্পেন থেকে মুসলিম জাতির উচ্ছেদের সাথে সাথে সেখান থেকে ইসলামও উচ্ছেদ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইংরেজদের অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে ইংরেজরা বহিস্কৃত হলেও তাদের মতবাদ বিলুপ্ত হয়নি। দিন দিন তা কেবল বেড়েই চলছে।

আফসোস, আজ স্পেনের একটি বাচ্চাও যদি কোনো মুর মুসলিমের নাম শুনে, তাহলে মুক্কাদ্দাস মরিয়ামের নাম নিয়ে সাথে সাথে বুকে ক্রস ধারণ করে। অথচ আমাদের জাতির একটি অন্তরেও ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না; বরং আমাদের কালো ইংরেজ সাহেবরা আজও ওই সাদা চামড়াওয়ালাদের নিজেদের আইডল সাব্যস্ত করতে গৌরববোধ করে। এই যে তফাৎ, এটা যেচে গ্রহণ এবং ছিনিয়ে অর্জন করার ফল। ইংরেজদেরকে জিহাদের মাধ্যমে দেশছাড়া করা হলে আজ দেশে ইংরেজ-সভ্যতার নাম-গন্ধও থাকত না। কাউকে যদি জিহাদের বাস্তবতা ও উপকারিতা বোঝাতে হয়, তাহলে এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে করি।

কথা হচ্ছিল উসমানি সাম্রাজ্যে আগত ইহুদিদের নিয়ে। যে ইহুদিরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নতুন মহাদেশে গিয়ে পৌঁছেছিল, তাদের আচরণও এদের থেকে তেমন ভিন্ন ছিল না।

আসুন! তাদের আচরণটাও একটু দেখে নিই এবং অনুধাবন করি সেখানে কেন তাদের এত গভীর প্রভাব?

গ্রানাডা পতন থেকে বাগদাদ পতন পর্যন্ত

ঘটনা দুটি বাহ্যত আলাদা; কিন্তু এর মধ্যে বিস্ময়কর সাযুজ্য বিদ্যমান। যদিও ঘটনা দুটির মাঝখানে প্রায় পাঁচ শতাব্দীর দূরত্ব; কিন্তু কারণ এবং প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বাধ্য করছে ঘটনা দুটোকে একই বিষবৃক্ষের কাঁটাদার ফল সাব্যস্ত করতে। গ্রানাডা পতন হয়েছিল সম্রাট ফার্দিনান্দ এবং সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার হাতে। আর বাগদাদের পতন হয়েছে জর্জ বুশ এবং তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইসদের মতো মন্ত্রীদের হাতে। ঘটনা দুটি দুই মহাদেশে সংঘটিত ও বিশাল কালপর্বের ব্যবধানে সংঘটিত ঘটনা। কিন্তু লক্ষ করলে দেখবেন, উভয় জায়গায় হত্যাকারী কিন্তু এক; নিহতরাও এক। এমনকি হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র যেমন এক, তেমনি হত্যার প্রেক্ষাপটও এক। এই সাযুজ্যের রহস্য এখানেই যে, আমেরিকা মূলত সেই আন্দালুসিয়া বিজয়ী খ্রিষ্টানদের উত্তরসূরি; যারা ৩০ লাখ আন্দালুসীয় মুসলমানকে হত্যা করেছিল। আমেরিকা সেই রক্তপিপাসু ভূতের উত্তরাধিকার, যাদের দেহ গঠনের উপাদানে উগ্র খ্রিষ্টবাদ, ইসলামের শত্রুতা, মুসলিম হত্যা, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উপর জবরদস্তিমূলক অধিকার প্রতিষ্ঠার লোভ ও অনিঃশেষ লালসা বিদ্যমান। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদেরকে আজ থেকে ৫০০ বছর পেছনে চলে যেতে হবে।

১৪৯২ সাল বিশ্ব ইতিহাসের এমন একটি বছর, যে বছর বিশ্ব ইতিহাসের দুটি বড় ঘটনা প্রকাশ পায়। ঘটনা দুটির সম্পর্ক একটি জাতির উত্থান এবং আরেকটি জাতির পতনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর প্রেক্ষিতেই খ্রিষ্টানদের সাম্প্রদায়িকতা এবং জায়নবাদিদের শত্রুতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আজ-অবধি পতনশীল মুসলিম উম্মাহকে তাড়িয়ে ফিরছে। পাঁচ পাঁচটি শতাব্দী কেটে গেলেও যেন তাদের হিংসার আগুন নিভছে না।

এ বছরই স্পেন থেকে মুসলমানদের ৮০০ বছরের কর্তত্বের সমাপ্তি ঘটেছে। আর এ বছরই আমেরিকা নামক চাঁদ তাদের ভাগ্য-ললাটে উদিত হয়েছে। ঘটনা দুটির সম্পর্ক কিন্তু একই নারীর সাথে সম্পৃক্ত। ১৪৯২ সাল আসতেই ইসাবেলার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। স্পেনে তার দীর্ঘদিনের প্রয়াস সফলতার মুখ দেখে। এরপর একই বছরের শেষদিকে তার সমুদ্র-অভিযাত্রী দল উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করে। পরে এ পথ ধরে পুরো একটি মহাদেশ সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার হাতে তুলে দেয়। ঘটনা দুটি যেমন ইসাবেলার হাত শক্তিশালী করে তুলে, তেমনি বিশ্ববাসীকে তার স্বৈরাচারী হাতে অত্যাচারিত এবং রক্তাক্ত করে ছাড়ে।

১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারির তৃতীয় প্রহর ছিল মুসলিম ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বেদনাময় মুহূর্ত। এ সন্ধ্যাটা ছিল মুসলিম উম্মাহর উপর সবচে ঘনকালো সন্ধ্যা। এ সন্ধ্যার পর হতাশার যে রাত এসেছিল, আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সেখানে ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি। সেই লাঞ্ছনার বিকেলে গ্রানাডার নয়নাভিরাম প্রশস্ত মসজিদগুলোর মর্মরস্বচ্ছ ফ্লোর ইসাবেলা-বাহিনীর অশ্ব আর খচ্চরের মলমূত্রের আস্তাবলে পরিণত হচ্ছিল। মসজিদের আঙিনা হয়ে উঠেছিল তার বাহিনীর অস্ত্রাগার। সেদিন সন্ধ্যায় মসজিদসমূহ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল মাগরিবের আজানের পরিবর্তে হৃদয়বিদারক কান্নার কোরাস। সাথে শোনা যাচ্ছিল মদ্যপ উন্মাদ খ্রিষ্টান সৈনিকদের মাতলামির মিছিল। গ্রানাডার এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছিল আগুনের কুণ্ডলি। সে আগুনে জ্বলছিল মুসলমানদের কুরআন-হাদিসসহ হাতে লেখা অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ও ইলমি উত্তরাধিকার।

আবদুর রহমান আদ দাখিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রানাডার কেন্দ্রীয় পাঠাগারের ৩ লাখ গ্রন্থের বিশাল ভান্ডার পুড়ানোর ধোঁয়ায় গ্রানাডার আকাশ যে কালো রূপ ধারণ করেছিল মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কালিমা এর চেয়ে মোটেও কম ছিল না। অসহায়ত্ব ছিল এমনই করুণ, শরয়ি দাঁড়িতে সজ্জিত চেহারাগুলোতে ছিল হাহাকার আর কান্নার ছাপ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নারত অশ্রুধোয়া বৃদ্ধরা ছিল গ্রানাডার বাজারে নাপিতের দোকানে দাঁড়ি কাটানোর জন্য লাইন ধরে দাঁড়ানো। একদিকে ওরা অশ্রুধোয়া দাঁড়ি নিয়ে স্পেনের বাজারে হাহাকার করছিল, অপরদিকে খ্রিষ্টান মদ্যপ সৈন্যরা তাদের বিজয়ে আনন্দ-মিছিল দিচ্ছিল।

জাতির ঘাড়ে চেপে বসে লাঞ্ছনার, লজ্জার, অসহায়ত্বের সিন্দাবাদীয় ভূত। মুসলমানরা কোনো দিক দিয়েই নিরাপদ ছিল না। সম্ভ্রম হরণ এই মাত্রায় চলছিল যে, খেদ করে বলা হচ্ছিল—আহ, যদি মাটি ফেটে যেত কিংবা আসমান ভেঙে পড়ত। যে সম্ভ্রমশীলা মুসলিম রমনীরা তাদের স্বজাতির অতি আপনজন থেকে পর্দা পালন করে চলতেন, সেদিন তারা স্পেনের বাজারে খোলা মাথায় ঘোরাফেরা করতে ছিলেন বাধ্য। তাদের পেছনে ঘোড়া দৌড়িয়ে আসছিল মদ্যপ মাতাল খ্রিষ্টান সৈন্য। ওরা এই অসহায় নারীদের কাছে পৌঁছে মুখভরা মদের কুলি তাদের মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে বিকৃত উল্লাসে হেসে উঠছিল।

১৪৯২ সালে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে ইসাবেলা তার সাম্রাজ্য বিস্তৃতকরণ এবং রাজকীয় অর্থভান্ডার স্ফীতকরণের মানসে কলম্বাসকে নয়া দুনিয়া আবিষ্কারের ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সুযোগ প্রদান করে। কলম্বাস ইসাবেলাকে প্রতিশ্রুতি দেয়—'আমি যে অঞ্চল আবিষ্কার করব, সেখানে খ্রিষ্টবাদ প্রচারে

আন্তরিক সচেষ্ট হব। অজানা বিশ্বে খিষ্টবাদের প্রতিনিধি এবং চার্চের পয়গাম নিয়ে যাব। নয়া দুনিয়া থেকে অর্জিত সম্পদ জেরুসালেমে অবস্থিত মুসলমানদের অধীন খ্রিষ্টীয় উপাসনালয়সমূহ স্বাধীন করার লক্ষ্যে ব্যয় করব।' কলম্বাসের কথা শুনে ইসাবেলা আনন্দে নেচে ওঠে এবং আবেগের বশে বলে ওঠে—'নয়া দুনিয়া আবিষ্কারের ব্যাপারে যদি আমার অলংকারগুলো বন্ধক রাখতে হয়, তবুও আমি পিছু হটব না।'

১৭ এপ্রিল ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে ইসাবেলা ও কলম্বাসের মধ্য সেই বিশ্বখ্যাত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; যার ভিত্তিতে কলম্বাসকে স্পেনের প্রধান অ্যাডমিরাল এবং নতুন আবিষ্কৃত এলাকার ভাইসরয় হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর কলম্বাস নতুন দুনিয়ার খুঁজে প্রান্তহীন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে।

ইসাবেলা কলম্বাসের সে প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করে তাকে তিনটি জাহাজ তৈরি বাবৎ ২ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। এ ছাড়া যোগাড় করে দেয় ১০০ মাল্লা ও বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য। তা ছাড়া দেওয়া হয় রাজনৈতিক ও আইনি পৃষ্ঠপোষকতা। এ চুক্তির গর্ভ থেকেই মাত্র ছয় মাসের মাথায় জন্ম নেয় 'আমেরিকা' নামক নতুন এক মহাদেশ। এভাবেই ইসাবেলার রক্তলোলুপ জিঘাংসার পাশাপাশি মুসলিম নির্মূকরণের বাতিক স্পেন থেকে আমেরিকায় পৌঁছে যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হতে হতে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। যদি আরও কটা দিন মুসলমানরা অবকাশ পেত, তাহলে বোধয় কলম্বাস পুনরায় নতুন কোনো আমিরের কাছে তার আবদার নিয়ে হাজির হতো আর আমেরিকা মহাদেশের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে গড়ে উঠত।

কোথায় আশার দ্বিতীয় কদম হে রব!
সম্ভাব্যের মরুতে কেবল একটি কদমের চিন।

যে আমেরিকা আবিষ্কারে রয়েছে ইসাবেলার ন্যায় উগ্র ইসলাম-বিদ্বেষী হিংস্র নারীর পৃষ্ঠপোষকতা, সে আমেরিকার পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রক্তের যে খেলা চলছে, তা তো অতি স্বাভাবিক। তারপরও মুসলমানরা আমেরিকার তরফ থেকে বন্ধুত্ব ও নিরাপত্তার যে আশা করছে; তা নিতান্তই অস্বাভাবিক। কারণ, আমেরিকার অস্তিত্ব, তার বেড়ে ওঠা, তার লালন-পালনের প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষের উপাদান। আমেরিকা কস্মিনকালেও মুসলিম উম্মাহর বন্ধু হতে পারে না। তার পক্ষ থেকে সাহায্যের আকারে কিছু পৌঁছুলে সেটা হবে প্রাণহারী বিষ। আমেরিকার চিন্তা-চেতনায় রয়েছে রানি ইসাবেলার বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি; যা

এড়াবার সাধ্য তার নেই। যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমেরিকার অস্তিত্ব, তাতে আমেরিকা কর্তৃক মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রক্তের খেলা চালিয়ে যাওয়া কোনো অচিন্তিত ব্যাপার নয়; বরং আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় গিয়ে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপদ থাকাটাই হবে সম্পূর্ণ আশ্চর্যের ব্যাপার।

আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি গির্জাইজম, ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টানিজমের প্রান্তিক ধ্যানধারণা, সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, রাষ্ট্র যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা যতই মিথ্যা প্রতিপাদন করা হোক, তা থেকে আলাদা থাকার যতই চেষ্টা করা হোক; রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রের জলেস্থলে বিদ্যমান থেকেই যায়। অতএব, আমেরিকা তার দর্শন থেকে ফিরবে কীভাবে? আজ আমেরিকার পক্ষ থেকে ১০-২০ জন মুসলিম শাসক উপকৃত হলেও হতে পারে; কিন্তু জাতি হিসেবে মুসলিম উম্মাহ কখনো উপকৃত হবে দূরের কথা উপকৃত হবার আশা পোষণও করতে পারে না।

যদি আজ কেউ আফগানিস্তান এবং ইরাকে স্পেনীয় খ্রিষ্টানদের গোঁড়ামি এবং সন্ত্রাসবাদ দেখতে না পায়, যা গ্রানাডা পতনকালে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল; তাহলে সেই ট্যারাচোখ ব্যক্তির কোনো অজুহাত কি আমলে নেওয়া যায়? তিন শতাব্দী থেকে আমেরিকার এই বর্বরতায় কেবল এইটুকু পরিবর্তন এসেছে যে, আমেরিকা তাদের শত্রু-হত্যায় এখন 'স্বাধীনতা' এবং 'গণতন্ত্রের মুক্তি' নামক দুটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করছে। আজ খ্রিষ্টবাদের পরিবর্তে গণতন্ত্রের মুক্তি এবং স্বাধীনতার ব্যাপ্টিস্টকরণ করা হচ্ছে।

ইসাবেলা ১৫০২ সালে যে ধমনিগুলো হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার করাত চালিয়েছিল, আজ পুনরায় সেই ধমনিগুলো সেই একই নির্দয় করাতের তলায় এসে গেছে। ডব্লিউ বুশের তথাকথিত শিক্ষিত সৈন্যরা আজ ইরাকে তা-ই করছে; যা ইসাবেলার মূর্খ সৈন্যরা গ্রানাডায় করেছিল। উভয় ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিম উম্মাহর জান, মাল এবং তাঁদের প্রজ্ঞার উত্তরাধিকার।

মুসলিম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে ইসাবেলার মানসিকতার চিত্রাঙ্কন করতে যেয়ে শায়খ মনজুর এলাহি তাঁর *নিরাঙ্গে উন্দুলুস* গ্রন্থে লেখেন—

> 'গ্রানাডায় ২০০ পাবলিক লাইব্রেরি এবং ডজনখানেক আবাসিক বিল্ডিংয়ে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান গ্রন্থাদিসহ হাতে লেখা অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ছিল। ছিল কুরআনে কারিমের হাজার হাজার কপি এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ তাফসিরগ্রন্থ। ছিল চিকিৎসা ও সৌরবিজ্ঞানের উপর লিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। দর্শনে ছিল ইবনে রুশদের কিছু দুর্লভ গ্রন্থ। এগুলো ছিল মুক্তোর ন্যায় উজ্জ্বল কয়েক শতাব্দীর

জ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ফলাফল। যেগুলোর সংকলন ও সংস্কারে ব্যয় হয়েছে হাজারো লিপিকার এবং আর্টিস্টের পরিশ্রম। যে কাজে বছরের পর বছর ব্যস্ত থাকত সংখ্যাহীন স্বর্ণের কারুশিল্পী, কভার বাধাইকারী। যে গ্রন্থগুলোর অক্ষরে থাকত সোনার প্রলেপ, টীকায় থাকত লতা ও ফুলের কারুকাজ। এ ছাড়া সৌন্দর্যবর্ধনের অকল্পনীয় সব মাধ্যম।

১ ডিসেম্বর হামলাকারী নরপশুরা সেগুলোর উপর হিংস্রতার সাক্ষর রেখে যায়। তারা শতাব্দীপ্রাচীন এসব গবেষণার নির্যাস গাধায় টানা গাড়িতে করে নিয়ে যায়। সেগুলোর উপর বসা ছিল মূর্খ কতিপয় সৈন্য। মানুষকে তামাশা দেখার জন্য রামাল্লা ফটকে জড়ো করা হয়। অপ্রকাশ্য ব্যথা আর প্রচণ্ড রাগে তাদের চোখ থেকে রক্ত ঝরছিল। তাঁদের চেহারায় ছিল ওদের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা। হঠাৎ নির্দেশ হওয়া-মাত্রই তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং মুহূর্তে সে আগুন আসমানের সাথে কথাবলা শুরু করে। সমবেত জনতার একাংশ নীরব থাকলেও আরেকাংশের মুখ ফেটে উচ্চারিত হয় হৃদয়ছেঁড়া আর্তনাদ। হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জনে আল্লাহু আকবারের নিনাদ উচ্চকিত হবার সাথে সাথে ভেঙে যায় জনতার সমাবেশ। আকাশের মৌন প্রহরী তারাগুলো পৃথিবীর এ আগুন দেখে হয়ে যায় হতভম্ব।'

শুধু গ্রানাডায় নয়, কর্ডোভা, সেভিলসহ অন্যান্য শহরেও উন্মাদ শাসকদের নির্দেশে অনুরূপ অসংখ্য লাইব্রেরি জ্বালিয়ে ভস্ম করা হয়।

স্পেনে সংঘটিত এ ঘৃণ্য হামলার উপর আক্ষেপ করতে যেয়ে সমকালীন আমেরিকান ঔপন্যাসিক মি. জেমস ম্যাসজ বলেন—

'ইতিহাস, সাহিত্য এবং গবেষণার উপর এ ছিল এক ঘৃণ্য ও অমার্জনীয় অপরাধ। তখন গ্রানাডা বিজয়ের কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে এহেন পাশব প্রতিহিংসা মিটে আসার কথা ছিল। এমন মূল্যবান ইলমি ভান্ডারের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কী প্রয়োজন ছিল?'

সাম্প্রদায়িকতা, মূর্খতা ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তির এ উদাহরণ তো পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন। আজ আমেরিকান বিজ্ঞান চাঁদ ও মহাশূন্য বিজয়ে ব্যস্ত। তাদের প্রজ্ঞার সূর্য আজ ঠিক মধ্যগগনে। তাদের উন্নতি দেখলে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তাদের ক্ষমতার দাপটে আজ বাঘ ও ছাগল একঘাটে পানি খেতে বাধ্য। তারা আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফেরিওয়ালা। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারে কি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো তফাৎ এসেছে? ইসাবেলা গ্রানাডায় পুড়িয়েছিল ৮০০ বছরের জ্ঞানের

উত্তরাধিকার, আর জর্জ বুশ বাগদাদে পুড়িয়েছে ৭ হাজার বছরের জমানো জ্ঞানের উত্তরাধিকার।

৫ এপ্রিল আমেরিকার বিজয়ী সৈন্যরা বাগদাদে প্রবেশ করলে প্রথম তাণ্ডবেই ন্যাশনাল আর্কাইভ অব বাগদাদ, কুরআনি লাইব্রেরি বাগদাদ, ন্যাশনাল মিউজিয়াম বাগদাদ এবং মসুল আর্কাইভ আর মসুল লাইব্রেরির মতো ইতিহাস, সাহিত্য, ও গবেষণার কেন্দ্রগুলো থেকে উত্থিত ধোঁয়া রামাল্লা ফটকে উত্থিত ধোঁয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলমানদের হৃদয়ের ক্ষতকে আরও দগদগে করে দেয়।

ডেইলি টেলিগ্রাফ অব লন্ডননের প্রতিবেদক ডব্লিউ ব্লেয়ার লেখেন—

> 'ইরাকের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ধ্বংস হাজার বছরের ঐতিহাসিক সভ্যতার উত্তরাধিকার ছাই করে দিয়েছে। তথাকথিত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকারীদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে পৃথিবীবাসীর কল্যাণের উৎস বাগদাদে থাকা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরল স্মৃতি। ৭ হাজার বছর প্রাচীন স্বীকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে বিশ্ববাসী। এটা অপূরণীয় এক ক্ষতি। ১ লাখ ৭০ হাজার দুর্লভ বই, রেকর্ডপত্র, তৈজষপত্র, অসংখ্য নমুনা, নকশা, ছবি, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি এবং কুরআনের কপি হয় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুবা লুট করে নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে মাত্র একমাইল দূরে অবস্থিত বাগদাদে ইরাকের জাতীয় লাইব্রেরি সম্পূর্ণরূপে ছাইয়ের গাদায় পরিণত করা হয়। এর ফলে ইরাকি সভ্যতার চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায়। এ ক্ষতি কী কোনো মূল্য দ্বারা সংকুলান সম্ভব?'

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি, লেখক, পুরাতত্ত্বের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মি. ফার্দিনান্দ ব্যায়াজ লেখেন—

> '১২৫৮ সালে মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদে যেভাবে জ্ঞানের উত্তরাধিকার ধ্বংস হয়েছিল, এরপর ডব্লিউ বুশের হামলা-ই মানবেতিহাসে সভ্যতার উপর সবচে বড় বর্বর হামলা। নিশ্চিতভাবেই এটা একটি সভ্যতা হত্যা। অথচ হত্যাটি সংঘটিত হয়েছে যারা নিজেদেরকে সবচে বেশি সভ্য বলে দাবি করে তাদের হাতে। এ হামলায় কমপক্ষে ১০ লাখ গ্রন্থ, ৯ লাখ রেকর্ডপত্র, ১৪ হাজার ঐতিহাসিক কাষ্ঠলিপি লুণ্ঠন করা হয়েছে অথবা জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা আর প্যোলান্ডের অথলিপ্সু সৈনিকদেরকে জর্দান এবং কুয়েত সীমান্তে অনেক আর্টিস্টের কাছে দুর্লভ অনেক আর্টকর্ম বিক্রয় করতে দেখা গেছে। ক্রেতারা এই মূল্যবান আটগুলোর এক একটি ৫০ হাজার ডলার দ্বারা পর্যন্ত ক্রয় করেছে।'

দৈনিক ডন এই বর্বরতার সমালোচনা করে সম্পাদকীয় কলামে লেখে—

> 'বাগদাদ এবং মসুলের জাদুঘরের লুণ্ঠন এবং ন্যাশনাল আর্কাইভ ও কুরআন লাইব্রেরির ধ্বংসসাধন মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের জাতীয় লাইব্রেরি জ্বালানোর সাথেই কেবল তুলনীয় হতে পারে। ধ্বংস হওয়া বিরল বস্তুর মধ্যে বাবেল, কালখু, নিনোয়া, উর, ইসরিন এবং পারশিয়ান সভ্যতার দুর্লভ তথ্য বিদ্যমান ছিল। অথচ অলৌকিকভাবে বাগদাদের একেবারে কেন্দ্রে থাকলেও "ওজারতে পিটার উইলিয়াম" সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থেকে যায়। বলা হয়—এর পূর্ণ হেফাজতরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া তৈজষপত্রের সংখ্যার ব্যাপারে মতভিন্নতা পাওয়া যায়। আমেরিকান প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি রামসফিল্ড বিদ্রুপাত্মক ভাষায় বলেন— "এক লাখ ৭০ হাজার! কিন্তু এতো অধিক পরিমাণ তৈজষপত্র তো সম্ভবত পুরো ইরাকেও হবে না।"'

অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই ইরাক থেকে আমেরিকায় পৌঁছা সৈন্যদের বাসার জিনিসপত্র চুরি হওয়া শুরু হয়। এই লোভী, পুঁজিবাদী সৈন্যরাতো মানসিকভাবে সেই স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের উত্তরাধিকার, যারা নতুন মহাদেশে পৌঁছামাত্রই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মূল বাসিন্দা ১০০ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানের রক্ত চেটে নিয়েছিল। ৬০ মিলিয়ন আফ্রিকান দাসের রক্ত পান করেছিল। অতঃপর মেক্সিকো, কিউবা, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান, কঙ্গো, সুদান, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লিবিয়া, লেবানন, পূর্বতিমুর, যুগোশ্লাভিয়া, লাউস, আফগানিস্তান এবং ইরাকের পর এখন বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এই ভূতের রাক্ষুসে মাড়ির চাপায় পড়ে কাতরাচ্ছে। মুসলমানরা তাদের সবচে বড় এবং সহজ শিকার। আজ উম্মাহ তাদের শিকলে বন্দি। তাদের ধারালো নখরাঘাতে আজ তাঁরা ক্ষতবিক্ষত। আমেরিকার এই সংক্ষিপ্ত পাশব-ইতিহাস থেকে যদি কেউ শিক্ষা নিয়ে নিজেদের হেফাজতের পথ না দেখে, তাদের বন্ধুজ্ঞানে অজ্ঞান হয়ে যায়; তাহলে আমাদের করার কিছু নেই।

খ্রিষ্টবাদী রেনেসাঁর যে ভূত স্পেনে বিকৃত উল্লাসে মেতে উঠেছিল, তা আমেরিকায় পৌঁছে সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে আরও উগ্র হয়ে উঠেছিল। একই সময়ে আফগানিস্তান এবং ইরাকে আমেরিকান সন্ত্রাসবাদ প্রমাণ করছে—এখন তাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ হচ্ছে মুসলিম জাতি। আমাদের অপরাধও সেই একটিই, যে অপরাধ ছিল গ্রানাডার মুসলমানদের। ইরাক এবং আফগানিস্তানের মুসলমানদের মধ্যেও সেই একই অপরাধ দেখা যাচ্ছে। দুর্বলতার শাস্তি ভোগ করতে করতে পাঁচ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা এখনও কী জন্য মার খাচ্ছি—সেটা বুঝতে পারছি না। আর এ কারণেই আমাদের উপর থেকে শাস্তির এ ধারাবাহিকতা হটছে না।

আমাদের ওয়াদায় সন্দেহ করো না

'ইতিহাস নিজে নিজেকে পাল্টিয়ে থাকে' কথাটি বার বার শুনেছি। কিন্তু ইতিহাসের এই পালটে আসা যে এতো সাদৃশ্যপূর্ণ, এতো প্রকাশ্যভাবেও হয়ে থাকে তা আমাদের ধারণায়ও ছিল না।

পারভেজ মুশাররফ বলেছেন—'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী যুদ্ধে আমাদের কর্মকাণ্ডের উপর সন্দেহ করবেন না।' দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে কাবায়েলি গোত্রসমূহের সাথে সংঘর্ষে ৩০০ বিদেশি সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। যদি আইএসআই এবং পাকিস্তান মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে আমাদের জন্য সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় বিশ্বের জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়াই উত্তম। আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে লাগানো অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে মিস্টার মুশাররফ বলেন—'সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তানের অবস্থানের উপর সন্দিহান হবার কোনো কারণ নেই।'

প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফের এই বিবৃতি শুনে স্মৃতি কেন জানি সেই পত্রের দিকে চলে যায়, যেটি ফার্দিনান্দ আন্দালুসিয়ার শেষ মুকুটধারী আবু আবদিল্লাহকে লিখেছিল। ফার্দিনান্দ বলেছিল—

> *'আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি আমাদের আন্তরিক সেবা দিয়ে যাচ্ছ। আমরা তোমার সেবার কথা স্বীকার করছি। তোমার বিশ্বাস রাখা উচিৎ; অবশ্যই তোমার সাথে নম্র ও ভদ্র আচরণ করা হবে। তোমাকে এ বিশ্বাস রাখা চাই যে, অবশ্যই তোমার উপর অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে। আমরা তোমাকে নিজেদের অভিভাবকত্বে নিয়ে নিচ্ছি; এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট মনে করা উচিৎ। যদিও তুমি তা করে দেখাতে পারোনি, যা তোমার থেকে আশা করা গিয়েছিল। তুমি কৃত অঙ্গীকার থেকে গা বাঁচিয়ে চলছো, অথচ তোমাকে দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা শর্তায়িত ছিল। কৃত অঙ্গীকার পূরণে গড়িমসি করা কিন্তু অঙ্গীকার লঙ্ঘনের নামান্তর। আমরা মনে করি, তুমি আমাদের সহযোগিতায় শহরে (গ্রানাডায়) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারো। কিন্তু তা এখনও প্রকাশ করে দেখাতে পারোনি। তোমাকে যে বিপুল পুরস্কার দিয়ে বলা হয়েছিল—এটা তোমার কাজের বিনিময়।'*

এর কিছুদিন পর আবু আবদিল্লাহর গভর্নর আবুল কাসিম আবদুল মালিকের কাছে ফার্দিনান্দের জনৈক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে পত্র পৌঁছে—

> *'আমার ভাই! তোমার প্রেরিত পত্র পড়ে আমি অত্যন্ত পীড়িত। আফসোস! তুমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছো। অথচ আমি তোমার সাথে সম্ভব উত্তম আচরণ ছাড়া বৈরী কোনো আচরণ করেছি বলে মনে পড়ে না। এখন আমি তোমাকে জামানত দিতে অক্ষম। তোমার পদক্ষেপের গুণকীর্তন করে যাব ঠিকই এবং তোমার উপর অনুকম্পাও প্রদর্শন করা হবে, তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে— তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব তুমি পূর্ণ করে দেখাতে হবে।'*

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এবং স্পেনের জাদুঘরে পত্র দুটি এখনও সংরক্ষিত আছে। পত্র দুটিকে অন্তত মুসলিম-বিশ্বের শাসকশ্রেণির জন্য উদাহরণীয় ও শিক্ষণীয় মনে করা উচিৎ। আজকের পদলেহীদের জন্য নিরাপত্তা কেবলমাত্র অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় আদায়ের উপরই নির্ভরশীল। জেনারেল আইয়ুব খান থেকে নিয়ে জেনারেল পারভেজ মুশাররফ পর্যন্ত উদাহরণগুলো আমাদের নিজস্ব শাসকশ্রেণির। পুরো মুসলিম-বিশ্বের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে মনে হবে প্রত্যেকের কাছে রয়েছে এমন এক একটা পত্র। এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব আদায়ের জন্য মরিয়া। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কন্ডোলিসা রাইস ফার্দিনান্দের মন্ত্রীর ভূমিকা পালন করছে এবং জর্জ ডব্লিউ বুশের (রাজা ফার্দিনান্দ ও সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার) পক্ষ থেকে পারভেজ মুশাররফের নামে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব তো এখনও আদায় হয়নি। অথচ তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল এরই ভিত্তিতে। তুমি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখা দুরূহ হয়ে যাবে। তোমাকে নিরাপত্তার যে অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছিল তা পালন করতে আমাদেরকে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হবে।

পারভেজ মুশাররফ নিজেকে কর্মপ্রিয় মানুষ বলে থাকেন। আমরা আশা করব তিনি সময়ের এই সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের পালটা হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের শাসকশ্রেণি তখন পর্যন্ত চেতনা ফিরে পান না, যতক্ষণ না বিপদ ঘাড়ে এসে পতিত হয়। আবু আবদিল্লাহর উদাহরণই দেখুন! ফার্দিনান্দ তার উপর কৃত অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হতে না দেখে তাকে ধমক দেওয়ার এবং নতুন নতুন নির্দেশ জারি করার পরও সে সচেতন হয়নি। বাহ্যত মুসলমানদেরকে সন্ধির মধ্যেই তাদের কল্যাণ রয়েছে—এ আশ্বাস দিয়ে গোপনে যতটুকু পেরেছে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। ইতিহাসের পাতা

সাক্ষী, সে তার আমলা এবং জনগণকে অত্যন্ত দরদি ভাষায় এ কথা বোঝাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল—আমি যা কিছু করছি, তা কেবল তোমাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে। যেমন ৩১ ডিসেম্বর সে স্পেনের নেতৃবৃন্দ এবং মন্ত্রীদের সম্মেলনে বলেছিল—

> 'আমার এ পদক্ষেপ তোমাদেরকে খ্রিষ্টানদের তলোয়ার থেকে রক্ষার জন্য। তোমাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য। তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য। তোমাদের ভবিষ্যৎ; তোমাদের সম্পত্তি, তোমাদের স্বাধীনতা, তোমাদের নিজস্ব আইন; সর্বোপরি তোমাদের ধর্মের হেফাজতের লক্ষেই আমার এই নতমুখী অবস্থান, এই সন্ধি। আমি তোমাদেরকে হতভাগা হাকিমের (আমার) পরিবর্তে সৌভাগ্যবান (ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার) শাসকের আশ্রয়ে দিতে চাই।'

'বাহ্যত প্রজাদরদি' শাসক এভাবেই তার দুর্বলতা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু যখন তার প্রতারণাময় দরদের উপর থেকে চাদর সরানো হয়, তখন বাস্তবতা বড় নিষ্ঠুর হয়েই প্রকাশ পায়। আবু আবদিল্লাহ যখন জনসাধারণকে বাঁচানোর লক্ষে এই ঘোষণা করেছিল, তখন তাকে সত্যিই একজন দরদি মনে হচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবতা কী ছিল, তা তো আজ রেখে যাওয়া রেকর্ডপত্রের মাধ্যমে সুস্পষ্ট। গ্রানাডা পতনের সময় মুসলমানদের অধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। সেই জামানত পূরণ করা হয়নি; বরং সন্ধিপত্রের কালি শুকানোর পূর্বেই সন্ধির শর্তসমূহ পদদলিত করা হয়। তবে একটি অঙ্গীকার ছিল এবং তা ছিল গোপন। তাতে হতভাগাটি নিজের যাবতীয় স্বার্থ আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। উভয় অঙ্গীকারনামা আজও মাদ্রিদের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। সে সন্ধির পাতায় পাতায় দ্বিচারিতা ছাড়া সত্য ও সুন্দরের চিহ্নটুকুও নেই। প্রতিটি লাইনে আছে কেবল চক্রান্ত আর ব্যক্তিস্বার্থের আকুতি। প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বকীয়তাহীনতা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পরাজয়ের স্বীকৃতি ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য। কে কত টাকায় বিক্রিত হয়েছিল, সে মূল্য লিপিবদ্ধ আছে আজও।

পারভেজ মুশারফেরে কথা হচ্ছে—তিনি কারও কর্তৃত্বের উপর হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু আবু আবদিল্লাহ সর্বপ্রথম তারই পিতার কর্তৃত্বে আক্রমণ চালিয়েছিল। ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে সে তার পিতাকে পদচ্যুৎ ও অসম্মান করে নিজ কর্তৃত্বে বৈধতার সার্টিফিকেট লাগানোর জন্য ক্যাস্টলের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু ১৪৮৩ সালে লুজিনা নামক স্থানে এক সংঘর্ষে সে ফার্দিনান্দের সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হয়। ১৪৮৩ থেকে নিয়ে ১৪৮৬ পর্যন্ত ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দের বন্দি থাকা অবস্থায় গ্রানাডা পতনের উৎসাহব্যাঞ্জক চাপের মোকাবিলা করতে পারেনি। তখনই

মানসিকভাবে গ্রানাডা পতনের ব্যাপারে সম্মত হয়ে যায়। পতনের এই মানসিক প্রস্তুতিকালে তার উপর শর্তারোপ করা হয়—সে নিঃশর্তভাবে পিতা আবুল হাসান চাচা আজজাগালের বিরোধিতা করলে গ্রানাডায় তার কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করার সহযোগিতা দেওয়া হবে। এ বহালকরণ সামরিক, অর্থনৈতিক সবদিক দিয়েই হবে।

আবু আবদিল্লাহ মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলে তাকে আদেশ করা হয় এ কথাগুলো যেন ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলার কাছে লিখে পাঠায়।

আবু আবদিল্লাহ কর্তৃক গ্রানাডা পতনের সেই আহ্বান জানানো-সংক্রান্ত পত্রটা পরিপূর্ণ মাত্রায় না হলে টুকরো টুকরো আকারে সংরক্ষিত আছে। টুকরোগুলো জোড়া দিলে পূর্ণ পত্র পাওয়া যায়। কেবল তারিখ লেখা টুকরোটা পাওয়া যায় না। তবে চিঠির উপর ১৪৮৬ সালে মে মাস লিপিবদ্ধ আছে। নেই কেবল সুনির্দিষ্ট দিন।

৫ জুন ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী এবং রাজার পক্ষ থেকে আরেকটি দস্তাবেজ আবু আবদিল্লাহর নামে প্রেরিত হয়। যেখানে তাকে ওই এলাকার কর্তৃত্ব তিন বছরের জন্য দেওয়ার প্রস্তাব দেখা যায়। তবে এই দস্তাবেজে এটাও বলাও হয় যে, গ্রানাডা এবং এর বেশিরভাগ এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে খ্রিষ্টান প্রশাসন। এসব প্রস্তাব পাঠ করলে বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমেরিকার দেওয়া প্রস্তাবাবলির কথা স্মৃতিপটে আপনা থেকেই ভেসে উঠে।

এখানে পৌঁছে আবারও সেই কথার সত্যতা সামনে চলে আসে—'ইতিহাস নিজে নিজেকে পাল্টিয়ে থাকে'। ম্যাডাম কন্ডোলিসা রাইস সদ্যই এক ইন্টারভিউতে বলেছেন—'পারভেজ মুশাররফকে সচল রাখার জন্য আমাকে স্টিক এবং গাজর ব্যবহার করতে হচ্ছে।' মিসেস রাইসের কথাগুলো হচ্ছে I have to use stick abd carrot to activate Musarraf. সারমর্ম হচ্ছে—পারভেজ মুশাররফ থেকে কার্যোদ্ধারের জন্য কখনো চাপ (স্টিক) এবং কখনো উৎসাহ (গাজর) ব্যবহার করতে হচ্ছে।

আমার মাবুদ! দুনিয়াবাসীর সামনে এমন প্রকাশ্য অসম্মান? হায় তৈমুরের ঘর থেকে আত্মমর্যাদা দূর হয়ে গেছে। অতএব, আফসোস করে কী হবে?

১১ সেপ্টেম্বর ১৪৯১ সালে ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দ স্টিক এবং গাজর ব্যবহার করে আন্দালুসিয়ার শেষ মুকুটধারীকে লিখেছিল—

> *'জানি, তুমি ও তোমরা আমাদের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছো। অতএব, তোমাদের বিশ্বাস রাখা উচিৎ যে, আমরা তোমাদের সাথে লেনদেন শেষ করতে পারি না। এ বিষয়টা ভালো করে জানা থাকা উচিৎ যে,*

(যেমন আল্লাহ জানেন) তোমরা আমাদের নিরাপত্তা-ছায়ায় সুখে দিন যাপন করছো। তোমাদেরকে আগেও বলা হয়েছে যে, তোমাদের মন্ত্রীদের মাধ্যমে বিষয়টা পাকাপাকি করার সময় তোমাদের ব্যক্তিগত সুবিধাদীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে আমাদের সবধরনের সহায়তা এই শর্তের উপর নির্ভর করবে যে, তোমাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা কার্যত প্রদর্শন করতে হবে। এর থেকে প্রত্যাবৃত্ত হলে অঙ্গীকারটা অবিশ্বস্ত হয়ে যাবে।'

এ পত্র পাঠ করেই আবু আবদিল্লাহ তার পরিণতি কী হবে—বুঝে নিতে পেরেছিল। এরপর থেকে সে যা করছিল, তা বাহ্যত গ্রানাডার মুসলমানদের কল্যাণের জন্য বললেও মূলত সবকিছু ছিল নিজের জন্য। পরে সে এবং তার মন্ত্রী উভয়ে একত্রে ফার্দিনান্দকে গোপন একটি প্রস্তাব পাঠায়। এই প্রস্তাবকে *ব্যক্তিগত স্বার্থের যৌথ প্রস্তাব* শিরোনাম দিয়ে প্রেরণ করা হয়। পত্রে আবু আবদিল্লাহ, আবুল কাসিম আবদুল মালিক (গ্রানাডার গভর্নর) এবং ইউসুফ বিন আবুল কাসিম নামের একজন বিশেষ আমলার স্বাক্ষর ছিল। উক্ত প্রস্তাবনামার ফটোকপিতে লেখা আছে—

'আমাদের জানা আছে যে, গ্রানাডা আপনাদের সমর্পণ করা হবে এবং গ্রানাডার বাদশাহ সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবেন। যাবার সময় তিনি সাথে করে কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না। সেখানে যা কিছু যেমন আছে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের দাবি হচ্ছে :

- *পতনের পর আমিরকে ৩ লাখ মারাবিদ (মুদ্রার নাম) দিতে হবে।*
- *আপনাদের হাতে থাকা অল্প বয়সী শাহজাদাকে মুক্তি দিতে হবে।*
- *যে-সমস্ত জমি গ্রানাডা পতনের পর মহান খ্রিষ্টান অধিপতি গ্রহণ করবেন না, সেগুলো আমির এবং মন্ত্রী আবুল কাসিম আবদুল মালিককে প্রদান করা হবে; যাতে আমরা ওইগুলো শর্তের ভেতর যুক্ত করে বিক্রয় অযোগ্য বলে আমাদের উত্তরাধিকারদের জন্য রেখে যেতে পারি।*
- *আমাদের নারীদের অলংকার, সুগন্ধি, গহনা, সুগন্ধি তৈল এবং যাবতীয় বিলাস-সামগ্রী বিক্রয়ের অনুমতি থাকবে।*[৬৩] *যদি মহামান্য ফার্দিনান্দের*

[৬৩] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যখন মুসলমানদের ৮০০ বছরের ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে, তখন মুর্খগাটি তার স্ত্রীদের মেকআপের চিন্তা করছে।

পরিবার এসব জিনিস ক্রয় করতে চান, তাহলে অন্যের তুলনায় কিছুটা সস্তা মূলে বিক্রয় করা হবে।

* আল বাশারাত ও এর পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে পতনের হুকুম আরোপিত হবে না।

* এ শর্তগুলো আমার, আবুল কাসিম আবদুল মালিক এবং ইউসুফ ইবনে কাসিমের এবং তাদের সন্তানদের জন্য। এবার আপনারা যেমন ভালো মনে করেন তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে মেনে নিলে লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে; যাতে আমরা বিশ্বাসের সাথে অনুধাবন করতে পারি যে, আমাদের ও আপনাদের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। আল হামরা বিজয়ের সময় আমাকে এবং আবুল কাসিম আবদুল মালিককে অতিরিক্ত ১০ হাজার মুদ্রা প্রদান করতে হবে। দালিউজ নামক ক্যাম্পে যে কৃষকরা বসবাস করছে, তারা গ্রীষ্মকালে আমাদের জন্য তরকারি সরবরাহ করে থাকে। তাদের সম্পর্ক ইবনুল হাজ, ইবনুল ইয়া এবং ইবনে জায়েদের সাথে। মহান বাদশাহর কাছে আবেদন, তাদের প্রতি সুনজর দেবেন।

* মহান বাদশাহ আমাদেরকে আশ্বাস দেবেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয়ে যা কিছুর আবেদন জানানো হয়েছে তা রক্ষা করবেন।'

দস্তখত
আমির আবু আবদিল্লাহ
আবুল কাসিম আবদুল মালিক
ইউসুফ ইবনুল কাসিম

উক্ত প্রস্তাব সম্বলিত পত্রের জবাবে ফার্দিনান্দ লেখেন—

'আমি আপনার সবগুলো পত্রই পেয়েছি। যে বিষয়ের উপর ইতঃপূর্বে ঐকমত্য হয়েছে এরচে বেশি কিছু দাবি করবে—এটা প্রত্যাশিত ছিল না। এতে মূল কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। আমার ইতঃপূর্বের লেখা বুঝতে তুমি ব্যর্থ হয়েছ, আর ব্যর্থতার জন্যই তুমি সাবেক সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দেরি করছো। তোমাকে সেই শর্তে আসতেই হবে, যা ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যদি সেগুলো কার্যকর না করো; যা লিখিত আকারে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরাও আগে লিপিবদ্ধ সেসব শর্ত মেনে নিতে বাধ্য নই। লিখিতভাবে বলা ছিল যে, গ্রানাডা একটা সুনির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তা সমর্পণে তোমার পক্ষ থেকে ব্যর্থতা

পাওয়া গেছে; তাই এখন থেকে আগের লিখিত শর্তগুলোও বাতিল বলেই গণ্য হবে।'

দস্তখত
খ্রিষ্টান অধিপতি ফার্দিনান্দ।

ফার্দিনান্দের এ পত্রখানা আবু আবদিল্লাহ ও তার সঙ্গী-সাথিদেরকে চাপের মধ্যে ফেলে দেয়। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না এই চক্রান্তের শিকার হয়ে কাঁদবে, নাকি মুসলমানদের সাথে ধোঁকার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে। হায়! তখনো যদি সে নিজেকে সামলে নিতে পারত। তখনো গ্রানাডায় ৩৫ হাজার দুর্দম সৈন্য বিদ্যমান ছিল।

আন্দালুসীয় জনগণ এক অব্যক্ত অবস্থার ভেতর দিন পার করছিল। একদিকে কেয়ামতের দশা, অপরদিকে তাদের স্বার্থের দোহাই দিয়ে রক্ষকরা ছিল নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। ডুবন্ত জাহাজ বাঁচানো অপেক্ষা তারা জাহাজের মাল-সামানা রক্ষার চিন্তায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেছিল। এদিকে যত দিন যাচ্ছিল ইসাবেলারা পতনের শর্ত কঠিন থেকে কঠিন করে যাচ্ছিল।

১৪৯১ শুরু হবার সাথে সাথেই আবু আবদিল্লাহ দেয়াল লিখন পড়ে ফেলে। তখন তার একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল গ্রানাডার বিনিময়ে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে কী কী স্বার্থ আদায় করে নিতে পারে! সে গোপনে নিজের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে গভর্নর আবুল কাসিম, ইউসুফ ইবনুল কাসিম এবং হামদুন নাফিস প্রমুখ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। তারাও নিজেদের জন্য খ্রিষ্টান রাজার কাছে সম্ভব যা পারা যায় আদায় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।[৬৪]

আন্দালুসিয়ার মাটিতে তখনো সেজদা আদায় হচ্ছিল। সেখানকার আকাশে তখনো আল্লাহু আকবারের আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছিল। নিয়মমাফিক সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল এবং তারাগুলোও আলো বিকিরণ করে যাচ্ছিল। গর্ভবতী নারীরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য নিরাপদ জায়গা খুঁজছিল। নদীনালা আগুন এবং রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল। জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলছিল। হিংস্ররা বিশাল খাবার ছিঁড়ে-খুড়ে খাবার জন্য একজোট হয়ে ওঠছিল। গ্রানাডার জন্য সেটাই ছিল স্বাধীন শেষ দিন।

এদিকে গ্রানাডা উপহার দিয়ে নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যৎ রাঙাবার জন্য যারা নিবেদিত ছিল, তারা নিজেদের আত্মমর্যাদাহীনতা, চক্রান্তপ্রিয়

[৬৪] গ্রানাডা তখন সুরায়ে তাকবিরের তাফসির এবং মুসলিম শাসকশ্রেণি সুরাতুল বাকারার সাক্ষ্য হিসেবে ছিল।

মানসিকতা, লোভ এবং ভোগবাদী হাতে মুসলমানদের ৮০০ বছরের সূর্যকে প্রহরে প্রহরে, পলে পলে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন তারা সবকিছু ডুবে যাবার আগে শেষ হেঁচকির পর্যায়ে ছিল। তারা শেষ মহল, শেষ ঘর, কিছু জমি, কিছু মুদ্রা, কিছু অলংকার, কিছু গবাদি পশু, কিছু উপাধি, কিছু লাঞ্ছনাদায়ক নেতৃত্বসহ দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছিল। তারা নিজেদের স্বার্থের চাল চালছিল।[৬৫]

আল্লাহ আমাদেরকে চালবাজ এবং ধোঁকাবাজদের থেকে হেফাজত করুন। এদিকে দানা, বাজৌর, ওয়াজিরিস্তান, মিরানশাহ, আফগানিস্তান এবং ইরাকেও সূর্য ডুবতে বসেছে। তারাগুলোর আলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে। নারী তো নারী গর্ভবতী উটনীগুলো পর্যন্ত দিশাহারা, লাগামহীন, উদ্দেশ্যহীন এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছে। তাদের ভয়—না জানি তাদের কাছে কার নাম চাওয়া হয়। জীবিত দাফনকৃত বালিকাদের এ কথা জিজ্ঞেস করার কেউ নেই যে, কী অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? এদিকে খ্রিষ্টানরা তো ইসাবেলার পরীক্ষিত সন্তান। ফার্দিনান্দের প্রিয় বংশধর। অন্তর ধুকছে, ইয়া আল্লাহ! আমাদের প্রিয় জন্মভূমির শাসকশ্রেণি না আবার আন্দালুসিয়ার শাসকশ্রেণি হয়ে যায়। তারা না আবার ভেতরে খ্রিষ্টানদের সাথে আঁতাতকারী এবং বাইরে মুসলমানদের সান্ত্বনাদানকারী হয়ে যায়।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা করো ওই সমস্ত লোকদের হাত থেকে; যারা ধোঁকাবাজ, যারা মুসলিম নারীদের পরপুরুষের সাথে উঠাবসা করতে উৎসাহ যোগায়। যারা ওদের অর্ধ-উলঙ্গ দেহ দেখে আনন্দে হাততালি দেয়। যারা এদেরকে পূর্ণ উলঙ্গ করতে চায়। রক্ষা করো তাদের থেকে; আমাদের বিরুদ্ধে যারা গোপনে সংবাদ সরবরাহ করছে। ঘরে ঘরে অন্যায়ভাবে চিহ্ন লাগিয়ে দিচ্ছে। যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য ওদের সাথে আঁতাতে লিপ্ত। আমাদেরকে নীচ দেখানোর জন্য যারা উম্মাহর ঐতিহ্য বিক্রয়ে তৎপর।

ওয়ান ডি মারিয়ানা গ্রানাডা পতনের চিত্রাঙ্কন করতে যেয়ে লিখেন—

> '২ জানুয়ারির সকাল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার আগেই আবু আবদিল্লাহর নারীমহল অন্ধকারের ভেতর আল হামরার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আল বাশারাত উপত্যকার দিকে বেরিয়ে পড়ে। সেই দলে ছিলেন রাজমাতা সুলতানা আয়েশা এবং স্ত্রী জাহরা রাওয়ামাসহ রাজবংশের আরও অনেকে। সুলতানা আয়েশা সাহস এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে নীরব

[৬৫] তারা ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহও কৌশল করছিলেন; এবং আল্লাহই সবচে বড় কৌশলী। -সূরা আনফাল

থাকলেও বাকিরা পেছন ফিরে আল হামরার দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। তাদের আহাজারি ও কান্নার আওয়াজে আল বাশারার সুনসান উপত্যকা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠছিল। এদিকে চিন্তা ও ব্যথায় জর্জরিত আবু আবদিল্লাহর সামনে গ্রানাডার চাবি ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার হাতে তুলে দেওয়ার পর্যায় ছিল। হতভাগা শাসক চাবি সমর্পণের সময় জড়িয়ে-যাওয়া কণ্ঠে মিনমিনিয়ে কেবল এইটুকু বলতে পেরেছিল—

"এ চাবিগুলো স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের শেষ প্রতীক। এগুলো স্পেন যে আমাদের ছিল এর প্রমাণ। কিন্তু রবের ইচ্ছা এটাই যে, এগুলো যেন আপনাদের হাওয়ালা করে দিই। আমি চাবিগুলো এই আশা নিয়ে হস্তান্তর করছি যে, আপনারা আমাদের সাথে নম্র ব্যবহারের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তার উপর অটল থাকবেন।"

জবাবে ফার্দিনান্দ বলেছিল—

"আমাদের অঙ্গীকারে সন্দেহ করো না। আমরা এ ওয়াদা দিয়েই যুদ্ধ এড়াতে পেরেছি।"[১]

ইতিহাস স্বাক্ষী, এই ওয়াদার উপর একদিনও অতিবাহিত হয়নি। ওয়াদা-লঙ্ঘন ছিল ফার্দিনান্দের সৌখিন একটা বিলাসিতা। কলম্বাস আমেরিকায় এ শিক্ষাটা আরও বেশি ব্যবহার করেছিল। সে রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে ওয়াদা করতো; কিন্তু সুযোগ পেলেই তা ভঙ্গ করতো। কলম্বাসের সন্তানরা খুব ভালো করেই তা আত্মস্থ করেছে এবং এই জঘন্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে ওরা পেয়ে আসছে। এই অমানবিক অভ্যাস ইসাবেলা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী থেকে আমেরিকার শাসকশ্রেণি পেয়ে আসছে। এটা বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় আমেরিকানদের সম্পদ। ওয়াদাভঙ্গ এখন আমেরিকানদের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৫০২ সালে উবায়দা সুলায়মানিকা, আলমির, গ্রানাডা এবং কর্ডোভায় শরয়ি দাড়িধারীরা আক্রমণের শিকার হচ্ছিল; বর্তমানেও ঠিক সেভাবেই তারা আক্রমণের লক্ষবস্তু এবং আশ্চর্য হলেও সত্য, এই টার্গেট থেকে আজও সেকালের মতো চুল-কাটা, চোখ-লাগা, তেল-মারা, সিনা-খোলা, ঘর থেকে বহিস্কৃত, ম্যারাথনে দৌড়ানো, পরপুরুষদের সাথে হ্যান্ডশেককারী, নাচ-গানের আড্ডা আলোকিতকারী লোকগুলো ওদের টার্গেট নয়; বরং আপনজন।

মুমিনরা সাধারণত এক গর্তে দু-বার দংশিত হয় না। কিন্তু আমরা বোধহয় মুমিন নই; অথবা আমাদের উপর কঠিন পরীক্ষা চলছে। ঘটনা যাই হোক, আমরা কিন্তু বার বার একই গর্তে দংশিত হচ্ছি। দংশিত হয়েছি গ্রানাডায়, দিল্লিতে, বায়তুল মাকদিসে, কাবুলে, বাগদাদে, ...? হে আল্লাহ! আমাদেরকে আরেক পতন থেকে রক্ষা করো। আমরা যতই প্রার্থনা করি না কেন পার্শ্ব অবস্থা কিন্তু ভিন্নকিছুর আভাস দিচ্ছে। ইসাবেলা, ফার্দিনান্দ, কলম্বাস, সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ, স্যার থমাস রো, রবার্ট ক্লাইভ, কন্ডোলিসা রাইস, টনি ব্লেয়ার এবং জর্জ বুশরা একই চরিত্র। একই ভূতের সন্তান। এরা মুসলিম উম্মাহর ঘাড় মুছড়ে দিতে চায়। এরা একই ধরনের রক্তপায়ী। এদের দাঁত ৫০০ শতাব্দী ধরে আমাদের কণ্ঠনালীর উপর থেকে হটছে না।

হে মুসলমান! স্পেন থেকে বাহির হবার পর নিউ ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত নিরাপত্তার নামে হত্যা একই মানসিকতা থেকে উদ্ঘত। একই হাতের কারসাজি। বার বার নাম পালটে কেবল রক্ত খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওইদিকে শত্রুতার পর্যায় যতই বাড়ছে এদিকে পা চাটার মনোভাব ততই বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। ওইদিক থেকে আক্রমণ যতই তীব্র হচ্ছে এদিকে বন্ধুত্বের আহ্বান ততই উচ্চকিত হচ্ছে। আমাদের দুর্বলতার অভিশাপ যেটুকু না ক্ষতি করেছে, তারচে বড় ক্ষতি করেছে আমাদের পরিভাষার বিকৃতি। 'পরীক্ষিতকে পরীক্ষা করা বোকামি' এটা একটা সর্বজনমান্য উপকথা ছিল। কিন্তু আজকের অবস্থা হচ্ছে, আমরা পরীক্ষিতেরই কেবল পরীক্ষা নিচ্ছি। ফার্দিনান্দ থেকে জর্জ বুশ পর্যন্ত প্রত্যেকেই আমাদের বার বার বলে আসছে—'আমাদের ওয়াদায় সন্দেহ পোষণ করো না।' যদিও আমরা জানি, জর্জ বুশের ওয়াদায় সন্দেহ করলেও তা-ই হবে, যা হয়েছিল ফার্দিনান্দের ওয়াদার ক্ষেত্রে।

হে আল্লাহ রহম করো! আমাদেরকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও! আমাদের বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ আমাদের শাসকশ্রেণি এমন হবেন না। কিন্তু এর প্রতিশেধক কোথায়? গ্রানাডাবাসী এই সরল বিশ্বাস নিয়েই মার খেয়েছিল। আমাদের হত্যানামায় সেই মোহর লেগে গেছে যা পাঁচ শতাব্দী আগে লেগেছিল। আন্দালুসিয়ার পতনের মধ্যে শাসকশ্রেণির স্বেচ্ছাচার, খ্রিষ্টানদের চরম সাম্প্রদায়িকতা এবং জায়নবাদী চক্রান্ত একাকার ছিল। আমেরিকার অস্তিত্বেও মুসলমানদের পরাজয়, খ্রিষ্টানদের প্রান্তিকতাবাদ এবং জায়নবাদী চক্রান্ত জড়িত ছিল। আমরা বার বার মার খেলেও ইতিহাস থেকে সবক নিচ্ছি না। ফলে দেশকে আমরা পতনকালের আন্দালুসিয়ার পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ রহম করুন! আশঙ্কা জাগে, আমাদের কালিমা পাঠ পূর্ণ হকসহ হচ্ছে কিনা। যেমনটি সন্দেহ জাগে পতনকালের স্পেনের শাসকশ্রেণির কালেমার ক্ষেত্রে।

সদৃশ্যতা... জোরপূর্বক না স্বভাবজাত

গরম খবর! পাকিস্তানের সেনা ও রাষ্ট্রপ্রধান পারভেজ মুশাররফ স্পেন সফরে গেছেন। তিনিই প্রথম পাকিস্তানি রাষ্ট্রনায়ক, যার সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

রবের প্রতিটি কাজেই গভীর হেকমত থাকে। মিস্টার মুশাররফ সাহেবের স্পেন সফর মে মাস আসে আসে সময়ে হয়। মে স্পেনের ইতিহাসের এমন এক মাস, যা একদিকে যেমন চোখ-ধাঁধানো প্রভা বিকিরণকারী, তেমনি অত্যন্ত বেদনাদায়ক অন্ধকারেরও। দুদিকের মধ্যে মিস্টার প্রেসিডেন্ট কোন দিকটির প্রতি নজর দেন আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি। দোহাই রবের! জোরপূর্বক কোনো সাদৃশ্যতা প্রতিষ্ঠা করবেন না। প্রত্যেক জিনিসকে তার সৃষ্টিগত অবস্থায় রাখাই উত্তম।

মে মাস স্পেনের ইতিহাসে দু-ভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি মধ্যগগনের সূর্যের মতো দীপ্তিময় হিসেবে, অপরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক কালো এবং রক্তরঙিন হিসেবে।

হিজরি ৭০ সনের ১ মে স্পেনের উপকূলে এক দীর্ঘদেহী শক্তদেহী ঘণ দাঁড়িবিশিষ্ট এবং ইমানি জজবায় পরিপূর্ণ গম্ভীর ও সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর অল্পসংখ্যক সৈন্যকে লক্ষ্য করে কিছু কথা বলছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল আব্বাস আহমদ ইবনুল মুগাররা তারিক বিন জিয়াদের সে বক্তব্যকে এভাবে রেকর্ড করেছেন—

> 'প্রিয় সাথিবৃন্দ! তোমাদের পলায়নের জায়গা কোথায়? তোমাদের পিছনে বিস্তর সমুদ্র। সামনে অসংখ্য শত্রু। খোদার কসম! তোমাদের জন্য আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে অটল থাকার এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাবার কোনো বিকল্প নেই। স্মরণ রেখো! এই ভূখণ্ডে তোমরা এতিমের চেয়েও বড় অসহায়। শত্রু তোমাদের মোকাবিলার জন্য পুরো বাহিনী এবং বিপুল অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত। তাদের কাছে আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী। অথচ তোমাদের কাছে তোমাদের তলোয়ার ছাড়া আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের কিছুই নেই। তোমাদের কাছে শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা খাবার ছাড়া কোনো খাবার নেই। যদি বেশ

কিছুদিন এ অবস্থায় যায়, তাহলে তোমরা উপবাসের দরুন দুর্বল হয়ে পড়বে। কোনো উল্লেখযোগ্য সফলতা তোমরা অর্জন করতে পারবে না। তোমাদের শক্তির নিঃশ্বাস চলে যাবে। এখন পর্যন্ত শত্রুমনে তোমাদের যে ভীতি বজায় আছে, তাও উবে যাবে। তাদের দুঃসাহস বেড়ে যাবে।

অতএব, ওই পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে, তোমরা দৃঢ়পায়ে দাঁড়িয়ে এই অহংকারী বাদশাহর অহম ভেঙে দেবে—যে তার নিরাপদ শহর থেকে বেরিয়ে এসে শহরটি তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যদি তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকো, তাহলে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারো। আমি তোমাদেরকে এমন কোনো পরিণতি থেকে ভয় দেখাচ্ছি না, যা থেকে আমি বেঁচে থাকার প্রয়াস চালাচ্ছি। আমি তোমাদের এমন কাজের প্রতি উৎসাহ জোগাচ্ছি, যার সবচে সস্তা পুঁজি হচ্ছে মনুষ্যপ্রাণ। তবে এ কাজের সূত্রপাত সবার আগে আমিই করব। স্মরণ রেখো! যদি তোমরা আজকের কষ্ট সহ্য করে নিতে পারো, তাহলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ উর্বর ভূমি থেকে উপকৃত হতে পারবে।

চিন্তা করো না! আল্লাহর রহমত এবং সাহায্য তোমাদের সাথে আছে। এ আমল ইহ-পরকালে তোমাদেরকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। স্মরণ রেখো! আমি তোমাদের যে কাজের দিকে আহ্বান করছি, তাতে প্রথম লাব্বাইক উচ্চারণকারী হব আমিই। যখন উভয় বাহিনী পরস্পর পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন ইনশাআল্লাহ আমার হামলা এ ভূখণ্ডের অহংকারী শাসক রডারিকের উপর পড়বে। আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করব। তোমরা আমার সাথে হামলা করবে। আমি রডারিককে ধ্বংস করার পর শহিদ হয়ে গেলে রডারিকের ব্যাপারে তো তোমাদেরকে নিশ্চিন্ত করে গেলাম।

আমি বিশ্বাস করি, তোমাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিদীপ্ত লোকের অভাব নেই, যাকে তোমরা আমার অবর্তমানে নেতা নির্বাচিত করতে পারো। যদি রডারিকের কাছে পৌঁছার আগেই আমি দুনিয়া থেকে চলে যাই, তাহলে আমার এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন তোমাদের উপর ফরজ হয়ে থাকবে। তোমরা সবাই মিলে তার উপর হামলা অব্যাহত রাখবে। পুরো দ্বীপ বিজয় অপেক্ষা এই লোকটিকে হত্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তার মৃত্যুর পর শত্রু এমনিতেই হেরে যাবে।'

তারিকের সঙ্গী-সাথিরা আগে থেকেই জিহাদের আবেগ এবং শাহাদতের আগ্রহে ছিলেন উদ্দীপ্ত। তাঁর বক্তব্য তাদের ইমানি জজবায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা ওয়াদিয়ে লাক্কায় নিজেদের প্রাণ ও দেহের কথা ভুলে জিহাদ চালিয়ে যান। যুদ্ধ আট দিন অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে বিজয় মুসলমানদের ভাগ্যেই জুটে। রডারিকের বাহিনী পালিয়ে যায়। খোদ রডারিকও এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে নিহত হয়। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাকে স্বয়ং তারিক বিন জিয়াদ হত্যা করেছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনামতে, তার শূন্য ঘোড়াটা নদীর পাশে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখা যাচ্ছিল। এতে মনে করা হচ্ছিল সে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দেওয়া এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জন হয়। এ যুদ্ধই ছিল ইউরোপের বুকে মুসলমানদের প্রবেশের প্রথম ভূমিকা। এরপর পুরো আন্দালুসিয়ার দরজা খুলে যায়। মুসলমানগণ আন্দালুসিয়া জয় শেষে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। স্পেনের তৎকালীন রাজধানী টলোডো জয় করেও তাদের বিজয়যাত্রা থেমে থাকেনি; বরং সামনে অগ্রসর হতে হতে ফ্রান্সে পৌঁছে পিরেনিজের পাদদেশে গিয়ে থামেন।

আন্দালুসিয়া বিজয়ের পর মুসলমানরা এখানে ৮০০ বছর শাসন করেন। এ মেয়াদে তারা এই ভূখণ্ডকে জ্ঞান, হেকমত এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের রাজধানীরূপে গড়ে তুলেন। একসময়ের অবহেলিত এ দেশকে গড়ে তুলেন দুনিয়ার জান্নাত হিসেবে।

দ্বিতীয় মাসটাও মে-ই ছিল। সন ছিল ১৪৮৬। দিন ছিল অজ্ঞাত। এটি ছিল মুসলিম আন্দালুসিয়ার ইতিসের সবচে কালো দিন। আন্দালুসিয়ার শেষ শাসক আবু আবদিল্লাহ ফার্দিনান্দকে লিখে জানায়—'আমি আপনাদের কাছে গ্রানাডা হস্তান্তরের জন্য তৈরি।' কিন্তু কেন এবং কীভাবে? এই প্রশ্ন দুটোর উত্তরের জন্য আমাদেরকে নিচের চারটি পত্রের উপর নজর দিতে হবে। খুব সম্ভব আয়নায় চেহারা ভেসে উঠবে।

১. ২৯ এপ্রিল আবু আবদিল্লাহ ইসাবেলার কাছে পত্রযোগে আবেদন করে—

> *'যেকোনো বিদ্রোহে কিংবা বাইরের আক্রমণকালে যেন গ্রানাডার নিরাপত্তায় কোনো প্রকার অবহেলা করা না হয়। আপনাদের উপর আশা—আপনারা কোনো অবস্থায়ই গ্রানাডাকে অরক্ষিত ফেলে যাবেন না। গ্রানাডার নিরাপত্তার জন্য আমরা আপনাদের দিকেই চেয়ে থাকব।'*

সুবহানাল্লাহ! কতবড় বোকা! যাদের কাছ থেকেই আক্রান্ত হবার অধিক ভয় ছিল, তাদের কাছেই নিরাপত্তা-প্রার্থনা।

২. ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার পক্ষ থেকে আবু আবদিল্লাহর মন্ত্রী আবুল কাসিমকে লেখা হয়—

'আমাকে আমার সেক্রেটারি ফার্দিনান্দ জাফিরা জানিয়েছে, তোমরা আমাদের সেবা করতে চাও এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিরাপত্তা চাও। সে আরও বলেছে, তুমি আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছো। আমার এবং জাফিরের পক্ষ থেকে তোমাকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তুমি তা ব্যবহার করতে পারো; তোমাকে সে অধিকার প্রদান করা হবে। আমরা অবশ্যই তোমার উপর দয়ার্দ্র থাকব। তোমার উপর আমাদের অনুগ্রহের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না। তবে জেনে রেখো, অন্য কারও সাথে যোগাযোগ করলে তুমি বিপদে পড়ে যাবে। আমি নির্দেশ দিচ্ছি—তুমি জাফিরের মাধ্যমেই নির্দেশনা লাভ করবে এবং যা কিছু করতে বলা হবে, তাতে অলসতা করবে না।'

৩. ১১ সেপ্টেম্বর ১৪৯১ ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দ আবু আবদিল্লাহকে আশ্বাস দিয়ে লেখে—

'জানি, তুমি এবং তোমার প্রজাগণ আমাদের সেবায় নিয়োজিত আছো। এ বিশ্বাস রাখা চাই যে, আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটাতে চাই না, না-ই-বা তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক কোনো অবস্থায় বিপর্যস্ত হতে পারে। একথা ভালোভাবে জেনে রাখা উচিৎ যে, (খোদাও বিষয়টি ভালো করেই জানেন) তোমরা আমাদের নিরাপত্তা থেকে অবশ্যই সুফল ভোগ করবে। তোমাকে আগেও বলা হয়েছে— তোমাদের মন্ত্রীর সাথে যা কিছু সম্পাদিত হয়েছে, তাতে তোমাদের সুবিধার দিক অগ্রাধিকার পাবে। তবে আমাদের অনুগ্রহ এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; যেসব শর্ত নির্ধারিত হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। এ থেকে বিরত থাকলে পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বস্ত ও অকাজের বলে প্রমাণিত হবে।' হালকা ধমকও। ধন্যবাদ মিস্টার ফার্দিনান্দ।

৪. শাসক যেমন হয়ে থাকে তার পরিষদও হয়ে থাকে অনুরূপ। আবু আবদিল্লাহর গভর্নররা কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতায় তার থেকে কম ছিল না। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নর আবুল কাসিম এবং তার ডান হাত ইউসুফ যৌথভাবে ফার্দিনান্দের কাছে একটা পত্র প্রেরণ করে। পত্রের ভাষা ছিল আরবি। তবে ক্যাস্টলিন এবং স্পেনিশ ভাষায় এর অনুবাদসহ স্বাক্ষরযুক্ত কপি সংশ্লিষ্ট ছিল।

আরবি পত্রের শুধু শেষাংশ অক্ষত আছে। তবে স্পেনিশ ভাষার পত্র পুরোটাই সংরক্ষিত। পত্রটা সংরক্ষিত না থাকাই শ্রেয়তর ছিল। সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় তো তৎকালীন মুসলমান শাসকশ্রেণির আত্মমর্যাদাহীনতার কথাও সংরক্ষিত থেকে গেল। সংরক্ষিত না থাকলে একে শিক্ষাগ্রহণের প্রথম পৃষ্ঠা বলা যেত।

আবুল কাসিম এবং ইউসুফ ফার্দিনান্দকে লিখে জানায়—

> *'মহাত্মন! আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে আপনার হাতে চুমো খেতে চাই। শুধু তাই নয়, আপনার শরীরের যে অংশে অনুমতি থাকবে, সেখানেও চুমো খেতে চাই; যাতে আপনি আপনার সাথে ভবিষ্যতে একাত্ম হয়ে যাওয়া দাসদের অবস্থা দেখতে পান। স্বীকার করছি, আপনার অনুগ্রহের উপর অভিযোগ করার কিছু নেই। জাফির[৬৬] আমাদের ভাই। তার থেকে আপনার নির্দেশ পেয়ে তা প্রতিপালনের জন্য মুখিয়ে থাকি। সে যখনই আপনার পক্ষ থেকে কোনো বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়, আমরা সাথে সাথে তা পালন করে থাকি। এ ব্যাপারে জাফিরের কাছে আমাদের অবহেলা-সংক্রান্ত কোনো রিপোর্ট পাবেন না। আমরা আপনার বিশ্বস্ততায় অটল আছি। আপনার কল্যাণের জন্য আমরা সর্বক্ষণ নিবেদিত। নিশ্চয় জাফির এর সাক্ষ্য দিতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবে।'*

নিজেদের বাহুর উপর নির্ভর না করে এরা হয়ে ওঠে শত্রুর করুণা ও দয়ার ভিখারি। অবশেষে সেদিন এসে উপনীত হয়, যেদিন খ্রিষ্টানদেরকে রক্ষাকর্তা এবং মুসলমানদের শত্রু মনে করা আবু আবদিল্লাহকে আল হামরা রাজপ্রাসাদে পতনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করার অংশ হিসেবে গ্রানাডার চাবি ইসাবেলার হাতে সমর্পনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল।

আবু আবদিল্লাহসহ রাজপরিবারের সদস্য এবং আমিরগণ ছিল চাকচিক্যময় পোষাক পরিহিত অবস্থায়। তাদের বর্মে সোনা-চাঁদির টুকরোগুলি ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করছিল। সেগুলোর স্থানে স্থানে মূল্যবান পাথর জোড়া ছিল। কাসরুল হামরায় ইসাবেলা, ফার্দিনান্দ, খ্রিষ্টান-বাহিনীর জেনারেল এবং আমির-ওমারাদের বরণের আয়োজন চলছিল। ওই দিন আল হামরার পরিবেশই ছিল আলাদা। মহলের বিভিন্ন জায়গায় মর্মরের ফরাশ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। পশমি আবরণী দ্বারা সোফার বালিশ সাজানো ছিল। রেশম এবং পরনিয়ালের পর্দার উপর পোখরাজের তাজা ঝালর ঝুলছিল। মণিমুক্তোর লটকে রাখা ঝালরবিশিষ্ট ফুল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছিল। রোপার উজ্জ্বল

[৬৬] ফার্দিনান্দের বিশেষ উপদেষ্টা, যে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল।

লাঠি, স্বর্ণের ময়ূরপুচ্ছ, সোনা-রোপার রাজকীয় ছত্র এবং রেশমের পাতা আবহকে তেলেসমাতি বানিয়ে তুলছিল। স্বর্ণের সারবান, হীরে খচিত কাষ্ঠফলক, পাথরে সজ্জিত সোফা ও সে সোফায় বসা দুর্ভাগা বাদশাহ উপবিষ্ট ছিল। আল হামরাকে সেদিন অতুলনীয় দেখাচ্ছিল।

কিন্তু হায়, এ সন্ধ্যাই ছিল আন্দালুসিয়ায় মুসলিম শাসনের শেষ সন্ধ্যা। এ ছিল অন্তিম হেঁচকি। সুযোগ যখন হারিয়ে যায় তখন ফায়সালা দেওয়ার অধিকার, সম্মান এবং শক্তিও চলে যায়। অতএব, আবু আবদিল্লাহ (বু আবদেল)-এর এই শেষ আকুতিও প্রত্যাখ্যাত হয় যে, পতনের স্বাক্ষরস্বরূপ গ্রানাডার চাবি-প্রত্যর্পণ-অনুষ্ঠান আল হামরায়ই হবে। ইসাবেলা তার এ আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে আল হামরার বাইরে দেয়ালের কাছে পতনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সে তার স্বামী ফার্দিনান্দ, প্রিন্স ডন, সেনাবাহিনী, বিজয়ী সৈন্যদল, আমির-ওমারা এবং উপদেষ্টাদের নিয়ে গ্রানাডার চাবি গ্রহণের জন্য মঞ্চে এসে পৌঁছে। সাথে ছিল ধর্মীয় উপদেষ্টা কর্ডিনাল হারনান্দ ও টালাবিরা এবং ইতালির সমুদ্র-অভিযাত্রী অতিথি ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তাকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। কলম্বাস তার দিনলিপিতে সে রাতের কথা লিখতে যেয়ে বলে—

> 'আমি দেখতে পাচ্ছি আল হামরার সর্বোচ্চ মিনারে ইসাবেলার রাজকীয় প্রতীক ক্ষমতার জোরে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর মুসলিম (মুর) বাদশাহ আবু আবদিল্লাহকে শহরপ্রাচীরের দরজার পাশে সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা এবং সম্রাট ফার্দিনান্দের হাতে চুমো খাচ্ছে।'

খ্রিষ্টান সম্রাটের দেওয়া অঙ্গীকারের উপর আবু আবদিল্লাহর আস্থা ছিল প্রবল। তখনো গ্রানাডা-চুক্তি লেখার কালি শুকায়নি, ইতোঃমধ্যে ফর্দিনান্দের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়—গ্রানাডা চুক্তি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সাথে সাথে মুসলমানদের জন্য স্পেন এমন সংকীর্ণ হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সেখান থেকে জোরপূর্বক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জারি করা হয়।

কোথায় মুসলমানদের হেফাজতের সেই চুক্তি ও তার দফাসমূহ এবং কোথায় ১৬০৯ সালের বেদখল করার নির্দেশনামা? চুক্তিপত্রে যে সুন্দর ও কল্যাণকর দফাগুলো লেখা ছিল, তা কার্যক্ষেত্র থেকে এমনভাবে উবে যায়, যেন কোনো কালে এখানে এমন কিছু লেখাই ছিল না। মুসলমানদের উপর ইসলাম পরিত্যাগ অথবা খ্রিষ্টাবাদ গ্রহণের জন্য সবধরনের চাপ অব্যাহত রাখা হয়। ১০ বছর চাপের ভেতর অতিবাহিত হয়। কিন্তু এরপর মুসলমানদের দৃঢ়তা তাদের সহ্যের বাইরে চলে গেলে ইসাবেলার পাশে গোঁড়া খ্রিষ্টাবাদীদের ভিড় ক্রমশ বাড়তেই থাকে। তারা তাকে

মুসলমানদের ব্যাপারে কঠোর হবার দাবি জানায়। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল টলেডোর পোপ এবং ইনকুইজিশন আদালতের দায়িত্বে থাকা কার্ডিনাল জিমিনেস। জিমি ছিল ইসাবেলার অতি কাছের একজন। সে তাকে মুসলমানদের জোরপূর্বক বিতাড়ন অথবা ব্যাপ্টিস্টকরণের জন্য মন্ত্রণাদান অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে সে তাকে নিজ মতে নিয়ে আসে। অবশেষে ইসাবেলার স্বাক্ষরিত নির্দেশে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৫০২ সালে নির্দেশ জারি হয়—'স্পেনে বসবাসরত মুসলমানরা হয় ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করে খ্রিষ্টান হবে, অথবা দেশ ছেড়ে চলে যাবে ' তৃতীয় কোনো রাস্তা রাখা হয়নি। নতুন এ বিপদ অতীতের সব বিপদ থেকে ছিল কঠিন।

এই সেই ইসাবেলা, যার স্বাক্ষরে গ্রানাডা পতনের চুক্তিতে মুসলমানদের জীবন, সম্পদ, সম্মান-সম্ভ্রম হেফাজতের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব আইন প্রয়োগের অধিকার রাখা হয়েছিল। যাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছিল। যাদের সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—তারই স্বাক্ষরে মাত্র ১০ বছর পর গ্রানাডা চুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ফরমান জারি করা হয়। ইসাবেলার এ ফরমানের পর ১০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও মুসলমানদের দৃঢ়তার মধ্যে যেমন কোনো তফাৎ আসেনি। তেমনি তাদের পা টলে উঠেনি। যদিও প্রাণ বাঁচাতে কেউ কেউ বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়, তথাপি সে অন্তরে অন্তরে মুসলমানই থেকে যায়। এই ১০০ বছর মুসলমানদের উপর দিয়ে এমন অমানুষিক নির্যাতন চলে, যার উদাহরণ মানবেতিহাসে নেই বললেই চলে। মুসলমানদের উপর জুলুম ও বর্বরতার ১০০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও খ্রিষ্টান হওয়ার হার মোটেও বাড়েনি। ফলে খ্রিষ্টাবাদের তুণীরের শেষ তিরটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৬০৯ সালে জোরপূর্বক স্পেনকে মুসলিমশূন্য করার ফরমান জারি হয়।

১৬০৭ সালে স্পেনের শাসন দেউলিয়া হয়ে যায়। অর্থনৈতিক এ মন্দা স্পেনের বাদশাহ ফিলিপ ৩য়-এর মানসম্মান খুইয়ে ফেলে। স্পেন ইউরোপের কাছে ভিখারিতে পরিণত হয়ে উঠে। মুসলমানদের জোরপূর্বক বহিষ্কারের মাধ্যমে ফিলিপ এক তিরে দুই শিকার হাতিয়ে নেয়। প্রথমত; স্পেনের সাধারণ জনতার এবং ইউরোপের দৃষ্টি তার শাসনের দুর্বলতা থেকে ভিন্নখাতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত; মুসলমানদের জোরপূর্বক বহিষ্কারের মাধ্যমে তাদের অধীনে থাকা বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তির মালিকানা সরকারের কর্তৃত্বে এসে যায়। এর মাধ্যমে কেবল অর্থনৈতিক মন্দাই দূর হয়নি; বরং সে ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের মুক্তিদাতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। বিশেষ করে খ্রিষ্টবাদের কেন্দ্র ভ্যাটিকেন সিটি কর্তৃপক্ষ তাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানায়। ১৯ এপ্রিল ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপ তৃতীয় (১৫৯৮-

১৬২১) স্পেন থেকে মুসলমানদের জোরপূর্বক বহিস্কারের নিম্নোক্ত ফরমান জারি করে—

বাদশাহ ফিলিপ ৩য়-এর পক্ষ থেকে গ্রানাডার সম্মানিত খ্রিষ্টান পুরোহিত, শহরের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের নামে :

* এই নির্দেশ জারি হবার তিন দিনের ভেতরে সকল মুসলিম নর-নারীকে তাদের সন্তানাদিসহ সরকার-নির্দেশিত জায়গায় একত্রিত হতে হবে। তারা নিজেদের সাথে বহনযোগ্য সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। উপকূলে থাকা কিছু জাহাজ তাদেরকে কোনো প্রকার অসদাচরণ ব্যতিরেকে বারবারদের দেশে রেখে আসবে।

* সফরকালে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা হবে। তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী যেকোনো ধরনের সম্পদ সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে; তবে এ ফরমানের বিরোধিতাকারীদের বিনা বিচারে হত্যা করা হবে।

* মুসলমানদের জেনে রাখা উচিত যে, বাদশাহ ফিলিপ ৩য়-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—কেবল মুসলমানদের দেশ থেকে বহিস্কার করা। তাদেরকে কোনো প্রকার হেনস্তা করা বা অত্যাচার করা উদ্দেশ্য নয়।

* আফ্রিকা পৌঁছার পর ১০ জন মুসলমান স্পেনে এসে এ স্বাক্ষ্য দিতে পারবে যে, সফরকালে তাদের সাথে কোনো প্রকার অসদাচরণ করা হয়েছে কি না।

ওয়াহ! এই কথাগুলোই আমেরিকানরা মাজার-ই শরিফ থেকে তালেবানদের বহিষ্কার করার সময় বলেছিল। কী অদ্ভুত সাদৃশ্য!

এই হুকুমনামায় স্বাক্ষর হবার সাথে সাথে স্পেনের মুসলমানদের হত্যার বাজার গরম হয়ে যায়। প্রায় ৩ লাখ মুসলমানকে তাদের ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে ভেড়া-বকরির মতো উপকূলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রখ্যাত গবেষক ডব্লিউ সি ব্রাউনিলি এ সংখ্যাকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন। তথাপি তার দেওয়া তথ্য জোরপূর্বক বহিষ্কৃত মুসলমানের সংখ্যা ৩ লাখের আনুমানিক অঙ্ককে সত্যায়ন করে—

'গ্রানাডা থেকে উপকূলের রাস্তায় কবরের সংখ্যা অগণিত হবার পরও আফ্রিকাযাত্রীদের সংখ্যা তিন লাখের কম ছিল না। এ পথের যাত্রীরা ছিল হতভাগা। তাদের কাছে না ছিল সময়, না ছিল কোনো অবকাশ। অবকাশ তারা নিজেরাই ধ্বংস করেছিল আর সময় তো ছিল আপন পথে বহমান। তাদেরকে এই বিভীষিকাময় উপত্যকা থেকে বের হবার

এবং মৃত্যুর বেড়া ভাঙার জন্য মাত্র ৭২ ঘণ্টার সময় দেওয়া হয়েছিল। তাদের কষ্ট ছিল বর্ণনাতীত। পরীক্ষা ছিল আগুনের চেয়েও ভীষণ এবং চাল ছিল হাশরের মতো দিশেহারাকারী। যারা তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা নিহতের কবর খোদাই করতো না; বরং ওদের দিয়ে খোদাই করে তাতে ফেলে দিত। ওদের হাতে থাকত লোহার কালাই লাগানো বর্শা। এরা তা দিয়ে ঝনঝন শব্দ তুলে ওই হতভাগাদের হাঁকিয়ে নিত। কেউ সামান্য পিছনে পড়লেই পেছন থেকে তার ঘাড়ে বর্শা ছুড়ে মারা হতো। ফলে ওই ব্যক্তির মস্তক ঘাড় থেকে এমন দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত যে, সে কালেমা পড়ার অবকাশটুকুও পেতো না।'

আন্দালুসিয়ার পতনে এই প্রথম হাজার বছরের মধ্যে ইসলামের উপর খ্রিষ্টবাদের, সহাবস্থানের উপর বংশগত বৈষম্যের এবং উদারতার উপর সংকীর্ণ মনোবৃত্তির বিজয় সাধিত হয়। এ বিজয় ছিল অত্যন্ত রক্তাক্ত। এর পরিণাম ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।

আন্দালুসিয়ার বিপর্যয়ে মুসলমানরা যে পরীক্ষা, যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির এবং যে পরাজয়ের শিকার হন, এর মর্সিয়াগাঁথায় বিখ্যাত কবি আবুল বাকা রানদি একে 'কেয়ামত' বলেছেন। তিনি বলেছেন—'মুসলিম উম্মাহ এটা কখনো ভুলতে পারবে না।' পতনের উপর আবুল বাকার শোকগীতি অত্যন্ত বেদনামাখা যে, তা যেকোনো অন্তরকে নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই জঘন্য মনোবৃত্তির কী জবাব আছে যে, পতনের কাফন ময়লা হবার আগেই মিসর, সিরিয়া এবং তুর্কির রাষ্ট্রদূতগণ ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দকে কে কার আগে ধন্যবাদ জানাবেন—সে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন।

আন্দালুসিয়ার পতনকে যে উম্মাহ-দরদি কবি 'কেয়ামত' বলেছেন এবং বলেছেন—'তা ভুলা যাবে না'; তাতে তিনি ভুল করেছেন বলেই মনে হয়। কেননা, বিস্ময়করভাবে এই শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে আমরা তিলপরিমাণ শিক্ষাও গ্রহণ করিনি। যদি শিক্ষাগ্রহণ করা যেত, তাহলে উম্মাহ আরও পতন, আরও শরণার্থী হওয়া, আরও হিজরত করার মুখোমুখি হতো না। প্রথম শিক্ষা তো এই ছিল যে, স্পেনীয় খ্রিষ্টানদের স্বভাব বুঝে তাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতাম। ভাবতাম, আমেরিকান খ্রিষ্টানরা কাদের উত্তরাধিকার?

আমেরিকা সেই সমস্ত মানুষের আবাসভূমি, যাদের স্বভাবে নেই কৃতজ্ঞত। যাদের মধ্যে রয়েছে লোভ-লালসা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির উন্মাদনা। এরা সেই লোকগুলোর উত্তাধিকার, যারা নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশে পৌঁছার পর সেখানকার বিপুল

ভূসম্পত্তি, ফল-ফসল এবং জীবিকার বিপুল সম্ভার ভোগ করার অবারিত সুযোগ পাবার ভিত্তিতে কৃতজ্ঞতার বিপরীতে অধিক সোনারোপা এবং ধন-সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে লুটতরাজ এবং হত্যার বাজার গরম করে তুলেছিল। আমেরিকার ভূখণ্ডে স্পেনীয়দের হাতে কৃষিখেত দখল, স্থানীয় অধিবাসীদের ধ্বংস এবং সম্পদ সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার যে ভিত্তি রাখা হয়েছিল, তা মাত্র ২০০ বছরের ভেতরে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমান আমেরিকার সমাজ এবং অর্থব্যবস্থা ঠিক কলম্বাসীয় যুগের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিই, তাদেরকে ত্রাতা মনে করি; তাহলে আমাদের এই সরলতার উপর কেউ কিছু বলুক আর না-ই বলুক; আমাদের আত্মহত্যার জন্য আমরা অন্য কাউকে দোষ দিতে পারব না।

আবু আবদিল্লাহ যেভাবেই হোক নিজের জান বাঁচিয়ে নিয়েছিল; কিন্তু তার পরিণতি কী হয়েছিল? সে ঘটনা তো বড়ই শিক্ষণীয়। তারিক বিন জিয়াদ বলেছিলেন—'হে আমার সঙ্গী-সাথি! পলায়নের কোনো পথ নেই। তোমাদের পিছনে উর্মিমুখর সাগর আর সামনে অগণিত শত্রু। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারি—তোমাদের কাছে আছে কেবল ইখলাস এবং ধৈর্য।'

আবু আবদিল্লাহর কাছে যেমন ইখলাস ছিল না, তেমনি ছিল না ধৈর্য। একইভাবে ছিল না পলায়নেরও কোনো রাস্তা। সে পথ তৈরি করতে করতে নিজেই পথ ভুলে গিয়েছিল। যে জায়গিরের আশায় সে গ্রানাডা দিতে রাজি হয়েছিল, তা তার কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যে সম্মান ও প্রতিপত্তির জন্য সে এই জঘন্য পথ অবলম্বন করেছিল; এর পরিণাম কী দাঁড়িয়েছিল?

১৪৯৬ সালে তাকে আন্দালুস থেকে বিতাড়িত করা হলে সে মরক্কোয় তার এক দুধ-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ওখানে বসবাস করতে থাকে। এরপর সেই মেজবানের পক্ষ হয়ে ১৫৩৬ সালে এক যুদ্ধে লিপ্ত হলে বাকুবা নদীর তীরে এমন অবস্থায় নিহত হয়ে পড়ে থাকে যে, বাকুবা নদীর এক বাঁকে তার লাশ অসহায়ের মতো পড়ে ছিল। স্বদলের যেসব ঘোড়া এবং সৈন্য নদী পার হবার ইচ্ছা করছিল, তারা তার লাশকে পদদলিত করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।[৬৭] তার বিবেচনা তাকে উল্টো পথে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তাতে বিভ্রান্তির পথিক হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

এখানে এসে ইতিহাস আমাদেরকে একই সাথে বীরত্ব, আত্মমর্যাদা, ইখলাস এবং চক্রান্ত ও আত্মপূজার বরাতে ভিন্নমুখি দুই পথ দেখায়। প্রথম পথের শুরু হয়েছিল মাত্র ১২ হাজারের ছোট্ট একটি বাহিনী লক্ষাধিক সিপাহীর বিশাল বাহিনীকে গাজর

[৬৭] *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*: ৪/২৮৭, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইনান।

AMERICA

মার মুলোর মতো কেটে রেখে দিয়েছিল। আর শেষ পথে ৩৫ হাজারের বড় একটি বাহিনীর কাছে বিপুল অস্ত্র মজুদ থাকার পরও হতভাগা ভীরু বাদশাহর কারণে লড়াই না করে গ্রানাডার চাবি নত মস্তকে অপরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

আন্দালুসিয়ার ঘটনায় কেবল এইটুকু জেনে রাখুন যে, সময় লেগেছিল মে মাসের শুরু থেকে মে মাসেরই শেষ পর্যন্ত। এটা ভিন্ন কথা যে, মাসের শেষ আসতে ৮০০ বছর লেগেছিল। তারিক বিন জিয়াদ তাঁর বাহিনীকে যে কথা বলেছিলেন, তা তখন ঐশী কথা মনে হচ্ছিল না। কিন্তু ৮০০ বছর পরে যখন আন্দালুসিয়া থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়, তখন ইবনে জিয়াদের কথাগুলো বাস্তব সত্য এবং ঐশী হয়েই প্রকাশ পায়। সত্যিই মুসলমানদের পলায়নের কোনো পথ ছিল না। তাদের সামনে ছিল উত্তাল সাগর আর পেছনে ছিল খোদার গজব হয়ে ধাওয়াকারী শত্রু। এদের থেকে ধৈর্য উদাও হয়ে গিয়েছিল এবং এদের অন্তকরণে ইখলাসের বসবাস করার মতো কোনো জায়গা ছিল না। তাই ইবনে জিয়াদের আশঙ্কাই বাস্তবায়িত হয়। তারা দলে দলে নিহত হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরে ডুবে মরে। কালেমা পাঠকারী মুসলমান আন্দালুসিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

২২ সেপ্টেম্বর ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে ভ্যালেন্সিয়ার খ্রিষ্টান বাদশাহ ফিলিপ ৩য় যখন আন্দালুসিয়া থেকে মুসলমানদের জোরপূর্বক বিতাড়নের নির্দেশ জারি করে, তখন তাদেরকে আন্দালুসিয়া ছাড়ার জন্য মাত্র তিন দিনের সময় দেওয়া হয়। প্রায় ৯০০ বছরের আধিবাসীদের দেশ ছাড়ার জন্য মাত্র তিন দিনের সময় প্রদান ছিল একটা উপহাস্য ব্যাপার। এই সময়টুকু বের হওয়ার ছিল না, ছিল নিহত হবার অথবা ডুবে মরার। সত্যিই তাদের বেশিরভাগ নিহত হয়। আর যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে সাগর গিলে ফেলে। মোটকথা, ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনভূমি মুসলমানদের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে যদি আল্লাহর আইন অমান্য প্রকাশ পায়, তাহলে এর শাস্তি পুরো জাতিকে ভোগ করতে হয়। আল্লাহ করুক—সে সময় যেন আবার ফিরে না আসে। অবকাশ শেষ হবার আগেই যেন আল্লাহ তাওবার তাওফিক দান করেন এবং মোহর লাগার পূর্বেই যেন আল্লাহ ভুল থেকে ফিরে আসার তাওফিক দান করেন। আমিন।

লাঞ্চিং : আমেরিকার জাতীয় খেলা

পৃথিবীর প্রতিটি জাতীয় প্রতীক, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফুল, জাতীয় ফল, জাতীয় কবি, জাতীয় অধ্যাপক ইত্যাদির মতো জাতীয় খেলাও সুনির্দিষ্ট থাকে। আমেরিকাকে পৃথিবীর সবচে উন্নত রাষ্ট্র মনে করা হয়। কিন্তু জানেন, আমেরিকার জাতীয় খেলা কী? আমেরিকা-সংক্রান্ত বই পড়লে কিংবা ইন্টারনেটের গভীরে ঢুকলে বর্তমান জাতীয় খেলা বেসবলের বাইরে ভিন্ন এক সত্য প্রকাশ হয়ে ওঠে। আমরা আপনাদেরকে সে খেলার সাথে পরিচিত করাব, যা একসময় আমেরিকাবাসী খুব আগ্রহসহকারে খেলে থাকত। এখন যদিও বাহ্যত এই খেলার উপর বিধিনিষেধ আছে; কিন্তু মানুষের প্রবল আগ্রহকে কি বিধিনিষেধ আটকে রাখতে পারে? আমেরিকানরা সুযোগ পেলেই কোনো না কোনোভাবে তাদের সে খাহেশ মিটিয়ে থাকে। এই খেলার নিয়মকানুন এবং হার-জিতের বিস্তারিত জানার জন্য 'জিম ক্র' আইনটি জেনে রাখা দরকার।

১৮৬০ থেকে ১৯৬০ (জি হ্যাঁ, ১৯৬০) সাল পর্যন্ত যখন আমেরিকা মুসলিমবিশ্বে মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে অস্থির ছিল, ঠিক সে সময় পুরো আমেরিকায় এমন একটি চরম লজ্জাজনক মানবতাবিরোধী আইন চর্চিত হচ্ছিল, পৃথিবীর কোথাও যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই আইনের প্রেক্ষাপট হলো—আমেরিকায় একটা অতি লজ্জাজনক ব্যবসা প্রচলিত ছিল। ব্যবসাটা হচ্ছে আফ্রিকার মৌরিতানিয়া, তাঞ্জানিয়া, কঙ্গো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, এঙ্গোলা, সেনেগাল, ঘিনি, গায়ানা, ঘানা, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে অপহরণ করে নিয়ে এসে জোরপূর্বক দাস বানিয়ে তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করা।

ইসলামে দাসপ্রথার অস্তিত্ব আছে। তবে ইসলামে দাস-সংক্রান্ত বিধান এবং নির্দেশাবলি এত উন্নত যে, যুদ্ধবন্দিদের জন্য এরচে উন্নত, এরচে মানবিক আইন মনুষ্য ইতিহাসে না কখনো রচিত হয়েছে, না ভবিষ্যতে রচনা করা সম্ভব। অথচ ইসলামের দাসবিধির উপর অভিযোগ উত্থাপনকারীদের পালের গোদা আমেরিকার অবস্থা ছিল—তারা স্বাধীন মানুষকে শক্তির জোরে অপহরণ করে নিয়ে এসে বাজারে তুলত। আমেরিকায় যখন গোলামদের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে[৬৮] এবং ঘৃণ্য এই দাসপ্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ ওই শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেও তাদের অন্তরে

[৬৮] এই আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল সেইসব মুসলমান, যাদেরকে আফ্রিকা থেকে জোরপূর্বক উঠিয়ে এনে দাস বানানো হয়েছিল।

লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িকতা ও অহমবোধ তাদেরকে মনুষ্যভ্রাতৃত্বের আঙিনায় গন্য করতে ব্যর্থ হয়। ইসলামে দাস অবস্থায়ও একজন মানুষ সমাজের ইমাম এবং সেনাপতি হবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্বের দাবিদার আমেরিকা তার দেশের স্বাধীন হওয়া দাসদের ব্যাপারে যে কালাকানুন তৈরি করে, তা আমেরিকানদের জন্য লজ্জাজনক না হলেও মানবতার জন্য অবশ্যই চরম লজ্জাজনক। এই কানুনের নাম ছিল 'জিম ক্র'। আর এ কালাকানুনের ঔরষ থেকে যে অমানবিক খেলার জন্ম হয়, সেটাই আমাদের আজকের আলোচ্যবিষয়।

আসুন, নির্দয়-নিষ্ঠুর আমেরিকান ভদ্রজন-প্রণীত *মানবতার প্রতি সম্মান* শিরোনামে রচিত প্রগতিশীল চিন্তাধারার স্বাক্ষর আইনটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখি। 'জিম ক্র' আইনটি আমেরিকান আইনপ্রণেতারা রচনা করে সংসদে উত্থাপন করেন এবং যথারীতি চুলছেঁরা বিশ্লেষণের পর আইনটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ঐকমত্যে পাশ হয় এবং ১৯৬৫ থেকে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে আইনটি আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় কার্যকর হয়। আইনে তাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হলেও নিম্নোক্ত দফাগুলো একটু দেখে নিন :

* কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াতে পারবে না। কারণ, এতে সামাজিক সমতা প্রকাশ পায়।
* কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ শ্বেতকায় নারীর প্রতি হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াতে পারবে না। কারণ, একে জোরপূর্বক ব্যভিচার হিসেবে গন্য করা হয়।
* কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গরা একত্রে বসে পানাহার করতে পারবে না। জরুরি অবস্থায় এমনটা করতে হলে খাদ্যবণ্টনে শ্বেতাঙ্গদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি উভয় দলের মধ্যখানে আড়ালের ব্যবস্থা করতে হবে।
* কোনো অবস্থায়ই কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ শ্বেতাঙ্গ নারীর সিগারেট জ্বালানোর জন্য লাইটার জ্বালিয়ে ধরতে পারবে না।
* কৃষ্ণাঙ্গদের সর্বাবস্থায় শ্বেতাঙ্গদের কাছে পরিচয় দিতে হবে; কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গকে কখনো কোনো কৃষ্ণাঙ্গের কাছে পরিচিতি পেশ করতে হবে না।
* শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য কোনো সম্মানসূচক বিশেষণ ব্যবহার করতে পারবে না; বরং তাদেরকে নাম ধরে ডাকা হবে। তবে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের স্যার, মিস্টার, মিসেস, ম্যাডাম প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করবে।
* কোনো শ্বেতাঙ্গ গাড়ির চালক হলে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ তার পাশে বসতে পারবে না; বরং পেছনের সিটে বসবে।
* শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভারকে আগে যাওয়ার অগ্রাধিকার থাকবে।

এ আইনগুলো ছাড়াও রাজ্যপর্যায়ে এমনসব আইন প্রণয়ন করা হয়, যা গোত্র ও বর্ণবৈষম্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। দেখুন :

* কোনো কৃষ্ণাঙ্গ নাপিত কোনো শ্বেতাঙ্গ নারী কিংবা অল্পবয়সী বালকের চুল কাটতে পারবে না। (জর্জিয়া)
* অন্ধদের হাসপাতালে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ অন্ধকে একত্রে রাখা যাবে না; বরং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এর জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। (লুজিয়ানা)
* শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের আলাদা জায়গায় দাফন করতে হবে। অর্থাৎ, এক কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করা যাবে না।
* কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মুসাফিরের জন্য আলাদা টিকেট, আলাদা কক্ষ, আলাদা বসার জায়গা, আলাদা বিশ্রামকক্ষ, আলাদা গোসলখানা, আলাদা শৌচাগার থাকবে। (আলবামা)
* কোনো শ্বেতাঙ্গ কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বালককে দত্তক নিতে পারবে না। অনুরূপ কোনো শেতাঙ্গ বালককে কৃষ্ণাঙ্গ বালকের দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করা যাবে না। (দক্ষিণ ক্যারোলিনা)
* কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ বাচ্চাদের স্কুল হবে ভিন্ন। উভয় শ্রেণিকে একই ছাদের নিচে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। (ফ্লোরিডা)
* লাইব্রেরিসমূহে কৃষ্ণাঙ্গরা কেবল তাদের জন্য নির্ধারিত আসনে বসতে পারবে। (উত্তর ক্যারোলিনা)
* মানসিক হাসপাতালগুলোতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের একত্রে রাখা যাবে না। (জর্জিয়া)
* রাজ্যভিত্তিক সেনাবাহিনীতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বসবাসের স্থান হবে আলাদা। উভয় শ্রেণি একই জায়গায় কাজ করতে পারবে না। তবে কৃষ্ণাঙ্গ ইউনিটে বাধ্যতামূলকভাবে শ্বেতাঙ্গ অফিসার রাখতে হবে। (উত্তর ক্যারোলিনা)
* হাসপাতালের যেসব ইউনিটে কৃষ্ণাঙ্গরা ভর্তি হবে, সেখানে শ্বেতাঙ্গ নার্স রাখা যাবে না। অনুরূপ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বন্দিকে আলাদা স্থানে রাখতে হবে। উভয় শ্রেণির বাসস্থানের মধ্যখানে যথেষ্ট স্পেস রাখতে হবে। (মিসিসিপি)
* সংশোধনমূলক স্কুলগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে আলাদা রাখতে হবে। (কেন্টাকি)

* যেসব শিক্ষককে শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের একত্রে বসিয়ে পড়াতে পাওয়া যাবে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। (ওকলাহোমা)
* কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ পরস্পর বিলিয়ার্ড খেলতে পারবে না। (আলবামা)
* হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ পাশাপাশি বসে আহার করতে পারবে না। তাদেরকে আলাদা আলাদা বসতে হবে। (আলবামা)
* কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ স্কুলগুলোর একটির বইপত্র অন্যটিতে পাঠানো যাবে না। বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের বইপত্র তার স্কুলেই থাকতে হবে। (উত্তর ক্যারোলিনা)
* সিনেমা হল, সার্কাসসহ সবধরনের বিনোদনকেন্দ্রে প্রবেশ এবং বাহির হবার দরজা, বসার জায়গা, কক্ষ প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য পৃথক থাকতে হবে। (লুজিয়ানা)
* যেসব বাসাবাড়িতে শ্বেতাঙ্গ থাকে, সেগুলো কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে ভাড়া প্রদান শাস্তিজনক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। (লুজিয়ানা)
* কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য আলাদা লাইব্রেরি থাকবে। তারা শ্বেতাঙ্গদের লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হতে পারবে না। (টেক্সাস)
* কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষের মধ্যে আত্মীয়তা এবং বৈবাহিক সম্পর্ক থাকতে পারবে না। (ম্যারিল্যান্ড, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, অ্যারিজোনা)[৬৯]

'জিম ক্র' আইনের প্রয়োগ অত্যন্ত শক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে এ আইন লঙ্ঘন করতে পাওয়া গেলে[৭০] এদের উপর 'জিম ক্র' আইন লঙ্ঘনের শাস্তি আরোপ করা হতো। শ্বেতাঙ্গদের জন্য কৃষ্ণাঙ্গদের উপর নিজের তরফ থেকে আইনপ্রয়োগ বৈধ ছিল; বিধায় শ্বেতাঙ্গরা এসব অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের শাস্তি প্রদান করতো। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য জবানবন্দির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কেননা, 'জিম ক্র' আইনের পুলিশ, জজ, আদালত সবকিছুই হতো শ্বেতাঙ্গদের মধ্য থেকে। তাই একদিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত থাকায় কৃষ্ণাঙ্গদের যেমন আইন লঙ্ঘনে উত্তেজিত করতো, অপরদিকে শ্বেতাঙ্গরা নিজেদেরকে ন্যায়বিচারক মনে করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি আরোপ করতো। এই শাস্তির ভয়ানকতম পর্যায়কেই বলা হতো 'লাঞ্চিং'।

---

৬৯ *ন্যাশনাল হিস্টারিক স্টাফ লস্ট* : ১৯৯৮।

৭০ যেমন : শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে পানি পান করা, কিংবা নিজ ধারণামতে সত্য রায় প্রদান করা, কোনো শ্বেতাঙ্গদের সাথে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়ানো।

লাঞ্চিং ছিল ১৮৭০ এর দশকে 'জিম ক্র' আইনের বিরুদ্ধাচারী কৃষ্ণাঙ্গদের শাস্তিদানের জন্য শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক উদ্ভাবনকৃত ভয়ঙ্কর খেলা। এই শ্বেতাঙ্গ লাঞ্চিং মাফিয়াচক্রের মধ্যে সেই লোকগুলোই যুক্ত ছিল, যারা শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতো এবং নিজেদেরকে শ্বেতাঙ্গদের সাহায্যকারী মনে করতো। শহরে শহরে শ্বেতাঙ্গদের এই অপরাধীচক্র আইন নিজের হাতে তুলে নিত। এদের তাৎক্ষণিক বিচার ও তাৎক্ষণিক শাস্তি কার্যকর করার প্রেক্ষিতে পূর্ণ এক শতাব্দী আমেরিকা কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সাক্ষাৎ-জাহান্নাম হয়ে ওঠেছিল। ন্যায়বিচারের এই মাফিয়াচক্র যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রেফতার করে নিতে যেত। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের হত্যা করতো। ফাঁসি দেওয়ার পর ঝুলে থাকা লাশে আগুন ধরিয়ে দিত। আর পাশে বসে থাকা শ্বেতাঙ্গরা হাততালি দিয়ে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বিকৃত উল্লাসে মেতে উঠত। ফাঁসি দেওয়ার এই কাজকে তারা লাঞ্চিং বলত।

লাঞ্চিং পরিভাষাটি মূলত কর্নেল চার্লস লাঞ্চ-এর নাম থেকে গৃহীত। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫) চলাকালে কর্নেল লাঞ্চ কনফেডারেট আর্মির গোয়েন্দা, ব্রিটিশ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আমেরিকান ঐক্যের বিরোধীদের নিজের মতো করে শাস্তি প্রদান শুরু করেছিল। এখান থেকেই লাঞ্চিং নামটি গৃহীত হয় এবং তার শাস্তি প্রক্রিয়াই হচ্ছে লাঞ্চিং খেলার মূল প্রতিপাদ্য।

লাঞ্চিংয়ের নামে কৃষ্ণাঙ্গদের মতো হাজার হাজার সেইসব শ্বেতাঙ্গকেও জনসমক্ষে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়, যারা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কথা বলত কিংবা 'জিম ক্র' আইনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলত। এই শাস্তির মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পাশব হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতার বৈশিষ্ট্য উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। নাজুক দেহের শ্বেতাঙ্গ বালিকা, শ্বেতাঙ্গ শিশু, যুবক, প্রগতিশীল শিক্ষিত ও নিজেদের সভ্য দাবিদার বুদ্ধিজীবি-শ্রেণিসহ যারা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বলে দাবি করতো তারাও এই ঝুলে থাকা লাশগুলো দেখে বিকৃত উল্লাসে মেতে উঠত। এই লাশগুলোর গায়ে আগুন দিতে, থুতু ছুঁড়তে অন্য কারও থেকে পিছিয়ে থাকত না। তাই ওদের উত্তরসূরিরা যদি আফগানিস্তানে মানুষকে কন্টেইনারে ভরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু কিছু নেই। কেননা, এটা যে তাদের জাতীয় খেলা।

লাঞ্চিংয়ের ব্যাপারে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি লাঞ্চিংয়ের কারণ, পদ্ধতি, সরকারের প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক অবক্ষয় খুব ভালো করেই অনুমান করা যাবে।

১৯ জুলাই ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রবিন স্টিসি নামক একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে পুলিশ বিশাল দলের প্রহরায় মায়ামি (ফ্লোরিডা) জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শ্বেতাঙ্গ

ক'জন মাফিয়া তাকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মেরিন জোন্স নামক এক মহিলার ঘরের নিকটস্থ একটি বৃক্ষে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়ে দেয়। এই মেরিন জোন্সের অভিযোগের ভিত্তিতেই রবিন স্টিসিকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মেরিন জোন্সের অভিযোগ ছিল—রবিন সম্ভ্রম হরণের জন্য তার ঘরে ঢুকেছিল। পরে *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—রবিন স্টিসি মূলত ছিল একজন বাস্তুহারা কৃষক। সে ছোটখাটো জমি ভাড়া নিয়ে ফসল উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে মেরিন জোন্সের ঘরে খাবার সংগ্রহের জন্য ঢুকেছিল। মেরিন জোন্স তাকে ঘরে দেখে ভীত হয়ে চিৎকার শুরু করে দেয়। এ অপরাধে রবিন স্টিসিকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন তাকে লাঞ্চিং করে মেরিন জোন্সকে ইনসাফ উপহার দেওয়া হয়।[৭১]

রবিন স্টিসির বেদনাদায়ক ঘটনা সংবাদপত্রের ফিচারে এভাবে উঠে আসে—

> 'এলাকার জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বেশির ভাগ ছিল নারী ও শিশু। তারা লাঞ্চিংয়ের বিনোদন নেওয়ার জন্য এসেছিল। উঁচু ফ্যামেলির নারীদের সংখ্যাও ছিল বিপুল। যখনই নিগ্রো লোকটির লাশ মাটিতে ফেলা হয়, তখনই বিনোদনে অংশ নেওয়া লোকগুলো ফাঁসি দেওয়ার রশিটা উপহার হিসেবে গ্রহণের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পরে এটা গ্রহণের জন্য জোর প্রদর্শন শুরু হয়ে যায়। অবশেষে এক ফুটের মতো রশি চার ডলার মূল্যে আগ্রহী গ্রহীতাদের কাছে বিক্রয় করা হয়।'

বৃক্ষশাখায় ঝুলন্ত কৃষ্ণাঙ্গ লাশগুলোর জন্য আমেরিকার কোনো জায়গা নিরাপদ ছিল না। তাৎক্ষণিক বিচার এবং শাস্তিপ্রদানকারী শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের খুঁজে ফিরত। সবচে বর্বরতার বিষয়টি ছিল—লাঞ্চিংয়ের ক্ষেত্রে সবধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল ফাঁসি প্রদান। রুটি চোরকে যেমন ফাঁসি দেওয়া হতো, তেমনি শ্বেতাঙ্গদের দেখে সম্মান প্রদর্শনে দাঁড়ানো-ব্যর্থ ব্যক্তিকেও ফাঁসি প্রদান করা হতো। এককথায়, কৃষ্ণাঙ্গরা কোনো অবস্থায়ই নিরাপদ ছিল না। লাঞ্চিংয়ের জন্য শ্বেতাঙ্গদের সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলার অপরাধই যথেষ্ট ছিল। তাদেরকে না আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হতো, না নামমাত্র ইনসাফ করা হতো। এ অবস্থা প্রকাশ করতে চার্লটন গেজেট ১৯১৮ সালে তার এডিটোরিয়াল কলামে লেখে—

৬ নিউ ইয়র্ক টাইমস : ১৯৩৫।

'এই নিগ্রোদের কেন লাঞ্চ করা হচ্ছে? শ্বেতাঙ্গ জজ, শ্বেতাঙ্গ জুরি এবং শ্বেতাঙ্গ পুলিশের উপস্থিতিই তো যথেষ্ট ছিল। যে নিগ্রোর উপর শ্বেতাঙ্গের কোনো অভিযোগ থাকত, তার বেঁচে থাকার অধিকার থাকত না।'

চার্লটন গেজেট সম্পাদকীয় কলামে কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের লাঞ্ছিংয়ের বিষয়ে লেখে—

'এমন দিন খুব কম যাচ্ছে যেদিন কোনো কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যের লাঞ্ছিংয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। তাদেরকে উর্দি পরা অবস্থায় লাঞ্চ করা হচ্ছে না। আজ কৃষ্ণাঙ্গদের নিরাপত্তা কোথায়?'

১৮৮২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আমেরিকায় ৪৭৪২ জন ব্যক্তিকে আইনবহির্ভূতভাবে অমানবিক পন্থায় লাঞ্ছিং করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ। ৭৮ শতাংশকে ফাঁসির পূর্বে জঘন্য পন্থায় টর্চার করা হয়েছে। ২১ শতাংশের লাশ ফাঁসির পর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাঁসির রশি তামাশায় উপস্থিত লোকরা উপহার হিসেবে সংরক্ষণের জন্য নিয়ে যেত।[৭২] লাঞ্ছিংয়ের শাস্তি পাবার জন্য প্রকৃত অপরাধী হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না; বরং কৃষ্ণাঙ্গদের কৃষ্ণভাগ্যের সাথে সময়ের প্রকোপের শিকার হওয়াই যথেষ্ট ছিল।

যখন কতিপয় দুঃসাহসী সংবাদকর্মী মৃত্যুর শাস্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গদের অপরাধের বাস্তবতা জনসমক্ষে নিয়ে আসে, তখন আমেরিকা থেকে নিয়ে পুরো ইউরোপে যেন ভূমিকম্প বয়ে যায়। যাদেরকে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের সম্ভ্রমহানীর অভিযোগ তুলে ফাঁসি দেওয়া হয়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা যায়—আসলে সম্ভ্রমহানী নয়; তাদের শরীর কৃষ্ণবর্ণ হওয়াই ছিল সবচে বড় অপরাধ। যে অপরাধে কৃষ্ণাঙ্গদের মানবেতিহাসের বর্বরতম শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে; এসব অপরাধের ভিত্তিতে অন্তত আমেরিকার আইনে মৃত্যুদণ্ডের কোনো কথা ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের জুলুম, নিষ্ঠুর আচরণ এবং অমানবিকতার ফলে যেসমস্ত কৃষ্ণাঙ্গদের লাঞ্চ করা হয়েছিল এবং তাদের উপর যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রখ্যাত আমেরিকান প্রকৌশলি জেমস কাটলার ১৯০৫ সালে আমেরিকার জাতীয় অপরাধ চিহ্নিত করতে গিয়ে লেখেন—'আমাদের দেশের জাতীয় অপরাধ হচ্ছে লাঞ্ছিং।'

জাতীয় ফুল, জাতীয় পাখি, জাতীয় সংগীত, এবং জাতীয় খেলার মতো লাঞ্ছিংকে জাতীয় অপরাধ সাব্যস্ত করা ছিল একটা দুঃসাহসিক কাজ। এমন একটা অপরাধ যা জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য, যা সন্ত্রাসবাদী মাফিয়াচক্র, রাজ্য সরকার, আদালত, পুলিশ এবং স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ দ্বারা সহযোগিতাপ্রাপ্ত; সর্বোপরি ফেডারেল

[৭২] *ইমেরি এন্ড ইমেরি*: ১৯৯৬।

আদালতও যেখানে দ্বাদশ খেলোয়াড়ের ভূমিকায়—এর বিরুদ্ধে কথা বলা নিঃসন্দেহে খুব সাহসের ব্যাপার। সর্বোচ্চ আদালত যে এর সাথে জড়িত ছিল, তার হাজার হাজার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সবচে বড় প্রমাণটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন, যার জবাব ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মার্কিন সরকারের উপর আবশ্যক ছিল। প্রশ্নটি লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যিক এবং সিভিল রাইটস এর লিডার পল রবিনসন প্রেসিডেন্ট ট্রুমেনকে উঁচু আওয়াজে জনসমক্ষে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যার উত্তর আজও লজ্জাজনক উত্তর হিসেবেই আছে। র‍্যালি

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রি. মিডসন স্কয়ার গার্ডেন নিউ ইয়র্কের এক প্রতিবাদী র‍্যালির উদ্দেশে মিস্টার রবিনসন প্রশ্ন করেছিলেন—

> 'মাননীয় প্রেসিডেন্ট! আপনি লাঞ্চিংয়ের ব্যাপারে কী বলেন? আপনি এই ব্যাপারে কিছু বলতে অক্ষম কেন? ফেডারেল সরকার অবশেষে কখন এমন পদক্ষেপ নেবেন যার ফলে আমাদের আইনি অধিকার সংরক্ষণ হবে। এদেশের রাষ্ট্রনায়ক যদি বন্দরের চাকরিজীবী এবং রেলওয়ের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আর্মি এবং নেভি তলব করতে পারেন তাহলে লাঞ্চিংকারীদের (ফাঁসি-দাতাদের) বিরুদ্ধে কেন আর্মি ও নেভি নামাতে পারবেন না?'

পল রবিনসন যে প্রশ্নের জবাব জানতে চাইছিলেন সেটির উত্তরের কোনো দরকার নেই। কেননা, প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুমেন পূর্বতন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের জবাব আগেই দিয়ে ফেলেছিলেন। রুজভেল্ট বলেছিলেন—

> 'লাঞ্চিংয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে শ্বেতাঙ্গরা ক্ষেপে উঠবে। ফলে আমি নির্বাচনে হেরে যাব।'

আমেরিকায় লাঞ্চিংয়ের শেষ বড় ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া শহরে। উক্ত ঘটনায় চারজন কৃষ্ণাঙ্গকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর পন্থায় হত্যা করা হয়। তবে ১৯৪৬ উত্তর আমেরিকা থেকে লাঞ্চিং শেষ হয়ে যাবার পর আমেরিকানরা অন্যান্য দেশে তাদের এই জাতীয় খেলা অব্যাহত রাখে। যেহেতু আমেরিকান আইনে আমেরিকার বাইরে লাঞ্চিং কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়; এ জন্যেই যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি তাদের জাতীয় খেলার বলি হয়ে চলছে। ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, আফগানিস্তান এবং ইরাককে যেভাবে Lynchized করা হয়েছে, তা ইতিহাসের পাতাসহ মানুষের স্মরণের অ্যালবামে ইনশাআল্লাহ সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে সেই সময় অবশ্যই একদিন আসবে, যেদিন এই খেলায় অংশ নেওয়া আমেরিকান খেলোয়ারদের জবাবি ইনিংস খেলার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

অশ্রুর মহাসড়ক

আমেরিকা নিজেদেরকে মানবাধিকারের চ্যাম্পিয়ন প্রবক্তা হিসেবে দাবি করে থাকে। তবে মানুষ অপেক্ষা মানবাধিকার নিয়েই তাদের যত চিন্তা। আমেরিকা পৃথিবীর অনেক জাতির মানবাধিকার রক্ষার নামে তাদের সবধরণের অধিকার পদদলিত করেছে। পৃথিবীতে যতদিন মানবতা ও মনুষ্যত্ব শব্দ দুটো ব্যবহৃত হতে থাকবে প্রকৃত মানবতা ও মনুষ্যত্ব লজ্জায় অধোবদন থাকবে। এখানে খোদ আমেরিকায় আমেরিকানদের কৃতকর্ম মানবাধিকারের প্রশ্নে কেমন—তা একটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হবে। এ জন্যে আমাদেরকে আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের কেলাহোঁ বস্তি থেকে একটু ঘুরে আসতে হবে। সেখানে আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে অদ্যাবধি সর্বকালের সবচে ঘৃন্যতম বেদনাদায়ক ঘটনার খোঁজ নিতে হবে।

৬ জুন ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ টেনেসি রাজ্যের কেলাহোঁ বস্তিতে সূর্য তো উদিত হয়েছিল; কিন্তু লজ্জায় লাল চেহারা নিয়ে। সেই লজ্জামাখা সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন সে তার পেছনে ছেড়ে যায় রাশি রাশি অন্ধকার। এত কালো অন্ধকার যে, আমেরিকান ইতিহাসের এই অন্ধকারের বর্ণনা দিতে কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন।

রেড ইন্ডিয়ানদের ভূখণ্ডে স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হবার পর ২৬ মে ১৮৩০ খ্রি. আমেরিকা ২১ তম কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের উপর চাপ প্রয়োগ করে সেখান থেকে তাদের জোরপূর্বক বহিষ্কারের জন্য 'স্থানান্তর অ্যাক্ট' পাশ করিয়ে নেয়। আর তা বাস্তবায়নের ভার প্রেসিডেন্টের উপর অর্পণ করে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রেসিডেন্ট মার্টিন ভ্যান বিউরেন কংগ্রেস কর্তৃক প্রাপ্ত অধিকার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। এই অ্যাক্ট মোতাবিক আমেরিকার মূল অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের মিসিসিপি নদীর পূর্বতীর থেকে উচ্ছেদ করে এর পশ্চিমতীরে নির্দিষ্টকৃত রেড ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত ওকলাহোমায় স্থানান্তর করা হয়। যাতে শ্বেতাঙ্গরা রেড ইন্ডিয়ানদের স্বর্ণপ্রসবা ভূমি দখল করে তাদের লোভ-লালসা বাস্তবায়ন করতে পারে। ১৮৩৮-এর এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট ভ্যান বিউরেন আর্মি ট্রুপসকে নির্দেশ দেন, তারা যেন এই অ্যাক্ট কার্যকর করার প্রস্তুতি শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল স্থানান্তর প্রক্রিয়ার এই আইন শক্তির জোরে কার্যকর করা।

৬ জুন ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের সকালে টেনেসির বস্তি কেলাহোঁ থেকে এই অভিযানের আরম্ভ করা হয়। রেড ইন্ডিয়ানদের বিখ্যাত গোত্র 'চ্যারোকিস'দের এই বস্তি—যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শান্তির শহর হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, মুহূর্তেই রক্ত-লাল হয়ে ওঠে। ৭ হাজার শ্বেতাঙ্গ সৈন্য সশস্ত্র অবস্থায় কেলাহোঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের ভেড়া-বকরির ন্যায় মিসিসিপির পশ্চিম তীরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করে। উপদ্রুত অবস্থার শিকার হয়ে বাচ্চারা মায়ের কোল থেকে এবং ঘরের সদস্যরা একজন অপরজন থেকে হারিয়ে যায়। কাউকে সাথে করে কোনো জিনিসপত্র নিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি বিদায় সম্ভাষণ জানানোর অবকাশটুকুও। যে-ই একটু বিরোধিতা করেছে তাকেই প্রাণ দিয়ে এর মাশুল দিতে হয়েছে। যে দেরি করছে বলে মনে হয়েছে তাকে গ্রেফতার করে নেওয়া হয়েছে।

সৈন্যদের লুটতরাজ ও অত্যাচারে বিপদগ্রস্তরা আকাশফাটা চিৎকার দিতে থাকে। ১ হাজার মাইলের দীর্ঘ সফরের জন্য তাদের কোনোই প্রস্তুতি ছিল না। ছিল না দীর্ঘ পথযাত্রার সামান্যতম পাথেয়। সরকারের পক্ষ থেকে যে রেলগাড়ির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে পদাতিকদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এরা দৈনিক ১০ মাইল করে পথ অতিক্রম করতো। এভাবে অগ্রসর হতে হতে দুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে অসহায় যাত্রীদলকে ক্ষুধা, ক্লান্তি, শীত এবং বিভিন্নধরনের ব্যাধি আক্রমণ করে বসে। অবস্থা এ পর্যায়ে গড়ায় যে, অসহায় লোকগুলোর অনেকেই কয়েক পা এগিয়ে বসে পড়তো। তাদের মধ্যে উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও থাকত না। যারা উঠতে পারত না তাদেরকে সেখানেই মাটিচাপা দিয়ে বাকিদের নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হতো। এ জন্যেই মিসিসিপি থেকে ওকলাহোমা পর্যন্ত প্রলম্বিত রাস্তার পাশে অসংখ্য কবর দেখতে পাওয়া যায়। মৃতদের আত্মীয়রা পেছন ফিরে থাকিয়ে চোখের অশ্রু ফেলত; কিন্তু তাদের কোনো অধিকার ছিল না। অশ্রুর মহাসড়ক ধরেই তাদেরকে এগিয়ে যেতে হতো।

এই অসহায়ত্বই আমেরিকার বুকে অশ্রুর মহাসড়কের জন্ম দেয়। কদমে কদমে কবর আর প্রতি পলে পলে নতুন বিপদের হাতছানির ভেতর দিয়ে এমন বেদনাদায়ক ট্রাজেডি প্রকাশ পায়, যেখানে হাহাকার, কান্না, অশ্রু এবং দীর্ঘশ্বাসের পাশাপাশি রক্তও ঝরছিল।

এই ছিল আমেরিকার গণতন্ত্র। এই ছিল মানবাধিকারের প্রবক্তাদের মানবতাবোধের বহিঃপ্রকাশ। হিংসার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল আইনের সম্মান ও প্রগতিশীল চিন্তার উৎকর্ষতা। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ৪ হাজার কবর আমেরিকার গণতন্ত্রের চাদর সরিয়ে বিশ্ববাসীকে তার কদাকার চেহারা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল।

বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যের উপর যদি সময়ের আন্দোলন, ব্যক্তিবিশেষের কর্মতৎপরতার প্রতিক্রিয়া কার্যকর হয়ে থাকে, তাহলে অযাচিত দুর্যোগও নিশ্চয় প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে থাকবে। হুসাইন রা.-এর শাহাদত, গ্রানাডার পতন, রেড ইন্ডিয়ানদের উপর জাতিনির্মূল অভিযান, ভিয়েতনাম ট্রাজেডি, এবং 'অশ্রুর

মহাসড়ক' এমন প্রতিক্রিয়া বিস্তারকারী ঘটনাবলির অন্যতম কয়েকটি ঘটনা। এগুলোর ঔরষ থেকে জন্ম নিয়েছে জগতের স্মরণীয় কিছু ক্লাসিকেল সাহিত্য। এ ঘটনাগুলো সাহিত্যে এমনসব বেদনাদায়ক অভিব্যক্তি প্রকাশ শিখিয়েছে, যা সত্যিই অন্যান্য সাহিত্য থেকে আলাদা মর্যাদা রাখে। রেড ইন্ডিয়ানদের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জাতিনির্মূলের প্রলয়ংকরী ঝড় ও 'অশ্রুর মহাসড়ক' নামক বেদনাদায়ক উপখ্যানের উপর তাদের সাহিত্যিক কর্তৃক এমন অন্তরভেদী সাহিত্য রচনা করা হয়েছে, যা বিশ্বসাহিত্যের সর্বোচ্চ স্তরের। যা চোখগুলো থেকে বহায় অশ্রুর প্লাবন। অন্তরগুলোকে করে ব্যথাহত। প্রখ্যাত রেড ইন্ডিয়ান কবি চিফ ডন জর্জের নিম্নোক্ত কাব্য ক্লাসিক সাহিত্যের জাজ্জ্বল্য উদাহরণ—

'আমি দেখছি আর কাঁদছি
বরফ-জমাট স্তব্ধ-বিরান রাস্তার উপর
প্রতিটি ইঞ্চি ও পায়ে পায়ে
ক্ষুধায় কাতর ও তুষারের মতো শক্ত খুন।
আমি দেখছি রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা
শুনছি নিরপরাধ শিশুদের অনুচ্চ আর্তনাদ
কঙ্কালসার মায়ের চোখে অশ্রুর-মতি।
এ পথের প্রতিটি বনের গুচ্ছের নিচে
আমার বংশের নিষ্পাপ নিহত মানুষ ঘুমিয়ে আছে
নারী, শিশু ও বৃদ্ধের কবর লুকিয়ে আছে সেখানে।
আমি দেখছি আর কাঁদছি
আমার বাপদাদার প্রশস্ত ভূমিতে
আমাদের কবরের চিহ্নও এখন সম্পূর্ণ উদাও!'

আমেরিকান ভূখণ্ডে তাদের মূল বাসিন্দাদের উপর এহেন বর্বর আচরণের কথা তেমন প্রকাশ পেতো না, যদি না জন ব্রিন্টের মতো লোক সাক্ষ্য না দিতেন। জন ব্রিন্ট ছিলেন ওই সৈন্যদের একজন, যাদেরকে ৬ জুন ১৮৩৮ এর সকালে কেলাহোঁর চ্যারোকিদের পশ্চিমের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং জর্জিয়াস্থ এদের ভূসম্পদ ধ্বংস করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। জন ব্রিন্ট ১৮৯০ সালে তার বিস্তারিত সাক্ষ্যে বলেন—

'আমি আজ (১১ ডিসেম্বর ১৮৯০ খ্রি.) ৮০ বছর বয়সে উপনীত। আমার জন্ম টেনেসির ক্যাংজায়েরনে। আমি পশুশিকার, মাছধরা আর ভ্রমণ ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে যৌবনে উপনীত হই। যৌবনের শুরুতেই আর্মিতে যোগ দেই। পশুশিকার আর মাছ ধরতে গিয়ে ইতঃপূর্বে চ্যারোকিজ গোত্রের অনেক

রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে আমার পরিচয় গড়ে ওঠে। তারা ধীরে ধীরে আমার ভালো বন্ধু হয়ে যায়। অনেক সময় আমি তাদের সাথে শিকারে অংশগ্রহণ করতাম এবং রাতে তাদের ক্যাম্পে অবস্থান করতাম। ধীরে ধীরে আমি তাদের ভাষা শিখে ফেলি। তারা আমাকে পাখি ও মাছ শিকারের জাল এবং ফাঁদ তৈরি শিখায়।

১৮৩৮ সালে যখন চ্যারোকিদের তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তখন আমি ছিলাম একজন নবীন সৈন্য। চ্যারোকি ভাষা জানা থাকার কারণে ১৩৩৮ সালে আমাকে দুভাষী হিসেবে মাউন্টেন চ্যারোকি এলাকায় নিয়োগ দেওয়া হয়। এখানে এসে আমি আমেরিকান ইতিহাসে ঘৃণ্যতম নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে দেখতে পাই। দেখতে পাই নির্দোষ চ্যারোকিদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করার দৃশ্য। তাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই গ্রেফতার করা হচ্ছিল। তাদেরকে ভেড়া বকরির মতো টেনে-হিঁচড়ে বেলগাড়িতে করে পশ্চিমদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোনো স্মৃতিশক্তিমান মানুষের পক্ষে সেদিনের রেড ইন্ডিয়ানদের যন্ত্রণা, অন্তরভেদী হাহাকার জীবনেও ভুলে যাবার কথা নয়। লোকগুলোকে যখন তাদের ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নেওয়া হয়, তখন তাদেরকে জুতো পরার অবকাশটুকুও দেওয়া হয়নি। কোলের বাচ্চাদেরকে ভিন্ন গাড়িতে থাকা তাদের মা-বাবাকে দেখে চিৎকার করার দৃশ্য দেখে স্থির থাকা অন্তত মনুষ্য আত্মার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা জানতো—তারা চিরকালের জন্য একজন আরেকজন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

১৭ নভেম্বর তাপমাত্রা মাইনাসের নিচে চলে গেলে ভয়ানক তুষারপাত শুরু হয়। প্রচণ্ড ঠান্ডার এ কষ্ট ২৬ মার্চ ১৮৩৯ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ততদিনে চ্যারোকিরা ওকলাহোমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যে মহাসড়ক ধরে ঘর-বাড়িহারা লোকগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল; তা ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর মহাসড়ক হয়ে ওঠছিল। বিপদগ্রস্তরা এই প্রবল ঠান্ডার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে রাতযাপনে বাধ্য ছিল। আমি একই রাতে ২২ জন মানুষকে ঠান্ডায় নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে দেখেছি। মৃতদের মধ্যে চিফ জন রাসের যুবতী স্ত্রীও ছিল। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ও পরোপকারী। মহান এই নারীর মারা যাবার কারণ ছিল—তিনি নিজে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে উদোম থেকে নিজ কম্বলটা আরেক জ্বরাগ্রস্থ বাচ্চাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য; তিনি নিজে যেমন বাঁচতে পারেনি, তাকেও বাঁচাতে পারেননি। তুষারঝড়ের পর তাঁকে স্যার ল্যাফটেনেন্ট গ্রেগ-এর ঘোড়ার কাঠির উপর নিথর-নিশ্চল পাওয়া গিয়েছিল।

দীর্ঘ এই সফরে আমি চ্যারোকিদের সঙ্গী ছিলাম এবং একজন সাধারণ সৈন্যর পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব; সেটুকু আমি করেছি। আমাকে যখন রাতের প্রহরার ভার দেওয়া হতো, তখন আমি সঙ্গী প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে আমার ওভারকোট দিয়ে বাচ্চাগুলোকে গরম দেওয়ার চেষ্টা করতাম। যে রাতে মিসেস জন রাস মারা যান, সেই রাতেও আমি প্রহরায় নিয়োজিত ছিলাম। ভোরে আমরা মিসেস জন রাসকে সড়কের পাশে দাফন করে যাত্রা অব্যাহত রাখি।

চ্যারোকিদের মাথায় বিপদের যে পাহাড় ভেঙে ফেলা হয়েছিল; এর একমাত্র কারণ ছিল—তাদের ভূখণ্ডে স্বর্ণ পাওয়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি তাদের স্বর্ণপ্রসবা জমিজমা কুক্ষিগত করা। আমি দেখেছি; তাদের ফেলা আসা বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবকদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের সম্পদ লুট করে নেওয়া হয়েছে। পুরুষের মধ্যে যারা কৃষিকাজে ছিল তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব নারী হামলাকারীদের ভাষা বুঝতে পারছিল না, তাদের চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসা হয়। অবুঝ বাচ্চাগুলোকে তাদের মা-বাবা থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। তাদেরকে এমন এক অজানা সফরের যাত্রী বানানো হয়, যে সফরে আসমানই ছিল তাদের কম্বল এবং জমিন ছিল তাদের বিছানা।

আমি একটা ঘরে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করেছি যে, এক অসহায়া মহিলা যে নিজে ছিল হার্টের বেদনায় মুহ্যমান; তার পিঠে বাধা ছিল একটা শিশু আর দু-হাতে ধরা ছিল আরও দুটো শিশু। সে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায় এবং এই পড়ে যাওয়ার মাধ্যমে সে যাবতীয় কষ্ট থেকে বেঁচে যায়। মহিলা তো চিরমুক্ত হয়েছিল; কিন্তু বাচ্চাগুলো তাকে মুক্তি দিচ্ছিল না। ওদের হাতের বাঁধন আরও মজবুত হয়ে উঠছিল। রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের সর্দার চিফ জুনালাস্কার[১৩] দিকে যখনই চোখ পড়ত তখনই চোখ গড়িয়ে অশ্রু বইত। একবার দেখি তিনি তার মাথার টুপি খুলে আকাশের দিকে মুখ করে বলছেন—হে আমার প্রভু! যদি "হর্সশো" যুদ্ধ চলাকালে আজকের এ অবস্থা সৃষ্টি হবে জানতাম, তাহলে আজ আমেরিকার ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো।'

১৮৯০ সাল, চ্যারোকিদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ার ঘটনা তেমন পুরানো হয়নি; কিন্তু আজ আমাদের বাচ্চারা বিশ্বাসও করতে পারবে না চ্যারোকিদের সাথে কী অমানবিক আচরণ করা হয়েছিল। বাস্তবতা এটাই যে, আজকের প্রজন্মের

[১৩] যিনি আমেরিকার বিখ্যাত গৃহযুদ্ধ 'হর্সশো' চলাকালে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন।

কাছ থেকে সেই লজ্জাজনক ইতিহাস লুকিয়ে রাখার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আজকের প্রজন্ম জানে না আমরা যে ভূখণ্ডে বসবাস করছি, এখান থেকে তার মূল অধিবাসীদের কী মানবতাহীন নির্দয় পন্থায় বিতাড়িত করা হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গদের লোভের আগুন কীভাবে রেড ইন্ডিয়ানদের সুখের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, যতই চেষ্টা করা হোক ইতিহাসকে চেপে রাখা যাবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে এবং সে ইতিহাস পড়ে আমাদের উপর ঘৃণার থুথু ছুঁড়ে মারবে। তারা জানবে আমাকে এবং আমার মতো চারজন রেড ইন্ডিয়ান অসহায় সৈন্যকে কীভাবে জেনারেল স্কাটের নির্দেশ ও চাপের ভিত্তিতে এক রেড ইন্ডিয়ান সর্দার এবং তার বাচ্চাদেরকে গুলি করে হত্যা করতে হয়েছিল। আমি এবং আমরা ছিলাম নিরুপায়। কেননা, অন্যথা করলে সে গুলি আমাদের মাথার খুলি উপড়ে নিত।

আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি—আমি নিজে থেকে যথাসম্ভব চ্যারোকিদের সাথে তা-ই করে গেছি, যা একজন বন্ধুর কাছে আশা করা হয়। আমার বিশ্বাস, ঘটনার ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আমি তাদের স্মৃতিতে "ওই সৈন্য—যারা আমাদের সাহায্য করেছিল" মর্মে জীবন্ত আছি। তারপরও হত্যা হত্যাই। চাই তা রক্তপায়ী কোনো অমানুষ থেকে প্রকাশিত হোক বা উর্দিধারী কোনো সৈনিকের পক্ষ থেকে। হত্যা হত্যাই। একসময় এর জবাব দিতেই হয়। কেউ না কেউ ১৮৩৮ সালে রেড ইন্ডিয়ানদের প্রবাহিত রক্তনদীর জবাব দেবে। কাউকে না কাউকে অশ্রুর মহাসড়কের পাশে ছড়িয়ে থাকা চ্যারোকিদের ৪ হাজার কবর চিহ্নিত করে দেখাতে হবে।

আমার খাহেশ হচ্ছে আমি যেন সেই বেদনাদায়ক ইতিহাস ভুলে যাই। কিন্তু আজও কাত হলে সেই সুনসান রাজপথ ধরে চলা ৬৪৫টি বেলগাড়িতে থাকা যাত্রীদলের নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের গোঙানি, কাতরানি আর আহাজারি শুনতে পাই। আমার স্মৃতি সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের সেই হৃদয়হীন, মর্মভেদী করুণ আখ্যান স্পষ্ট করতেই হবে। তখন বিশ্বের সবচে বড় হাকিম আমাদের বেলায় যে সিদ্ধান্ত দেন আমাদেরকে অবশ্যই তা মেনে নিতেই হবে।'

জন ব্রিন্টের অর্ধেক কথা পূর্ণ হয়েছে। ইতিহাস ঘটনাটি তার আঁচলে লুকিয়ে না রেখে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। সাহিত্যও অশ্রুপ্রবাহী ভাষায় সে আখ্যান প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। কিন্তু অর্ধেক কথা এখনও প্রকাশ পায়নি। এখনও পৃথিবীর কোনো বিচারকের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসেনি। সিদ্ধান্ত এসে গেলে শাস্তি এবং

প্রতিদানও নির্ধারিত হয়ে যাবে। অবশ্য একদিন আসবেই, যদিও তাতে অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হয়।

কিছু ফায়সালা হয়ে গেছে কোন দিকে যেতে হবে
পানিকে অবশ্য মাথা থেকে নেমে প্রবাহিত হতে হবে।

মানবাধিকারের কথা বাদ দিন। সেখানে মানবতা অপেক্ষা রাজনীতিই বেশি বিদ্যমান। তবে আমেরিকার মাটিতে মানবতা যেভাবে বিপর্যস্ত ও ধর্ষিত হয়েছে, মনুষ্য ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। এই ভূখণ্ডে পুঁজি, ব্যবসা, মুনাফা, জমি, সুযোগ ও সময়, কর্তৃত্ব, দখল, মালিকানা, বিক্রয় ও সমৃদ্ধির জন্য যে অমানবিক পন্থায় রক্তের সাগর বইয়ে দেওয়া হয়েছে, মানবতাকে যেভাবে পায়ের তলায় নিপিষ্ট করা হয়েছে—এগুলো রেখে মানবাধিকারের প্রশ্নে আমেরিকার পীড়াপীড়ি ঠিক ততটাই গ্রহণযোগ্য; যেভাবে জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়ার পর আনবিক অস্ত্র সীমিতকরণের উপর আমেরিকার পীড়াপীড়ি। আমেরিকার ইতিহাসে সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে যতদিন পর্যন্ত সেখানে অশ্রুর মহাসড়ক দেখতে পাওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত আমেরিকার পক্ষে মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার অধিকার থাকতে পারে না। ততদিন আমেরিকা মানবাধিকার প্রশ্নে কারও দিকে আঙুল উঠাতে পারে না।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, রেড ইন্ডিয়ানরাই ছিল আমেরিকার প্রকৃত মালিক এবং তারা জাতিতে ছিল খ্রিষ্টান। স্বজাতির সাথে যারা কেবল বর্ণ ও কথিত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এহেন অমানবিক আচরণ করতে পারে, তাদের কাছে যারা এই আশা পোষণ করে—ওরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মানুসারীদের সাথে করুণা, দয়া ও অনুকম্পার আচরণ করবে, তাদের এই সুধারণার উপর করুণা করা ছাড়া কোনো উপায় আছে বলে মনে করি না।

স্পেনের সাম্প্রদায়িক ক্রুসেডারদের মুখে লেগে থাকা রক্ত আর চোখে লেপ্টে থাকা বিশ্বদখলের স্বপ্ন আমেরিকা আবিষ্কারের পর বিশ্ববাসীকে তাদের দাস মনে করছে। নির্দয়, নিষ্ঠুর ও পাশব আচরণ আমেরিকার স্বভাবের অন্যতম অনুসঙ্গ। তাদের থেকে এ স্বভাব দূর করার জন্য প্রাকৃতিক কোনো বজ্রপাত ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে সম্ভব নয়। কুদরতের পক্ষ থেকে একদিন না একদনি তা আসবে। হে আমার রব! তুমি কেন হাশর জমিয়ে দিচ্ছো না। মজলুমের হাহাকার তো তোমার আরশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ভার্জিনিয়ার বাজার থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত

আমেরিকার রাজ্য ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়া একজন উচ্চশিক্ষিত হত্যাকারী, যে সারিবদ্ধ করে শিক্ষক ও ছাত্রদের হত্যা করেছিল; এর পটভূমি এবং কারণ ও স্বরূপ উদ্ঘাটনে অভিজ্ঞরা নিজেদের পক্ষ থেকে অনুমাননির্ভর কথাবার্তা বলছেন। কেউ কেউ ঘটনাটিকে সহিংস ফিল্ম দর্শনের প্রতিক্রিয়া বলছেন। কেউ বলছেন এটা প্রেমে ছ্যাকা খাওয়া এক ব্যর্থ প্রেমিকের উত্তেজনার ফসল। কিন্তু স্বয়ং এশিয়ান হত্যাকারীর রেখে যাওয়া ভিডিওক্লিপের ভাষা ঘটনার গা থেকে সম্ভাব্য কারণ খোঁজা থেকে মুক্তি দিয়েছে বলে মনে হয়। ভিডিওক্লিপে হত্যার স্বীকৃতিসহ এর কারণ অনেকটা স্পষ্ট। সংবাদপত্রের ভাষ্যানুযায়ী কোরিয়ান বংশভূত এ হত্যাকারী ঘৃণাভরা বক্তব্য ভিডিওক্লিপে রেখে গেছে। বলেছে—'আমি ধনী লোকগুলো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।'

ভিডিওর ছবি এবং তার হাতে লেখা একটা চিরকুটসহ কিছু তথ্য নিউ ইয়র্কের একটি টিভিতে তখন পোস্ট করা হয়, যখন ভার্জিনিয়ার টেক কলেজে ফায়ারিংয়ের প্রথম ঘটনা ঘটে। এদিকে ভার্জিনিয়ার পুলিশপ্রধান প্রেসকনফারেন্সকে লক্ষ করে বলেন—'অভিযুক্তের রেখে যাওয়া তথ্যপ্রমাণ এফবিআইয়ের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় এতে তথ্যানুসন্ধানে নতুন পথ উন্মুক্ত হবে।'

আমেরিকার রাজ্য মিসৌরির একটি ইউনিভার্সিটিতে সংঘটিত আরেকটি ফায়ারিংয়ের ঘটনায় দুজন মারা যায়। আর হুমকি এবং বোমা থাকার সংবাদে দেশের আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। এদিকে ক'দিন আগে ক্যালিফোর্নিয়ার হ্যাটিং ল কলেজ এবং মিনিসুনা ইউনিভার্সিটিতে বোমার গুজবে প্রতিষ্ঠান দুটি একেবারে জনশূন্য করে নেওয়া হয়। বিশ্ব অবাক হয়ে ভাবছে—পৃথিবীর সবচে সুসভ্য(?) রাষ্ট্রের সুসভ্য ও উচ্চশিক্ষিত মানুষ কী হতে গিয়ে কী হয়ে যাচ্ছে? এগুলোই কি সেই উজ্জ্বল উদাহরণ, বিশ্ব যেগুলোতে আমেরিকার অনুসরণ করবে?

হত্যাকারীর রেখে যাওয়া বক্তব্য আমেরিকা এবং আমেরিকাবাসীদের মানসিকতা উপলব্ধির নতুন জানালা খুলে দেয়। তবে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, আমেরিকার মতো দেশ; যেখানে প্রাণীদের অধিকারও শতভাগ সুনিশ্চিত, সেখানে একজন উচ্চশিক্ষিতের পক্ষে কিছুটা সুবিধাভোগী একটি শ্রেণির প্রতি এত প্রচণ্ড ঘৃণা রাখার কী প্রয়োজন? সমাজের অভ্যন্তরে অজান্তে লুকিয়ে থাকা কোন মানসিকতা ঘৃণাকে এভাবে আগ্নেয়গিরির মতো লাভা উদ্‌গীরণ করিয়ে দিলো? এটা এমন এক গভীরতর প্রশ্ন, যে প্রশ্নের জবাবে আমেরিকার ভিত্তি, তার গঠনপ্রক্রিয়া, তার প্রতিষ্ঠাকালীন সমাজব্যবস্থা এবং মানসিকতা সম্পর্কে কিছু জানা না থাকলে কিছুই বলা সম্ভব নয়। পাঠক যদি একটু কষ্ট করেন এবং কিছু সময়ের জন্য মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন, তাহলে আমরা এর কারণ একটু খতিয়ে দেখতে পারি। আর এ খতিয়ে দেখার ফলে আমেরিকার প্রতি আস্থাবান রাষ্ট্রগুলোর জনগণের মাথায় আমেরিকার ব্যাপারে যে দ্বিধা কাজ করছে, তার অনেকটা কেটে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ভার্জিনিয়া একসময় ছিল আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় নিয়ে আসা দাসদের নিলামের সর্বাপেক্ষা বড় বাজার। এখানে নির্যাতন ও বর্বরতার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমেরিকার গবেষকশ্রেণি আগে থেকেই কিছুটা অবহিত। বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক, রাজনৈতিক গবেষক, ও খ্যাতিমান লেখক র‍্যালফ এমারসন ১৮৫৫ খিস্টাব্দে তার বিশ্বখ্যাত ভাষণে বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করেছিলেন—

> 'আমি এ কথা বুঝতে অক্ষম যে, এ কেমন সমাজ; যে একদিকে নিজে অত্যাচারী আবার নিজেকে বিশ্বের মধ্যে সুসভ্য দাবি করে থাকে? রাজ্য কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়? আমাদেরকে দাসত্ব কিংবা স্বাধীনতা থেকে মুক্তি পেতেই হবে।'

তিনি যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন যেন আমেরিকার এই দ্বিচারী স্বভাবের সমালোচনাও করছিলেন; যেখানে একই সাথে দাসত্ব ও স্বাধীনতা বিদ্যমান। মানবাধিকার আর গণতন্ত্রের ঢোল পেটানোর পাশাপাশি জোরপূর্বক সেবাগ্রহণ, জাতিগত বিদ্বেষ এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের উপস্থিতি আমেরিকার ফেডারেল আইনকে হাস্যকর করে তুলে। র‍্যালফ এমারসনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একই সমাজব্যবস্থায় দাসত্ব ও স্বাধীনতার সহাবস্থান; তেমনি নির্যাতন-নিপীড়ন আর সভ্য সমাজব্যবস্থার সহাবস্থান একটা অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু তিনি তার আমেরিকায় তা-ই দেখতে পাচ্ছিলেন।

আমেরিকা; যেখানে ১০ শতাংশ মানুষ দাসশ্রেণির হওয়ার পরও নিজেকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার চ্যাম্পিয়ন বলে পরিচয় দেয়—তা সত্যিই হাস্যকর। আমেরিকান সমাজের এই ১০ শতাংশকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই কৃষ্ণকায় কৃষ্ণভাগ্য লোকগুলোকে একসময় ভেড়া-বকরির মতো নিলাম-বাজারে তুলে দরদাম হাঁকা হচ্ছিল।

ইউরোপিয়ান শ্বেতকায়রা স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের সাড়ে ৩ লাখ বর্গকিলোমিটার ভূমি হাতিয়ে নেওয়ার পর যে প্রয়োজন দেখা দেয় সেটা হচ্ছে—এই বিপুল জমিতে ফসল উৎপাদনের প্রশ্ন। যে জমি বিনামূল্যে লাভ করা হয়েছে তা কেন অর্থ ব্যয়ে উৎপাদন-উপযোগী করা হবে? তাই বিনামূলে উৎপাদনপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার চিন্তাভাবনা থেকেই তারা আফ্রিকানদের অপহরণ করে দাস বানানোর প্রক্রিয়ায় হাত দেয়। এতে তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা দেয় ওলন্দাজ, ব্রিটিশ, পর্তুগিজ, সুইডিস ও স্পেনের জলদস্যুশ্রেণি। তারা প্রায় ৪০ মিলিয়ন আফ্রিকান জনগণকে[৭৪] জাহাজে ভেড়া-বকরির মতো বোঝাই করে আমেরিকায় নিয়ে এসে ভার্জিনিয়াসহ অন্যান্য নিলাম-বাজারে তুলে। এই ৪০ মিলিয়নের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন পথিমধ্যে মারা যায়। এ যেন একজন আফ্রিকানকে আমেরিকায় পৌঁছানোর জন্য তিনজনকে হত্যা করার নামান্তর।

এককথায়, আমেরিকার ভিত্তিই গড়ে ওঠেছে মানুষের রক্তের উপর।

১. আমেরিকা প্রতিষ্ঠাকারীদের ইসলাম বিদ্বেষ আন্দালুসিয়ার ৩০ লাখ মানুষের প্রাণ হরণ করেছিল।

২. এরপর আমেরিকা আবাদকরণের পর্যায়ে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা ১০০ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানদের মাথা কাটে।

৩. এরপর উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যাবার জন্য ৩০ মিলিয়ন আফ্রিকানদের রক্তে হোলি খেলে। আমেরিকার আজকের ডলারকে শক্তিশালী ও রঙিন করতে লাখ লাখ আফ্রিকান ও মুসলমানদের রক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাকাঙ্ক্ষা, ভূমি-ক্ষুধা ও প্রতিপত্তির খাতিরে এতো বিপুল পরিমাণ হত্যাযজ্ঞের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।

আমেরিকায় দাসত্বের ইতিহাস শুরু ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস দ্বিতীয়বারের সফর শেষে স্পেনে এসে পৌঁছালে তার জাহাজে তাইনু গোত্রের ৭০০ রেড ইন্ডিয়ান বন্দি ছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার সময় সে এদেরকে

[৭৪] যাদের মধ্যে কয়েক মিলিয়ন মুসলমানও ছিল।

অপহরণ করে নিয়ে আসে। কলম্বাসকে এ মানবতাবিরোধী অপরাদের দায়ে স্পেনের আদালত ফাঁসি দেওয়ার পরিবর্তে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ১৫০২ সালের কোনো এক অভিশপ্ত সময়ে স্পেন ও আমেরিকার উপকূলে আফ্রিকান দাসদের হাতে-পায়ে জিঞ্জির পরানো অবস্থায় নামানো হয়। এই হতভাগা কৃষ্ণাঙ্গদের ওয়ান ডি কোর্ড ও বানামি নামক দুই অপরাধীর জিম্মায় স্পেন সরকারের প্রত্যক্ষ অনুমতির ভিত্তিতে আমেরিকায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

কলম্বাসের পুত্র দিয়াগো কোলন; যাকে স্পেন সরকার মধ্য-আমেরিকায় নিজেদের গভর্নর নিযুক্ত করেছিল; সে রেড ইন্ডিয়ান দাসদের কাজে সন্তুষ্ট ছিল না, বিধায় সর্বক্ষণ স্পেন সরকারের কাছে অভিযোগ করে আসছিল—ওরা পরিশ্রমী ও আত্মনিবেদিত নয়। দিয়াগো কোলেনের অব্যাহত অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্পেনের সরকারপ্রধান ফার্দিনান্দ ২২ জানুয়ারি ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে ৫০জন আফ্রিকান দাসদের একটি দল ডেমেনিকান রিপাবলিকে কোলেনের কাছে প্রেরণ করে। তাদেরকে সরাসরি মি. কোলনের তত্ত্বাবদানে কৃষিকাজে লাগানো হয়। এরপরপরই ফার্দিনান্দ আমেরিকায় দাস রপ্তানির উপর স্পেন সরকারের নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়। এতে আমেরিকায় দাসবাজার চাঙা হয়ে ওঠে। এদিকে গভর্নর কোলন রেড ইন্ডিয়ান অপেক্ষা আফ্রিকান দাসদের অধিক প্ররিশ্রমী, আত্মনিবেদিত এবং বিশ্বস্ত পায়। কিন্তু তাদের এই সদগুণাবলিই তাদের জন্য কাল হয়ে উঠে। তারা আমেরিকার জন্য এমন এক প্রোডাক্ট হয়ে ওঠে, যা অর্জনের জন্য যেকোনো ধরনের অস্ত্রব্যবহার বৈধ করে নেওয়া হয়। সবধরনের অত্যাচারকে হালাল ঘোষণা করা হয়।

দাসশ্রেণির উপস্থিতিতে তিন শতাব্দী পর্যন্ত আমেরিকা মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। তা ছিল পশুত্বের রাজধানী হিসেবে পরিচিত। নীচ, অবহেলিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও মানবতার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত আমেরিকার উপকূলে টেনে নামানো সেই প্রথম দাসটি কে ছিল? কী ছিল তার নাম? তা জানার কোনো উপায় না থকলেও এটা অবশ্যই জানা যে, সে ছিল একটা পণ্য। অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মতোই। যার নামের ও পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

মতাদর্শিক জ্ঞানের নতুন সংজ্ঞা অনুসারে ব্যক্তি থেকে তার অতীত সম্পর্ক কেটে ফেলা মূলত তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচিতি মিটিয়ে ফেলার প্রথম পদক্ষেপ। এর ফলে ব্যক্তির চরম প্রতিক্রিয়া একবারে স্বাভাবিক এবং সহজাত। আফ্রিকান দাসদের সর্বপ্রথম তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত নাম থেকে মুক্ত করা হয়। এরপর বংশগত বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করা হয়। কন্যাকে নিউ ইয়র্কের বাজারে এবং স্ত্রীকে মিশিগানের বাজারে বিক্রয় করা হয়। একইভাবে ছেলেকে বিক্রয় করা হয়

Shot by Nafiz 50

বাল্টিমোরের বাজারে এবং ভাইকে বিক্রয় করা হয় টেক্সাসের বাজারে। এরপর তাদেরকে ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিক প্রথাপদ্ধতি এবং সভ্যতা থেকেও মুক্ত করে নেওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে দাসদের মধ্যে জন্ম নেয় ওদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। অতীত থেকে মুক্ত, ভবিষ্যৎ থেকে বেপরোয়া, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে বেঁচে থাকা এই কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে এমন এক শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে, যারা আজ আমেরিকার কাছ থেকে তাদের বাপ-দাদাদের উপর কৃত সহিংস জুলুমের পাই পাই করে হিসেবে নিতে চাচ্ছে। তারা কখনো আমেরিকার সমাজব্যবস্থার কাছে সেই অনাচারের জবাব চাইছে, কখনো শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক তাদের বাপ-দাদাদের সাথে কৃত অত্যাচার থেকেও কঠোর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ফলে আজ আমেরিকার আত্মা আহত। সারা শরীরে শুধু আঘাত আর আঘাত। সম্মান ও প্রতিপত্তি ধুলোয় বিলীন হবার পথে।

আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞজন এবং সংস্কারবাদীরা আজ মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে—এই পরিণতি থেকে বাঁচার উপায় কী? এর প্রতিষেধক কী? আজ আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ। কিন্তু আমেরিকান জেলসমূহে কৃষ্ণাঙ্গ বন্দিদের হার ৪৭ শতাংশ। ১৬ থেকে নিয়ে ৩৭ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গদের ৭১ শতাংশ একবারের জন্য হলেও জেলে গিয়েছে। এই যে পরিসংখ্যান, এটা কি প্রমাণ করে না—কৃষ্ণাঙ্গরা এখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে? এটা আমেরিকার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন এক বিপদ দেখা দিচ্ছে।

আমেরিকায় দাসদের নিয়ে আসার প্রেক্ষিত এতই হিংস্র ও পাশব ছিল যে, খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরু থেকে নিয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত; আদালতের সদস্যদের থেকে নিয়ে দাসবিক্রেতা-শ্রেণি পর্যন্ত; লেখক থেকে নিয়ে সংস্কারবাদী পর্যন্ত পদ, সম্মান এবং অবস্থান পেছনে রেখে দাসপ্রথার পক্ষে ছিল এবং দাসব্যবসা থেকে সবাই উপকৃত হয়েছে। এই উপকৃতদের মধ্যে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং জাতির পিতা জর্জ ওয়াশিংটনও গন্য ছিলেন।

কলম্বাস আমেরিকার উপকূলে পা রাখামাত্র শান্ত এ ভূখণ্ডে মানবতার উপর এমন সব ট্রাজেডি নেমে আসে যে, এখানে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ মূলনীতি এবং বিশেষ ইনসাফের ভিত্তিতে মুনাফা অর্জনই মুখ্য হয়ে ওঠে। কলম্বাসের উদ্দেশ্য ছিল—এখান থেকে সম্ভব সবধরনের আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন। ইসাবেলা এবং ফার্দিনান্দের সাথে এ ব্যাপারেই তার আলোচনা হয়েছিল। চুক্তি হয়েছিল নয়া দুনিয়া থেকে সে সোনা-

রোপা এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজদ্রব্যসহ দাসদের নিয়ে এসে স্পেনের অর্থনীতিকে আকাশে পৌঁছে দেবে।

কলম্বাস তার ইচ্ছে বাস্তবায়নে সফল হয়েছিল। অবশ্য তাকে এই সফলতা অর্জন করতে ১০০ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানের হত্যার পাশাপাশি তাদের লাখ লাখ একর জমির উপর জোরপূর্বক দখলদারি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। তাকে মানুষ থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যেতে হয়েছে।

আমেরিকার ব্যাপারে কথা বলতে হলে এ বিষয়টি সবসময় সামনে থাকতে হবে যে, এর আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা কোন দৃষ্টিভঙ্গি, কোন মূলনীতি ও কোন ইনসাফের উপর ছিল! আমেরিকার আবিষ্কার থেকে নিয়ে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত একটামাত্র যে দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ছিল; যাকে আমরা সরল ভাষায় 'লাভবান হবার দৃষ্টিভঙ্গি' বলতে পারি। ব্যবসা, পণ্য, ক্রয়-বিক্রয় যে উদ্দেশ্যের জন্যেই আমেরিকা অস্তিত্বে এসেছে তা পূর্ণ হয়েছে। এখানে ব্যবসা ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়েছে। পণ্য দুনিয়ার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। আর পুঁজিবাদী বাণিজ্যব্যবস্থার মাধ্যমে আমেরিকাকে পৃথিবীর তাবৎ সম্পদের গোদামে পরিণত করেছে।

আমেরিকা কখনো সত্য, ইনসাফ ও মানবতার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হয়নি। তার অস্তিত্ব কেবল মুনাফার জন্য। সুতরাং এখানকার সবকিছু অর্থলাভের পুঁজিস্বরূপ। এখানে কেবল প্রোডাক্ট নিয়ে কথা হতে পারে। আমেরিকান মায়েরা মনুষ্যসন্তান জন্ম দেয়নি, জন্ম দিয়েছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সেলসম্যান। আমেরিকার আত্মপ্রকাশ যেহেতু সুদ, মুনাফার হার এবং পুঁজির হারের ভাষায় লেখা হয়েছে, তাই এখানে কেবল এই শিক্ষাই দেওয়া হয়। এটাই বোঝানো হয়। এরই উপর কাজ করা হয়। আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য ও ইনসাফ এসে মিশ্রিত হওয়া একটা অসম্ভব বাস্তবতা। এই দৃষ্টিভঙ্গির উরস থেকে যে দ্বিচারিতা প্রকাশ পেয়েছে, সত্য ও ইনসাফ তার অনুগত হয়ে গেছে। ব্যবসাগত ইনসাফ, গণতান্ত্রিক উপকার, মুনাফার হক, স্বার্থের ইনসাফ আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় এমনভাবে অবিভাজ্য যে, এখানে কখনো প্রকৃত ইনসাফ, মানবতার প্রকৃত অধিকার ইত্যকার আওয়াজ কখনো উচ্চকিত হয়নি।

দ্বিচারিতা আমেরিকার নতুন কোনো স্বভাব নয়। কলম্বাস প্রথমদিনই এখানে দ্বিচারিতার বীজ বপন করেছিল। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে সে বীজ থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ আকাশচুম্বী হয়ে আদমখোর বৃক্ষে পরিণত হয়ে গেছে। আজ তাদের দৃষ্টিতে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। দৃষ্টিভঙ্গি আর মূলনীতি ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম বিবেচিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায় ভালো প্রভাব বিস্তার

AL QAMEER

করে। চাই তা মানবাধিকার, সন্ত্রাস দমন কিংবা গণতন্ত্র রক্ষার নামে চালানো হোক না কেন। তাদের গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি যেন প্রোডাক্ট আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে। যেন কর্জ গ্রহণ করতে পারে। দস্তখত করতে জানে এবং কর্জ আদায়ের সামর্থ্য রাখে। আমেরিকান এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জাতির পিতা জর্জ ওয়াশিংটন থেকে জর্জ বুশ পর্যন্ত একইরকম চলে আসছে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘ হতে থাকবে, যতক্ষণ আল্লাহ ঢিলা দেওয়া রশিটা গুটিয়ে না আনছেন।

আমেরিকায় এই দৃষ্টিভঙ্গির সর্বপ্রথম শিকার হয়েছিল রেড ইন্ডিয়ান জাতি। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি, বুদ্ধিজীবী, উপদেষ্টাসহ সমাজনেতারা এই হত্যাযজ্ঞকে অন্যায় বলত। কিন্তু একথাও বলত—এদেরকে হত্যা করা ব্যতীত ওই ভূমিদখল সম্ভব ছিল না। প্রথম পরীক্ষায়ই অর্থনৈতিক মুনাফার চিন্তা সত্য ও ন্যায়বিচারের গলাটিপে ধরেছিল। এর ফলে এমন এক দ্বিচারী ও বোধহীন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে, রেড ইন্ডিয়ানদের নির্মূলকরণ প্রক্রিয়া চলমান থেকে যায়। জোরপূর্বক ভূমি আয়ত্তকরণও অব্যাহত থাকে। সাথে অব্যাহত থাকে তাদের নির্মূলকরণের সমালোচনাও। ধীরে ধীরে এটা একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতিতে পরিণত হয়ে যায়। আমেরিকানরা এ ডাবল স্টান্ডার্ড এমন দক্ষতার সাথে চালিয়ে যায় যে, তাদের আসল উদ্দেশ্যও আয়ত্ত হয় এবং তাদের আইনের উপরও কোনো প্রশ্ন আসে না। না-ই-বা মানবাধিকারের উপর কোনো ধরনের আঘাত আসে; না গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়; না আমেরিকান সমাজব্যবস্থা কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়।

আইন, মূলনীতি, ইনসাফ এবং মানবাধিকার আপন জায়গায় অক্ষুণ্ণ থাকার পাশাপাশি জাতিনির্মূল প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকে। শ্বেতাঙ্গদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধিও অব্যাহত থেকে যায়। এই সফল দ্বিচারী আচরণের প্রেক্ষিতে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি নতুন এই অবস্থানে এসে থামে যে, কথা তো বলব ন্যায়, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার নিয়ে; কিন্তু কাজ করে যাব নিজস্ব স্বার্থকে সামনে রেখে। অর্থাৎ, যা আমাদের স্বার্থ; সেটাই ইনসাফ, সেটাই মানবাধিকার, সেটাই গণতন্ত্র। আজ বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের যে ব্যাপ্টিস্টকরণ প্রক্রিয়া চলমান; এর মূলকথা এটাই।

আজ আমেরিকা হাজার মাইল দূরের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আইন, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু আমেরিকায় আবিষ্কারের পর থেকে ২০০ বছরব্যাপী সেখানে মানবাধিকার যেভাবে ধর্ষিত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে যে পরিমাণ কালি ব্যবহারের প্রয়োজন, তা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। আজকের উদার আমেরিকানদের প্রগতিশীলতার অনুসরণ করতে যেয়ে আমরা সহশিক্ষাসহ চাকরির ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকারের যে জিগির তুলছি, আমাদের নারীদের সাথে হাত মিলিয়ে তারা

আমাদের জন্য অনেক কিছু করে দেবে বলে বিশ্বাস করছি; এমন সুধারণা পোষণকারীদের জানা রাখা উচিৎ যে, এই হাতগুলো সুদ, মুনাফা, আর স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রসারিত হচ্ছে না। এরা এতটা প্রগতিশীল নয় যতটুকু মনে করা হচ্ছে। কৃষ্ণাঙ্গ এবং তাদের সাথে আলাদা আচরণে প্রভাবিত মানুষ এখনও আমেরিকায় যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান আছে। এখনও বিষয়টা এত পুরানো হয়ে যায়নি যে, তা ভুলে যাওয়া যায়।

আমেরিকান প্রগতিশীলতা প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ সংকীর্ণতা তা অনুমান করা যায় না। শরীর ও যৌনাঙ্গের উলঙ্গপনাকে প্রগতিশীলতা বলে দাবিকারীরা আর যা-ই হোক, সৎ হতে পারে না।

একবিংশ শতাব্দীতে যে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার দরকার, তা মানবরচিত আইনের পরিবর্তে কুরআনের পৃষ্ঠায় সংরক্ষিত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে শেষ পর্যন্ত তার সামনেই মাথা নত করতে হবে। মানবতাকে বাঁচাতে হলে তারই আশ্রয় নিতে হবে। ইনশাআল্লাহ একবিংশ শতাব্দী হবে কুরআনের দিকে ফিরে আসার শতাব্দী। ভার্জিনিয়ার বাজারে নিলামে উঠানো দাসদের হাহাকার থেকে নিয়ে ভার্জিনিয়ার ইউনিভার্সিটিতে রক্ত আর মাটিতে লুটিয়ে আর্তনাদকারী ছাত্র-শিক্ষকসহ সবাই চিৎকার করে বলছে—কোথায় আজ ধোঁকাখাওয়া কান, যারা নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি শুনছে!

আমেরিকান এক প্রফেসরের পর্যবেক্ষণ

রমজান মাস ইবাদত, তিলাওয়াত, দান-খয়রাত এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস। এ মাসে ওই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু কিছু বিষয় এমন থাকে যেগুলো জোরপূর্বক দৃষ্টিকে তার দিকে আকর্ষণ করে নেয়। একটা কথা যদি দশবার বলা হয়, তাহলে একাদশবারের সময় তা শুনতে মানুষ বাধ্য হয় যায়। তার মধ্যে থাকা বিভীষিকার ব্যাপারটি অনুধাবন করে তটস্থ হয়।

কেউ যদি প্রশ্ন করে প্রিয় নবি সা.-এর বেদনাদায়ক ইনতেকালের পর থেকে উম্মাহর সামনে সবচে বেদনা ও চিন্তা উদ্রেককারী ঘটনা কোনটি? তাহলে আমি নির্দ্বিধায় জবাব হচ্ছে—১৪০০ বছর পর আরব উপদ্বীপে ইহুদ ও নাসারাদের সশস্ত্র উপস্থিতি। এর ভয়াবহতার মোকাবিলায় হালাকু খানের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হওয়া এবং শেষ আব্বাসি খলিফার হত্যা কোনো ব্যাপারই নয়। আন্দালুসিয়ার মুসলিম নির্মূলকরণ এবং সেখান থেকে জোরপূর্বক মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া নিতান্তই গৌণ বিষয়। এটা এমন এক ভয়ংকর ঘটনা, দুম্বে নামী ইহুদি গোত্রের আতাতুর্কের হাতে খেলাফতে উসমানিয়ার বিলুপ্তি ও স্পেনের রক্তপিপাসু ক্রুসেডারের অধস্তন-পুরুষ জর্জ বুশের হাতে ইসলামি ইমারাহ আফগানিস্তানের পতনও অতি সাধারণ ব্যাপার।

হুজুর সা. তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মুসলমানদের যে কটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন সেগুলোর শীর্ষে ছিল—'তোমরা ইহুদ ও নাসারা জাতিকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও!'[৭৫] আরব ভূখণ্ড মূলত ইসলামের জন্মভূমি। সেখানে দুটি ধর্ম থাকতে পারে না। সেখানে কেবল ইসলাম এবং মুসলিম থাকবে। ইসলামের শত্রুদের সেখানে আসতে দেওয়া ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে গাদ্দারি বৈ কিছু নয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে আরব থেকে ইহুদ ও নাসারাদের পূর্ণভাবে বহিষ্কারের পর ইসলামের ইতিহাসে ১৯৯১ সালেই সর্বপ্রথম এই অপমানজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, আলে সউদের সরকার সাদ্দাম হুসাইনের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার অজুহাতে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যদের ডেকে এনেছে। আর আজ

৭৫ বুখারি: ৩০৫৩; মুসলিম: ১৬৩৭।

১৬ বছর পর[৭৬] সাদ্দাম হুসাইন থেকে জায়নবাদীরা প্রতিশোধ নেওয়ার পর্ব সমাপ্ত করার পরও না ফিরে যাবার নাম নিচ্ছে, না হারামাইন শরিফাইনের পবিত্র ভূমিকে তাদের নাপাক পদচারণা থেকে মুক্ত করছে।

নজদি সাউদি সরকার বলছিল—এদের আগমন অস্থায়ী, এরা নিরাপত্তা দানের জন্য এসেছে। আর তারাও সাউদি সরকারের সুরে সুর মিলাচ্ছিল। কিন্তু চিন্তাশীল মুসলিমসমাজ এক মুহূর্তের জন্য নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত নয়। আল্লাহ এবং আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ সাক্ষী যে, এই আশঙ্কা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠছে। খাইবারের পরিত্যক্ত কেল্লার পাশে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রত্যাবর্তনকালীন উৎসব এবং আমেরিকান সৈন্যকর্তৃক পাঁচ বছর অবস্থানের পর সৌদির নাগরিকত্ব লাভের আবেদন এবং জাপানের অকিনাওয়া দ্বীপের জরিমানা-সংক্রান্ত ঘটনা অব্যাহত যে আশঙ্কার ঘণ্টা বাজিয়ে চলছে, তারপরও মুসলিম উম্মাহকে হুঁশে আসতে দেখা যাচ্ছে না।

অকিনাওয়ার সংবাদে যাবার আগে পাঠকদের একজন বিখ্যাত রুশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান প্রফেসরের আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগের একটি পর্যবেক্ষণ শোনাতে চাই। হয়তো মোল্লা-মৌলভিদের চেঁচামেচি অপেক্ষা আমেরিকান প্রফেসরের পর্যবেক্ষণ গুরুত্ব পাবে। অন্তরে চিন্তার ঢেউ তুলবে।

প্রফেসর লানা ক্লাশিনকোভকে ১৯৮২ সালে থামিস্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি সাইবেরিয়া থেকে জুইস অকসোডস প্রোগ্রামের আওতায় সাইবেরিয়া থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৮০-এর দশকের প্রারম্ভে আমেরিকান ইহুদিরা জুইস অকসোডস নামে একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল—রুশদের লাল থাবায় আটকে থাকা ইহুদি স্কলারস, প্রফেসরস, লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের বের করে এনে আমেরিকা কিংবা ইসরাইলে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া। এ পর্যায়ে মি. লানা ক্লাশিনকোভের নাম ছিল শীর্ষে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছিল তার ইহুদিবাদের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। রুশ সরকার লানা ক্লাশিনকোভের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে দেয় যে, যেহেতু তার স্বামী কট্টর ইহুদি ছিলেন এবং তার নিহত পুত্রদ্বয় স্বঘোষিত ইহুদি ছিল; তাই তাকেও ওই ইহুদিদের দলে গন্য করা হোক—যারা আমেরিকা যাচ্ছে।

ঘটনাটি হঠাৎ পুরো সাইবেরিয়া তোলপাড় করে তোলে। কথার পিঠে কথা চলতে থাকে। ইহুদিদের বিভিন্ন সংস্থা এবং মানবাধিকারে চ্যাম্পিয়নরা প্রফেসর লানা ক্লাশিনকোভকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার জন্য নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস এবং

[৭৬] যখন বইটি রচনা করা হয় তখনকার সময় বলা হচ্ছে।

কানাডা থেকে ইসরাইল পর্যন্ত সর্বত্র আন্দোলন জোরদার করে তোলে। ইহুদিদের চাপে আমেরিকা সরকারও চাপ প্রদানে যোগ দেয়। তখন রাশিয়া বিচ্ছিন্নতার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল।

ডুবন্ত জাহাজে একটা ইঁদুরও থাকতে চায় না। রুশ ইহুদিরা জাতিতে রুশ হলেও তাদের বড় পরিচয় ছিল তারা ইহুদি। রুশদের পরাজয় ও ভেঙে টুকরো টুকরো হবার এ দুঃসময়ে অসংখ্য রুশ সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং জুইস অকসোডসের অন্তহীন প্রচেষ্টায় অজস্র অ-ইহুদিও ইহুদি সেজে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সন্দেহযুক্ত ইহুদিদের মধ্যে মিসেস লানা ক্লাশিনকোভও ছিলেন একজন। আমেরিকায় এদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং দ্রুতই এরা আমেরিকার বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলোতে ঝাঁকিয়ে বসে। কেউ হার্ভার্ডে যোগ দেয় তো কেউ প্রিন্সটনে। কেউ ইউনিভর্সিটি অব শিকাগোতে। কেউ স্ট্যানফোর্ডে। প্রফেসর লানা ক্লাশিনকোভ নর্দান এলিনুইস ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পান। লানা ক্লাশিনকোভ ছিলেন বিখ্যাত রুশ জেনারেল মিখাইল ক্লাশিনকোভ পরিবারের সন্তান। সম্পর্কে ছিলেন মি. ক্লাশিনকোভের ভাতিজি। ইনিই ছিলেন সেই ক্লাশিনকোভ, যিনি ক্লাশিনকোভ রাইফেল আবিষ্কার করেছেন।

প্রফেসর লানা ক্লাশিনকোভ ছিলেন পরিসংখ্যান-শাস্ত্রের এক জীবন্ত বিস্ময়। পরিসংখ্যান বর্ণনায় তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি গ্রাফ, প্রতিটি লাইন, প্রতিটি কৌণিক অবস্থানের বর্ণনা, প্রতিটি গড় ও অনুপাত শুধু মানুষের দৃষ্টিই আকর্ষণ করতো না; বরং সবাইকে গম্ভীর হয়ে ভাবতে বাধ্য করতো। তিনি তার পরিসংখ্যান এনালাইসিসে যেসব তথ্য-উপাত্ত পেশ করতেন তা ছিল অনেকটা নির্ভুল। এ ছাড়া মিসেস লানা ক্লাশিনকোভের কাছে লোমকুপ দাঁড় করানোর মতো তথ্যভান্ডার ছিল। তিনি সেগুলো অল্পই প্রকাশ করতেন। তিনি ওই প্রফেসরদের থেকে ভিন্ন ছিলেন; যারা নিজেদের জ্ঞানের মাত্রা অনুপাতে শিক্ষা দান করতেন এবং একই মাপদণ্ডে ছাত্রদের যাচাই করতেন। মিসেস প্রফেসর কিন্তু ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। তবে মাঝে মাঝে তথ্য-গবেষণা এবং অনুপাত ও গড়ের নাটকীয় উপস্থাপনা দ্বারা সবাইকে চমকে দিতেন। পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত তার বিস্ময়কর কিছু উপস্থাপনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে :

* বিশ্বের ২১ শতাংশ মোটাদের মুটিয়ে যাবার পেছনে খাদ্যস্ফীতি এবং অধিক খাদ্যগ্রহণ দায়ী। অপরদিকে ২১ শতাংশ মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যঘাটতি এবং স্বল্পাহারের দরুন দুর্বলতা ও বহুবিদ রোগের শিকার। যদি এমন কোনো ম্যাকানিজম আবিষ্কার করা যেত, যা উক্ত খাদ্যস্ফীতি ও খাদ্যঘাটতিকে সমান

অনুপাতে নিয়ে আসে, তাহলে ৪২ শতাংশ মানুষের খাদ্যসংক্রান্ত জটিলতা ও তৎসঙ্গে রোগব্যাধির সমস্যা দূর হয়ে যেত।

* আমেরিকার ডাস্টবিনগুলোতে দৈনিক ১ লাখ ৮০ হাজার টন ফেলা দেওয়া খাদ্যোপযোগী সামগ্রী দ্বারা পুরো বিশ্বের তিন চতুর্থাংশ অনাহারী মানুষের অন্নের সংস্থান করা সম্ভব।

* একজন শহুরে আমেরিকান দৈনিক গড়ে ১৪৮ গ্যালন পানি ব্যবহার করে থাকে। অথচ পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ মানুষ দৈনিক গড়ে মাত্র ২২ গ্যালন পানি ব্যবহার করে থাকে। ফলে ২০১৫ সালের পর থেকে নীতি, ধর্ম, ভূমি, ক্ষমতা ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও কেবল খাদ্য ও পানীয় নিয়ে বিশ্বে সংঘাতের বাজার গরম হয়ে ওঠবে।

* আমেরিকার জনবসতি বিশ্ব জনবসতির মাত্র ৫%। কিন্তু এই পাঁচ শতাংশ মানুষ বিশ্বের ৫৮% উৎপাদনমাধ্যম ব্যবহার করছে। এভাবে বিশ্বের ৯৫% মানুষের জন্য মাত্র ৪২% উৎপাদনমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ থাকছে। আর এই পাঁচ শতাংশের মালিকানায় রয়েছে বিশ্বের ৬১% উৎপাদনমাধ্যম।

* বিশ্বের মাত্র পাঁচ শতাংশ উচ্চবিত্তের অধীনে রয়েছে বিশ্বসম্পদের ৫২ শতাংশের মালিকানা। বিপরীতে বিশ্বের সবচে নিম্নবিত্তের অধিকারী ৫% মানুষের মালিকানায় রয়েছে বিশ্বসম্পদের মাত্র ১ শতাংশ। ১ আর ৫২-এর এই অনুপাত নিত্য বর্ধনশীল।

* আমেরিকার ৩০০ বিলিয়নিয়ারদের সম্পদের পরিমাণ বিশ্বসম্পদের অর্ধেকের বরাবর। অজানা কারণে বিলিয়নিয়ারদের সংখ্যা বেড়ে চলছে এবং বিশ্বসম্পদের অর্ধেকে হ্রাস পাচ্ছে। এ অনুপাত অক্ষত থাকলে ২০১০ সাল নাগাদ আমেরিকান বিলিয়নিয়ারদের সম্পদেব পরিমাণ দাঁড়াবে বিশ্বসম্পদের ৮০%।

* একদিকে যেমন আমেরিকান বিলিয়নিয়ারদের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। বর্তমান দশকে এই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর বার্ষিক মুনাফা হচ্ছে ৫০০ বিলিয়ন ডলার; যা বিগত সত্তরের দশকের তুলনায় ১৭% বেশি।

* বিশ্বের অস্ত্রবাজারে যে পরিমাণ পুঁজি ব্যবহৃত হচ্ছে, এর মাত্র এক শতাংশ দ্বারা পুরো আফ্রিকা মহাদেশের খাদ্য ও বস্ত্র সংকট মেটানো সম্ভব।

- একজন আমেরিকান গড়ে ২ জন জাপানির, ৬ জন মেক্সিকানের, ১৩ জন চীনার, ৩৫ জন ভারতীয়ের, ৪০০ জন ইথিউপিয়ানের, ২৯ জন পাকিস্তানির, ১৩৬ জন বাংলাদেশির এবং ৩১৫ জন তানজানির সমপরিমাণ উৎপাদনমাধ্যম ব্যবহার করছে। অথচ ওই আমেরিকানের দৈনিক আয়ের মাত্র ৯% খাদ্যখাতে খরচ হচ্ছে এবং উল্লেখিত রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীদের গড়ে ৭২% আয় খাদ্যখাতে ব্যয় হচ্ছে।

আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন এই পরিসংখ্যান এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে চিত্মাকর্ষণ এবং গবেষণার বিষয়গুলো কী সুন্দরভাবে একত্র করা হয়েছে। কিন্তু ড. প্রফেসর মিসেসের যে পর্যবেক্ষণ পড়ে লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায় এবং যে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার জন্য এ দীর্ঘ আলোচনা সেটা হচ্ছে—

'৫% আমেরিকান বিশ্বে উৎপাদিত তেলের মোট ২৫% ব্যবহার করছে। অথচ আমেরিকার নিজস্ব তেল উৎপাদন ও ব্যবহারের হার ৪০%। আমেরিকার তেলকূপগুলোতে উৎপাদন উপযোগী তেলের মোট পরিমাণ আনুমানিক ৬৭ বিলিয়ন ব্যারেল। আমেরিকাকে বার্ষিক ৩ বিলিয়ন ব্যরল তেল ব্যবহার করতে হয়। এই অনুপাতে তেল উৎপাদন হতে থাকলে আমেরিকার তেলকূপগুলো ২০০৭ নাগাদ শুকিয়ে যাবার কথা। এরপর আমেরিকার অর্থনীতির নিঃশ্বাস বাঁচাতে হলে তাকে প্রান্তিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। হয়তো বিকল্প জ্বালানির পথ ধরতে হবে অথবা মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদে জোরপূর্বক হলেও মালিকানা দাবি করতে হবে। এ ছাড়া আমেরিকার তেল ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং কোটা-সিস্টেম প্রয়োগ করতে হবে।'

এবার চলুন জাপান থেকে আগত সেই সংবাদ পর্যালোচনা করে নিই, যা এই প্রবন্ধ লেখার অন্যতম কারণ।

'অকিনাওয়া সেনাঘাটি প্রত্যাহারের পর আমেরিকা জাপানের কাছে ২৩ বিলিয়ন ডলার দাবি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা জাপানে এ ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। সেখানে হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্য বসবাস করছিল। সেখানে এয়ারবাস এবং ইন্টিলিজেন্সের প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল। লীজের মেয়াদ সমাপ্তির পর জাপান আমেরিকার কাছে সেনাঘাঁটি প্রত্যাহারের আবেদন জানায়। তখন আমেরিকা জাপানের কাছে ঘাঁটি প্রত্যাহার বাবদ খরচ বহনের দাবি করে বসে। আমেরিকার এ দাবি জাপানি জনগণকে প্রচণ্ড উত্তেজিত করে তুলে।

এটাই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানি জনগণ কর্তৃক আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ঘটনা।'

জাপানি জনগণ তো অন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। কিন্তু কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কি আমেরিকার কোনো অন্যায়ের মোকাবিলায় এভাবে সোচ্চার হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়? অথচ সেখানে ঘটনাটা কেবল একটা পরিত্যক্ত দ্বীপ নিয়ে আর এখানে বিষয়টা হচ্ছে ইসলামের পবিত্রভূমি ব্যবহার নিয়ে। মানলাম ব্রিটিশের আশীর্বাদে হেজাজ থেকে খেলাফতে উসমানিয়ার পতন ঘটিয়ে নজদি শাসকরা তাদের ক্ষমতাভিক্ষার পরিবর্তে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে, কানে তুলো গুঁজে নিয়েছে। পিঠে কুলো বেঁধে নিয়েছে। কিন্তু পুরো উম্মাহর হলোটা কী? তারা এ ব্যাপারে এত নিশ্চুপ কেন? অনাগত কোনো একদিন যদি আমেরিকা শাহ আবদুল আজিজের কোনো সন্তানের কাছে জাপানের মতো অন্যায্য কোনো দাবি করে বসে, তখন হবেটা কী? মুসলমানরা কেবল এইটুকু জানে—এবার হজ মৌসুমে সউদ পরিবারের সরকার এই পরিমাণ ভিসা কমিয়ে দিয়েছে, হজের কাজ তদারক করার জন্য অমুক অমুক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। অথচ এ সিদ্ধান্তগুলো তোতাপাখির ঠোঁটের মতো নাকওয়ালা সৌদি সরকারি কর্তৃপক্ষের নয়। এটা রুজু ইলাল্লাহ এবং হারামাইনের প্রতি উম্মাহর অন্তর থেকে আবেগ কমিয়ে ফেলার আমেরিকান একটি চক্রান্ত। কিন্তু কথা হচ্ছে খাদিমুল হারামাইন যদি 'খাদিউল হারামাইন' (হারামাইনের ধোঁকাবাজ) হয়ে ওঠে, তারা হারামাইনের সেবার পরিবর্তে ক্ষমতার স্বার্থে আমেরিকার সেবায় লেগে যায়, তাহলে উম্মাহ কি তাদের ছাড় দিতে পারবে? না দেওয়া উচিৎ হবে? আমার রব!

আমরা এ কেমন দ্বিচারী স্বভাবের মুসলমান হয়ে গেলাম। জাপানিদের সাথে আচরণের সংবাদ শুনে মনে হচ্ছে প্রফেসর লানা ক্লাশিনকোভের কথাই ফলতে যাচ্ছে যে, ২০০৭ সালের পর আমেরিকাকে তার অর্থনীতির শ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রান্তিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তের একটি কি মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদে আমেরিকার মালিকানা দাবিও একটি হতে যাচ্ছে?

হে আমার জাতি! তোমাদেরকে হারামাইনের আর্তনাদ শোনাতে শোনাতে ১০টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই কথাগুলো কি এতটুকু গুরুত্ব রাখে না যে, একটিবারের জন্য তা মনোযোগ দিয়ে শোনা যায়? রমজানের মাসে উম্মাহর অসহায় এক সদস্যের এটাই শেষ আর্তি—যেন উম্মাহ সজাগ হয়।

কথা বলছি 'আল ফুজায়রা' নিয়ে। এটি বাগদাদের নিকটবর্তী একটি শহরতলী। যেখানে একটি বড় গ্রাউন্ডে রয়েছে গাড়ির বিশাল কবরস্থান। ইতঃপূর্বে আমরা জেদ্দার সন্নিকটে এমন একটি কবরস্থানের আলোচনা শুনেছি, যেখানে রাজপরিবারের যুবকদের হাতে খেলনার মতো ব্যবহৃত নতুন মডেলের গাড়িগুলো নষ্ট হবার পর ফেলে দেওয়া হয়। এগুলোর অধিকাংশই বিশ্বখ্যাত মোটর কোম্পানিগুলোর একেবারে জিরো মডেলের গাড়ি। এগুলোকে যখন 'শেরশাহি মিস্ত্রির'[১৭] হাওয়ালায় ছেড়ে দেওয়া হয় তখন অতি অল্পদিনেই সেগুলো আপন চেহারায় ফিরে আসে। এগুলো অর্জনের জন্য আমাদের আত্মবিক্রিত রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও সচেষ্ট হয়ে থাকেন। সৌদি রাজপরিবারের সন্তানরা যদি গতি ও কার্যক্ষমতার ব্যাপারে এগুলোকে দাগী মনে করে থাকে, তাহলে দাগ মেটানোর পরিবর্তে এগুলো থেকে প্রাণের মুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর এভাবে ওই কবরস্থানে আরেক লৌহশবের[১৮] বৃদ্ধি ঘটে। এই পরিমাণ অপচয় এবং সম্পদের এমন অনর্থ নষ্ট আলাদা একটা বেদনাদায়ক ঘটনা।

কিন্তু পাঁচ কিলোমিটার বিস্তৃত আল ফুজায়রায় একত্রিত বিপুল পরিমাণ গাড়ি সউদি আমিরজাদাদের অপচয় আর ভোগবিলাসের স্বাক্ষর নয়; বরং ইরাকি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টার এক অমোচনীয় দলিল। এগুলো সেই গাড়ি, যেগুলো যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। যৌথবাহিনী ঘটনার আলামত মিটিয়ে ফেলার জন্য ওইগুলো তাৎক্ষণিকভাবে উঠিয়ে নিয়ে শহরের বাইরে ড্রাম্প করে দেয়। জেদ্দার কবরস্থান অপেক্ষা এখানকার কবরস্থানে লৌহশবের মিছিল দ্রুত বর্ধনশীল। কবরস্থান দুটি আমাদেরকে আলাদা আলাদা কাহিনি শোনায়। ভবিষ্যতের কোনো ঐতিহাসিক যখন আজকের ইতিহাস লেখায় হাত দেবে, তখন তারা এ শিক্ষণীয় বিষয়কে উপেক্ষা করতে পারবে না। এ উভয় কবরস্থান আজকের যুগের অনুসন্ধানী গবেষকশ্রেণির জন্যও গবেষণার যথেষ্ট উপাদান রাখে এবং লেখকদের জন্য কলমের ক্যারিশমা দেখানোর অনেক উপাদান দিতে সক্ষম। কিন্তু আমাদের এখানে তো এমন লেখক হুমা পাখিতুল্য; যারা কলমের সম্মান বজায় রেখে গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা নিজেরে থিসিসকে সাজাতে ভালোবাসেন।

---

[১৭] মালদহের শেরশাহী এলাকায় একটি গ্রিল ফ্যাক্টরির আড়ালে কতিপয় দুস্কৃতিকারী আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করতো। এরা পুরাতন গাড়িকে ভেঙে নতুন গাড়ি বানাতো।

[১৮] ভাঙা মোটরগাড়ি।

বিগত এক কলামে উল্লেখ করা হয়েছিল—*হুয়ে তুম দোস্ত জিসকে* বইয়ে সাহিত্য, অনুসন্ধান এবং ইতিহাস গবেষণার ব্যাপারটি এমন চমৎকার আঙ্গিকে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে যে, লেখাটা পড়লে মন অযাচিতভাবেই লেখককে ধন্যবাদ দিতে চায়। ওই বইয়ে স্পেনের পতন থেকে আমেরিকা আবিষ্কার পর্যন্ত ইতিহাসে লুকিয়ে সত্যকে এমনভাবে টেনে এনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেগুলো জানলে আমাদের জনগণের চিন্তার আঙ্গিক, আমাদের জ্ঞানী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের শাসকশ্রেণির কিবলা ঠিক করে নেওয়া সহজ হয়ে উঠবে।

কথা হচ্ছিল দুটি কবরস্থান প্রসঙ্গে। প্রতি ভোরে সূর্য যখন কবর দুটির গায়ে আলো বিকিরণ করে, তখন মনে হয় যেন নীরব এই শহরবাসীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। আর এই বৃদ্ধির হার দিন দিন কেবল গতিশীল হয়েই চলছে। চলমান বসন্তে খুব সম্ভব অনুরূপ তৃতীয় আরেকটি কবরস্থান জন্ম নিতে পারে এবং সেটা আমাদের পাশেই। মি. বুশ ভালো করেই জানেন। কারণ তার ভাষায়—'আমি জানি, আমেরিকান জনগণ ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছে।' মূলত তিনি বলতে চাইছেন—'জানি, আমেরিকান সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে।' তাই তিনি সেখানে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, তার মতো সচেতন একজন মানুষ এবং আমেরিকানদের মতো দূরদর্শী একটি জাতি কেন নিজেদেরকে এই যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছে? এই অসাধ্য সাধনের জন্য কোন কালোহাত সক্রিয় এবং কোন অজ্ঞাত প্রেরণা তাদেরকে এ ব্যাপারে সক্রিয় রাখছে?

কথা হলো, আমেরিকার অস্তিত্ব যে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা লোভ এবং কামনা হয়ে তাদের স্বভাবের অনুসঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে। দুর্বল জাতির রক্ত তাদের কখনো শান্তিতে বসে থাকতে দেয় না। অনেক পাঠকের কাছে এই পর্যবেক্ষণ অদ্ভুতুড়ে, অযৌক্তিক লাগতে পারে। মনে হতে পারে এটা গোঁড়ামি মানসিকতার প্রতিফলন। কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত না দিয়ে আগে আমেরিকা আবিষ্কার এবং তার বেড়ে ওঠার কাহিনি শুনুন; অতঃপর সিদ্ধান্ত দিন। অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য ধরুন।

১২ অক্টোবর কলম্বাস তার ধারণামতে এশিয়ার পূর্ব উপকূলে জাহাজের নোঙর ফেলেছিল। যদিও বাস্তবে সেটা ছিল উত্তর আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটি। তার অজ্ঞতা এবং সৌভাগ্য একই সাথে সুন্দর ফল নিয়ে আসে। সে উত্তর-আমেরিকার প্রশস্ত ভূমি রানি ইসাবেলার নামের সাথে সম্পৃক্ত করে নিতে সফল হয়। পূর্ব-এশিয়ায় পৌঁছার জন্য পশ্চিমদিকে জাহাজ চালিয়ে ছিল। তার ধারণা ছিল, সে কুবলাই খানের চীন অথবা পাশ্ববর্তী সিপাঙ্গু (জাপান) এসে পৌঁছেছে। অথচ সে পৌঁছেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ খ্যাত দ্বীপপুঞ্জে।

কলম্বাস কিউবা, বাহামা এবং জ্যামাইকাকে কুবলাইখানের রাজ্য মনে করতো। জীবনের শেষ-অবধি কলম্বাস এ ভুলের উপরই অটল ছিল। কলম্বাস ওয়েস্ট ইন্ডিজের গোয়ানাহানি দ্বীপে সর্বপ্রথম পা রেখেছিল। বর্তমানে যেটিকে ডেমেনিকান রিপাবলিক বলা হয়। গোয়ানাহানি দ্বীপে পা রাখা-মাত্রই প্রথম যা দেখতে পায় সেটা হচ্ছে—ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দা অ্যারাওয়াক গোত্রের আমেরিকান ইন্ডিয়ান; যাদেরকে সে পরবর্তীতে রেড ইন্ডিয়ান বলতো। গোয়ানাহানি এবং তৎসংলগ্ন দ্বীপকে বর্তমানে সান সালভাদর বলা হয়।

অ্যারাওয়াক রেড ইন্ডিয়ানদের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বন্ধুত্ব ও ভদ্রতাপূর্ণ। এখানকার দ্বীপগুলোতে আগে থেকেই হাজার হাজার লোকের বসতি ছিল। তারা তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করতো। নিজেদের ধর্ম, প্রথা-পদ্ধতির পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতি লালন করতো। এ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতার পরও কলম্বাস উক্ত দ্বীপগুলোতে স্পেনের রাজশাসন দাবি করে বসে। এরপর এলাকাকে স্পেনিশ নাম সান সালভাদর আখ্যা দিয়ে নিজ অনুমান অনুযায়ী স্থানীয় জনগণকে ইন্ডিয়ান বলে পরিচিতি দেয়। স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ সম্পর্কে কলম্বাস তার দিনলিপিতে লেখে—

> 'তারা আমাদের কাছে রঙবেরঙের পাখি, তুলোর গাঠুরি, ধনুকসহ অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসে এবং এর বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে ঘাড়ের ঘাড়ে ঝুলাবার ঘন্টি এবং সীসার তৈরি ঝালর নিয়ে যায়। এরা বস্তুর বিনিময়ে বস্তু দ্বারা লেনদেন করতো। এদের শারীরিক কাঠামো শক্ত। দেখতে বাহাদুর এবং সুস্থ ও সবল মনে হয়। এদেরকে ক্ষতিকর মনে হয় না। এদের যেমন অস্ত্রজ্ঞান নেই, তেমনি এরা কোনো ধরনের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ছিল না। আমি আমার তলোয়ারটা এদের সামনে তুলে ধরলে এদের অনেকেই এটা স্পর্শ করতে যেয়ে নিজেদের হাত এবং অঙ্গুলি আহত করে ফেলে।
>
> সেখানে তখনো লোহার ব্যবহার শুরু হয়নি। এদের তির আর ধনুক কাঠ এবং বাঁশের তৈরি। আমার ধারণায় এরা ভালো সেবক এবং উত্তম দাস হিসেবে প্রমাণিত হবে। আমরা মাত্র ৫০ জন এদের পুরো বসতির উপর বিজয় অর্জন করে এদেরকে দাস বানিয়ে নিতে পারি।'

কলম্বাসের সংক্ষিপ্ত এই দিনলিপি অনাগত পাঁচ শতাব্দীকে যে পরিমাণ প্রভাবিত করে, যে পরিমাণ মনুষ্য রক্ত বহানোর কারণ হয়ে ওঠে; ইতিহাসের কোনো লেখা এতোবড় ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে এনেছে কি না সন্দেহ। তখন থেকে জন্ম নেওয়া ভালো

সেবক আর উত্তম দাস অর্জনের অভিলাষ তাদেরকে হিংস্র ও উন্মাদ বানিয়ে তুলে এবং আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে সহজ-সরল ও দুর্বল রেড ইন্ডিয়ানদের উপর বিজয়ী হবার বিশ্বাস কলম্বাস এবং তার পৃষ্ঠপোষকদের দেশে দেশে হামলা চালিয়ে অর্থ ও ভূমি অর্জনের লোভকে শান্ত করার জন্য উৎসাহিত করে তুলে। মানবতাবিরোধী এই দৃষ্টিভঙ্গি কলম্বাসের পৃষ্ঠপোষক উত্তরাধিকারদের মধ্যে আজও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বের মজলুমরা আজ সেই কাঙ্ক্ষিত প্রহরের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ।

১৫ মার্চ ১৪৯৩ যখন বিজয়ী হিসেবে কলম্বাস স্পেনে ফেরত আসে, তখন স্পেনের দেহসজ্জা সম্পূর্ণ পালটে যায়। যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ইসাবেলা কলম্বাসের পৃষ্ঠপোষকতার ভার নিয়েছিল, তার সমুদ্র অভিযানে অর্থ ব্যয় করেছিল; সেটা ষোলো আনা পূর্ণ হয়। ফেরত আসার সময় কলম্বাসের সফরসামগ্রীর সাথে স্বর্ণের বার, রোপার টুকরো, মতির মতো উজ্জ্বল দুর্লভ সোনা, ভুট্টার চারা, তামাক, রঙবেরঙের কিছু পাখিসহ হতভাগা ১০ জন রেড ইন্ডিয়ানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসাবেলাকে দেখানোর জন্যই সে এদেরকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল।

সমুদ্র অভিযান থেকে ফিরে আসার পর কলম্বাসকে রিয়্যার অ্যাডমিরাল হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সম্মানের পাশাপাশি বার্সালোনার রাজপ্রাসাদে তাকে ইসাবেলা এবং ফার্দিনান্দের রাজকীয় অতিথি হিসেবে থাকার সুযোগ প্রদান করে।

এই সেই কলম্বাস, যে চুক্তি করার সময় সর্বক্ষণ ইসাবেলার সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। এখন সে নিঃসংকোচে রাজা ও রানির পাশের পাশে বসে রোস্টের টুকরোয় দাঁত বসাচ্ছিল। তার সামনে রাখা ছিল বিভিন্ন প্রকার মদের পেয়ালা এবং সুন্দরী ক'জন সেবিকা। কলম্বাস নয়া দুনিয়া আবিষ্কার সংক্রান্ত তার অভিজ্ঞতা, সফরের বিভিন্ন ঘটনাবলি, সফরের কষ্ট এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরছিল। কলম্বাস একটি লিখিত প্রতিবেদন ইসাবেলার সামনে তুলে ধরেছিল। প্রতিবেদনটিকে একজন ভাইসরয় কর্তৃক রাজদরবারে উত্থাপিত রেকর্ড হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনে কলম্বাস লিখেছিল—

> 'রেড ইন্ডিয়ানরা নিজেদের প্রতিরক্ষার যোগ্যতা রাখে না। এদেরকে না-দেখে এদের সরলতা অনুমান করা কঠিন। এদের কাছে কিছু চাইলে তারা তা দিতে মোটেও কুণ্ঠিত হয় না। জমি এবং উপকরণ কারও চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকতে পারে না; বরং সেখানে সামগ্রিক মালিকানা এবং যৌথব্যবহারের বিধান প্রয়োগ্য। যুগের পরিবর্তনে ব্যবহারকারীর পরিবর্তন ঘটতে পারে। মৃত্যু এবং স্থানান্তর প্রক্রিয়ায়

সেখানে নতুন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা কোনো সম্পদের উপর উত্তরাধিকারসূত্রের মালিকানা দাবি করতে পারে না। রাজা ও রানি আমাকে সদয় সহায়তা দিলে আমি তাদের জন্য নতুন আবিষ্কৃত ওই ভূখণ্ড থেকে এত বিপুল পরিমাণ সোনা-রোপার যোগান দিতে পারব, যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আর সেখান থেকে যত ইচ্ছা তত দাসের বন্দোবস্ত করে দিতে পারব।'

আমেরিকার তথাকথিত সুসভ্য মানবাধিকার উন্নয়নের প্রত্যাশী মিশনারিদের যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্যের পরতে পরতে ছিল জুলুম, মানবাধিকার লঙ্ঘনের উন্মাদনা, লোভ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের গরল। আজ সেই ব্যক্তিই আমেরিকানদের কাছে হিরো; যে লোকটি সরল, অক্ষতিকর এবং নিজের প্রতিরক্ষায় ব্যর্থ অসহায় লোকগুলোকে গোলাম বানানোর পরিকল্পনাকারী ছিল। তাদের জমিজমা কুক্ষিগত করার এবং স্বাধীনতা হরণের দুষ্ট অভিপ্রায় কার্যকরকারী ছিল।

আজ আমেরিকার সর্বত্র সেই নষ্ট লোকটির ভাস্কর্য এবং প্রশংসাগাঁথা-ফলক শোভা ছড়াচ্ছে। আমেরিকার দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কলম্বাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক ১০৫টি ভাস্কর্য, ১৪০টি প্রশংসাগাঁথা পাথরলিপি, ২০টি কাষ্ঠফলক শোভা ছড়াচ্ছে। কলম্বাসের স্মরণে ভাস্কর্যের এ ধারাবাহিকতা স্পেন থেকে শুরু হয়ে ইতালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়ে উত্তর আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ইউরোপের সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আজ এই দেশগুলোতে কলম্বাসের ৫০০-এর মতো ভাস্কর্য, এবং ২ হাজারের মতো স্মৃতিফলক তাকে সম্মান জানিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমেই আমেরিকান জাতির লোভ আর জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমেরিকায় কলম্বাসের মূর্তির পাশাপাশি ইসাবেলার মূর্তিও বিদ্যমান। এই হিংস্র নারী অসংখ্য মুসলিম এবং রেড ইন্ডিয়ানদের রক্তের দায়ী হওয়ার পরও আমেরিকা আবিষ্কারের স্পন্সর হবার কারণে সেখানে তার এই সম্মান। যেহেতু আমেরিকা আবিষ্কারে ইসাবেলার সম্পর্ক ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সে অর্থ লগ্নি করেছিল এবং অর্থ পেতে চাইছিল; তাই বোধয় ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত আমেরিকার সবচে বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ফেডারেল র‍্যাযরো বোর্ড'-এর পাশে ইসাবেলার বিশাল একটা ভাস্কর্য দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

কলম্বাস কর্তৃক লোভ দেখানোর ফলে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা তার আবেদন ফেলতে পারেনি। তারা তাকে দ্বিতীয়বার সেখানে যাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয়। কলম্বাস যখন ২৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো আমেরিকার দিকে যাত্রা করে, তখন তার জীবন ছিল উন্নতির শীর্ষে। স্পেনের রিয়ার অ্যাডমিরাল হিসেবে তার

অধীনে রওয়ানা হয় ১৭টি জাহাজের একটি বহর। এই সফরের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল উচ্ছেদ, কলোনি প্রতিষ্ঠা, বিজয় এবং ভূমিদখল। খুব সম্ভব এ কারণেই ১ হাজার ২০০ লোকের মধ্যে বিশ্বখ্যাত লড়াকু, তলোয়ারবাজ, পরীক্ষিত তিরন্দাজ ছাড়াও ঘোড়া, গবাদিপশু, ছাগল, কুকুর, শুকর, মুরগি, তরকারির বীজ, গৃহ নির্মাণসামগ্রী এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়।

চার সপ্তাহের সফর শেষে যখন কলম্বাস ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের সেই জায়গায় এসে পৌঁছায়, যেখানে প্রথমবার এসে নোঙর ফেলেছিল; তখন সে এটা দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় যে, সেখানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। কলম্বাস যাদেরকে এখানে কলোনি প্রতিষ্ঠার জন্য রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে স্থানীয় অধিবাসীরা নিঃশেষে মারা পড়েছিল অথবা অন্যত্র চলে গিয়েছিল। কলম্বাস তখন পাশেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটা জায়গা দেখে নিজ হাতে প্রথম স্পেনীয় কলোনির ভিত্তি রাখে এবং শহরটির নাম দেয় ইসাবেলা। কলম্বাস আবাসন কর্মীদের কাজে লাগিয়ে নিজে সোনার খুঁজে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি। সে ওই পরিমাণ স্বর্ণ লাভ করতে পারেনি, যে পরিমাণের ওয়াদা সে রাজা ও রানিকে দিয়ে এসেছিল। স্বর্ণ অর্জনের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য কলম্বাস শেষ পর্যন্ত ওখানকার মানুষকে বন্দি করে দাস হিসেবে স্পেনে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কলম্বাসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—শক্তিশালী গঠনের রেড ইন্ডিয়ানরা মূল্যবান দাস হিসেবে বিক্রিত হবে। এভাবে সে সোনা-রোপার পরিবর্তে রেড ইন্ডিয়ানদের উপস্থাপনের মাধ্যমে রাজা ও রানির অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যাবে।

কলম্বাসের এই দুষ্ট সিদ্ধান্ত রেড ইন্ডিয়ানদের ভাগ্যে মৃত্যু, বিপদ, অসহায়ত্ব, ধ্বংস এবং জাতিনির্মূলের এক রক্তাক্ত অধ্যায় শুরু করে দেয়। যা পাঁচ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আপন ভয়াবহতা নিয়ে অক্ষত আছে। আমেরিকা প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই অবিচার, শক্তিপ্রদর্শন, অত্যাচার এবং অন্যায্য পন্থায় মানুষের রক্তপ্রবাহ অন্তর্ভুক্ত। মানবতার লাঞ্ছনা এবং মানবাধিকার যে ভয়াবহ পদদলন আমেরিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে; আকাশের তারকারাজি পৃথিবীর অন্য কোনো ভূখণ্ডে এমনটি প্রত্যক্ষ করেনি। ইসাবেলার খ্রিষ্টবাদ প্রসারের উন্মাদনা এবং ফার্দিনান্দের সাম্রাজ্যবিস্তারের পাগলামি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা থেকে পিছিয়ে থাকা সহজ-সরল এবং পরিচিত পৃথিবী থেকে অনেকটা সম্পর্কহীন রেড ইন্ডিয়ান জাতির ভাগ্যে এমন এক দুর্যোগের তুফান নিয়ে আসে—মনুষ্য ইতিহাসে এমন রক্তমাখা, এমন ধ্বংসাত্মক, এমন জাতিনির্মূল অভিযানের উদাহরণ কোথাও পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড জিন লেখেন—

'বাহামার উপকূলে কলম্বাসের জাহাজ যখন নোঙর ফেলে, তখন সেখানে থিয়ানো এবং অ্যারাওক নামক দুটি রেড ইন্ডিয়ান গোত্র বসবাস করতো। এরা রেড ইন্ডিয়ান বড় গোত্রের মধ্যে গন্য ছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এই গোত্র দুটোর মানুষগুলো নিঃশেষে হারিয়ে যায়। তাদের পায়ে বেড়ি পরানো হয় এবং দাস বানিয়ে স্পেনে পাঠানো হয়। স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের হাতে বাহামা ও বিটি দ্বীপে বসবাসরত ১ লাখেরও অধিক অ্যারাওক রেড ইন্ডিয়ান নিহত হয়। কলম্বাসের অধীন সৈন্যরা একটার পর একটা দ্বীপে তলোয়ার উঁচিয়ে যেত এবং সেখানকার নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের পাশাপাশি শিশু ও বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করতো। যুবকদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে আসত। কেউ বাধার সৃষ্টি করলে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতো। যেহেতু স্পেনিশদের অস্ত্রশক্তির সাথে রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতিরোধের কোনো তুলনা ছিল না, তাই ওরা মশা-মাছির ন্যায় মারা যাচ্ছিল।'

১৪৯৪ থেকে ১৫০৮-এর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে ৪০ লাখেরও অধিক রেড ইন্ডিয়ানকে হত্যা করা হয়। কলম্বাসের সফরসাথি মিশনারি লাস্সকিস—যে কলম্বাসের দিনলিপি লেখক ছিল, সে তার নিজস্ব *রোজনামচায়* এমন কিছু ভয়াবহ ঘটনা লিখে রেখেছিল, যা পাঠ করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। যেমন এক জায়গায় মি. লাস্সকিস লেখেন—

'স্পেনীয় উপবিশেবাদীরা রেড ইন্ডিয়ানদের জন্য সম্মিলিত ফাঁসির প্রচলন শুরু করেছিল। ছোট ছোট বাচ্চাদের হত্যা করে কুকুরের সামনে খাবার হিসেবে রেখে দিত। যুবতী নারীদের অধিকাংশের সাথে তখন পর্যন্ত ব্যভিচার চালিয়ে যেত, যতক্ষণ না সে মারা যাচ্ছে। ব্যক্তিমালিকানার সাথে সম্পর্কহীন ওই লোকগুলোর নামমাত্র মূল্যের দ্রব্যাদি পর্যন্ত লুটে নেওয়া হতো। ওদের প্রতিটি ঘরে আগুন দেওয়া হতো এবং বন্যপ্রাণীর মতো পাল বেধে পলায়নপর লোকগুলোর পেছনে দ্রুতগামী ঘোড়ার মাধ্যমে ধাওয়া অব্যাহত রেখে তাদেরকে তিরের টার্গেট বানানো হতো। এভাবে কয়েক ঘণ্টার ভেতরে জীবনে মুখরিত জনপদ নিশ্চিহ্ন, নীরব, নিথর, উজাড় ও বিরান হয়ে যেত। এভাবেই রেড ইন্ডিয়ানদের হটিয়ে স্পেনীয়রা তাদের বিস্তর ভূখণ্ড দখল করে নিত।'

এ ছিল আমেরিকার প্রতিষ্ঠাকলীন রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা-সংক্রান্ত বর্ণনা। কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সরকার কর্তৃক নিরপরাধ রেড ইন্ডিয়ানদের যে নির্দয় পন্থায় হত্যা

করা হয়, সে ইতিহাস চিরকালের মানবজাতির জন্য লজ্জার কারণ হয়ে থাকবে। কলম্বাস ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপপুঞ্জে যে বর্বরতা বৈধ রেখেছিল, কোর্তেজ নামক জনৈক স্পেনীয় জুলুমবাজ মেক্সিকোতে অ্যাজটাক সভ্যতার লোকদের সাথে, পিজারু নামক আরেক স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদী পেরুতে আনকেস জাতির সাথে, আর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদিরা ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুয়েস্টের পোটাহান্ট রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে বৈধ রেখেছিল। ফলশ্রুতিতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোটিসংখ্যক লোক ওই উপনিবেশবাদিদের লোভ, লালসা, অর্থ ও জমির মালিকানা-মোহের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, আমেরিকার সর্বকালের ইতিহাস সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার সাথে জড়িত।

এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা অস্বীকারের কোনোই উপায় নেই যে, বর্তমান আমেরিকার ভিত্তি ফার্দিনান্দের ন্যায় পাগলাটে এবং ইসাবেলার ন্যায় ভারসাম্যহীন রক্তপিপাসু ও কলম্বাসের ন্যায় হিংস্র, বর্বর, ইতর পুরুষ ও নারীর হাতে রচিত। যে রাষ্ট্রের প্রতিটি ইটের গাথুনিতে রয়েছে রেড ইন্ডিয়ান ও নির্যাতিত আফ্রিকানদের রক্ত, মাংস ও হাড্ডি।

আজ গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচারসহ মানবাধিকারের যে ঢোল আমেরিকানদের বগলবাদ্য, তারাই তো রেড ইন্ডিয়ান আর আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গদের এই ১৯৬৫ পর্যন্ত উক্ত অধিকারগুলো থেকে চরমভাবে বঞ্চিত রেখেছিল। আজ দেশে দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে ব্যাপ্টিজমের দাবিদার আমেরিকাই বিশ্বের নম্বর ওয়ান মানবাধিকার হরণকারী হিসেবে প্রমাণিত। মানবতার ইতিহাসে মানবতার উপর সবচে বেশি জুলুম তাদের থেকেই সংঘটিত হয়েছে। আজকের আমেরিকার মাটি উর্বর করতে মিলিয়ন মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানের রক্তে সেঁচ দিতে হয়েছে। আমেরিকার ডলারকে শক্তিশালী করতে ১৫ মিলিয়ন আফ্রিকান নিগ্রোদের রক্ত ও ঘাম ঝরাতে হয়েছে।

ইসাবেলা আর কলম্বাসের অন্তরে লুকিয়ে থাকা লোভের ভূত আর বিজয় ও মুনাফার হিংস্র প্রেত দেশে দেশে নিরপরাধ মানুষের রক্ত চুষতে চুষতে আজ ইরাকে মরুময় মাঠে আর আফগানিস্তানের পাথুরে পাহাড়ি ভূমিতে এসে উপস্থিত। আজ যদি এখানকার বাসিন্দারা সেই কাঠ আর বাঁশের ধনুক দ্বারা প্রতিরোধ না গড়ে রেড ইন্ডিয়ানদের মতো পশুপালের ন্যায় পালাতে থাকে, তাহলে এদের পরিণতিও রেড ইন্ডিয়ানদের পরিণতির চেয়ে ভিন্নতর হবে না। কলম্বাস ল্যাটিন আমেরিকায় বিজয় ও ধ্বংসের যে মনস্তাত্ত্বিক ভিত রচনা করেছিল তা হতো ক্ষণস্থায়ী; যদি না ইসাবেলার ধর্মীয় সংকীর্ণতা, পোপইজম ও জোরজবরদস্তি সে ভিতকে শক্তি না যোগাত।

ষষ্টদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে এ মানসিকতার বড় শিকার হয় রেড ইন্ডিয়ান জাতি। মনুষ্য ইতিহাসে এটাই ছিল সবচে বড় জাতিনির্মূল অভিযান। তাই আমেরিকানদের পৃথিবীর সেরা অসভ্য জাতি বলা যায়। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর বড় শিকার হয় আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতি। এ জন্যে ওদেরকে পশু অভিধায় অভিসিক্ত করা যায়।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শুরু হওয়া-মাত্রই এই পশুশক্তি লাগামহীন ঘোড়ার মতো বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা আর্জেন্টিনা, চিলি, চীন, কোরিয়া, পানামা, নিকারাগুয়া, ফিলিপাইন, কিউবা এবং মেক্সিকোকে তার রাক্ষুসে দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে। অতঃপর বিংশ শতাব্দীতে যুগোশ্লাভিয়া, হন্ডুরাস, লাউস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লেবানন, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, সোমালিয়া, সুদান এবং মধ্য-আমেরিকায় রক্তের নেশায় মেতে ওঠে।

আর একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলে পড়ে। অবস্থার প্রেক্ষিত বলছে—এ শতাব্দীতে এই পশুশক্তির বড় আক্রমণ চলবে মুসলিম উম্মাহর ওপর।

অতএব, হে প্রিয় দেশবাসী, যে গাছের রস খেয়ে রোগাক্রান্ত হয়েছ, তা দিয়ে আর কতকাল চিকিৎসা চালাবে?

ওগো স্পেন, মুসলিম খুনের আমানতদার
হরমের ন্যায় পবিত্র কাম্য তুমি আমার দৃষ্টিতে
তোমার জমিনে লুকানো আমার সেজদার দাগ
নিঃশব্দ আজান ভাসে তোমার ভোরের হাওয়ায়
সিতারার মতো ঝলমলে ছিল তাদের সিনা
তাঁদের তাবু ছিল তোমার পাহাড়ের বুকে
তোমার সখিকে রাঙাতে মেহদির প্রয়োজন হয় বড়
আমার বুকের ভেতর রয়ে গেছে সে রঙ আজও
শ্যাওলার ন্যায় ভেসে গেল কেমনে মুসলিম জাতি
তোমার আগুনে আজও স্ফুলিঙ্গ ওড়ে না কেন?
গ্রানাডা দেখেছে আমার চোখ কিন্তু,
সফরে ও ইকামতে মুসাফিরের শান্তি নেই কেন?
দেখার দেখেছি শোনার শুনেছি তবে
প্রাণের শান্তি ও প্রশান্তকর খবর আসছে না কেন?

কী নিয়ে রচিত বইটি

স্পেন হচ্ছে আমাদের হারিয়ে যাওয়া জান্নাত আর আমেরিকা হচ্ছে আমাদের জন্য দন্তখোলা জাহান্নাম। কীভাবে আমরা সে জান্নাত হারিয়ে আজ জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে 'স্পেন টু আমেরিকা' সে হৃদয়বিদারক ইতিহাসের করুণ আখ্যান। বইটি পাঠকালে আপনি প্রকাশ-অযোগ্য হতাশায় কুকড়ে যাবার পাশাপাশি শুনতে পাবেন উম্মাহর সোনালি স্বপ্নের পাজর ভাঙার যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ। সে সাথে যখন দেখবেন বীর তারিকের উত্তরসূরি মূসা বিন আবি গাসসানের অসহায় একাকিত্ব, লেন্দুপ দর্জি আর মীরজাফরদের ন্যায় গাদ্দারি, পরিণাম-বিমুখ ভোগবাদী শাসকের রাজ্য অপেক্ষা রানির মেকআপের চিন্তা; তখন স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়তে পারেন আপনি।

'স্পেন টু আমেরিকা'য় আপনি পরিচয় পাবেন পরের ধনে পোদ্দারি করা, দুপুরে-ডাকাত, মুসলিম উম্মাহর কৃতিত্ব-চোর নির্লজ্জ ইউরোপীয়দের প্রকৃত চেহারার।

দেখতে পাবেন এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে রক্ত আর আগুনের জীবন্ত ইতিহাস। শুনতে পাবেন অশ্রুর মহাসড়ক ধরে মেষ-ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সরলপ্রাণ অসহায় রেড-ইন্ডিয়ানদের বুকফাটা হাহাকার। লোভের আগুনে ছাই হয়ে যেতে দেখবেন 'অ্যারাওক' ও 'চ্যারোকি' নামক দুই রেড ইন্ডিয়ান জাতির ইতিহাস। জানতে পারবেন রাজ্যলিপ্সু ফার্দিনান্দ ও চরম মুসলিম-বিদ্বেষী রানি ইসাবেলার মানস-সন্তান আমেরিকানরা কেন মুসলমানদের মোকাবিলায় এতটা হিংস্র? কী তাদের ভবিষ্যৎ টার্গেট।

Edited by
T.me/Abdullah_2325